উপন্যাস

যুবক-যুবতীরা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. অবিনাশ 2
২. বিমলেন্দু 45
৩. ছায়া 67
৪. অনিমেষ 86
৫. তাপস 109
৬. হেমকান্তি 140
৭. পরীক্ষিৎ 150
৮. শেখর 162

১. অবিনাশ

অবিনাশ

আমি লম্বা ভাঙা আরাম কেদারায় এবং পরীক্ষিৎ খাটে শুয়ে ছিল। পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী। এক-এক সময় শীতের শুকনো হাওয়ায় জামাকাপড়ের নিচে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দূরের বাঁধ থেকে মাটিকাটা কামিনদের অল্প ভেসে-আসা গোলমাল, এ ছাড়া কোনও শব্দ ছিল না। শুধু শীতের দুপুরে যখন ধপধপে ফর্সা নির্জন রোদ, তখন যেহেতু কাকের ডাক ছাড়া মানায় না, বড় বড় মিশমিশে দাঁড়কাকগুলো যা মফঃস্বলেই সাধারণত দেখা যায়, তাদের ডাকাডাকি মাঝে মাঝে আমাকে একাগ্র করেছিল। এবং টিনের চালে তাদের কুৎসিত পায়ের শব্দে আমি কখনও কখনও অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম।

মনে পড়ে সেই দুপুরবেলায় বসে থাকা। খাটে ঘুমন্ত পরীক্ষিৎ, পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রী, এবং আমার চুপচাপ বসে থাকা। সেই দৃশ্যটার কথা ভাবলেই কেমন যেন ঝন ঝন করা শব্দ শুনতে পাই, জামার মধ্যে হঠাৎ কোনও পোকা ঢুকে যাওয়ার মতো অস্বস্তি বোধ করি। আমি জীবনে কোনও পাপ করিনি। আমার শাস্তি পাবার ভয় নেই। মাথার ওপর সব সময় দণ্ডাজ্ঞার ছায়া রয়েছে এমন মনে হয় না। তবু সেদিনের সেই দুপুরের কথা মনে পড়লে কেমন যেন ভয় করে। জীবনে কারুর ক্ষতি করিনি সজ্ঞানে, চোখ মেলে পৃথিবীকে যে-রকম দেখা যায়, আমার কাছে পৃথিবী ঠিক সেই রকমই, আর কিছু না, না স্বপ্ন, না আয়না। আমি কোনও রকম বাসনাকে বন্দি করতে চাইনি কখনও, মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, ভেবেছি। জব্বলপুরে আমি কী করেছিলাম, সে কি পাপ? গত বছর শেষ শীতে, সেই জব্বলপুরের দুপুরে?

পরীক্ষিৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। অদ্ভুত ঘুম ওর, যেন জন্মের সময়েই প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, জীবনের এক-তৃতীয়াংশ ও ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাবে। ও যখন জেগে

থাকে, তখন ভয়ানক ভাবে জেগে থাকে, যখন ঘুমোয়, প্রবল ভাবে ঘুমোয়। দুপুরে খেয়ে ওঠার পর হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল যে সিগারেট নেই। ডুবে গেছি মাইরি, সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে গেছি।

পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ভাত খাবার পর এই টক মুখ নিয়ে কী করব? গায়ত্রী বলেছিল, মশলা খান না, আমার কাছে ভাজা মশলা আছে। মশলা আর সিগারেট এক হল? পরীক্ষিৎ ধমকে উঠেছিল, তারপর সেই বিখ্যাত জার্মান উপন্যাসের নায়কের মতো বলেছিল, সিগারেট নেই তো ভাত খেলাম কেন? ভাত খাবার প্রধান কারণই তো এই – তারপর সিগারেট টানতে বেশি ভাল লাগবে। ঘুরঘুরে ইঁদুরের মতো ও তখন বাড়ির সমস্ত কোণ খুঁজে দেখল– যাবতীয় প্যান্টের পকেট থেকে তরকারির ঝুড়ি পর্যন্ত সিগারেটের দোকান প্রায় মাইল খানেক দূরে, চাকর চলে গেছে তার বাড়িতে, দরকার হলে পরীক্ষিৎ নিজেই ভরা পেটে এক মাইল ছুটত, কিন্তু হঠাৎ বাথরুমে পৌনে এক প্যাকেট পেয়ে গেল এবং পরম উল্লাসে আমাকে একটি এবং নিজে ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু যে-সিগারেটের জন্য ওর এত ব্যস্ততা, সেটা শেষ হবার আগেই এমন ভাবেও ঘুমোল যে, যাতে ওর আঙুল কিংবা বিছানা পুড়ে না যায়, তাই আমি ওর ঘুমন্ত হাত থেকে সিগারেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। ঘুমন্ত হাত’ কথাটা ঠিক ব্যবহার করেছি। ও যখন ঘুমোয় তখন ওর সমস্ত শরীর ঘুমোয়। ওর শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আলাদা ঘুম আছে। যখন যেমন শোয়, ঠিক সেই রকমই শুয়ে থাকে আগাগোড়া, একটুও নড়ে না। কখনও ঘুমের মধ্যে ওকে জোর করে ডাকলে ও চোখ মেলে তাকায়, শরীরে সামান্যতম স্পন্দনও দেখা যায় না। আস্তে আস্তে ওর মুখ, ঘাড়, গলা, হাতের ঘুম ভাঙে। বিখ্যাত ঘুম পরীক্ষিতের। গায়ত্রী তখনও জেগে ছিল পাশের ঘরে, মাঝে মাঝে ওর শরীরের, কাপড়জামার এবং হার-চুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একবার তবু ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গায়ত্রী, ঘুমিয়েছ?

না, সেলাই করছি। আপনি কী করছেন?

কিছুনা, কী করব তাই ভাবছি।

চা খাবেন?

না, একটু পরে, এখন এক গ্লাস জল খাব।

শব্দ করে খাট থেকে নেমে অল্পক্ষণ ও কী জন্য যেন দেরি করল। তারপর জল নিয়ে এল ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে। গেলাসটা বোধহয় ওদের নতুন বিয়েতে পাওয়া, নয়তো এত ঝকঝকে গেলাস কারুর বাড়িতে দেখিনি। এই গেলাস এবং তার মধ্যেকার জলের শীতলতা যেন আমি বুক দিয়ে অনুভব করলাম। তখনই সেই জল থেকে আমার ভয় করল। বললাম, টেবিলের ওপর রাখো।

নিচু হয়ে যখন ইজিচেয়ারের হাতলে গেলাসটা রাখল, আমি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ব্লাউজের নিচটা শাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, শোবার সময় সব মেয়েই এ-রকম বের করে দেয়, নিচের বোতাম খোলা, ওর পেটের কাছে একটা ফর্সা ত্রিকোণ আমার চোখে পড়ল। এবং যে-হাত দিয়ে ও গেলাসটা রাখল, সেই হাতের নিচে ভিজে দাগ। শীতকালেও অনেক মেয়ের বগল ঘামে ভিজে থাকে এবং সাধারণত তারা কী-রকমের মেয়ে, আমি জানি।

আপনি ঘুমোবেন না? গায়ত্রী জিজ্ঞেস করে।

না, দুপুরে আমার ঘুম আসে না।

আমারও। ইয়ে কী রকম ঘুমোচ্ছে। খানিকটা হাসল, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, রুমালে একটা ফুল তুলছি, যাই। যাবার সময় আমি ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকব জেনেও ও বেশ সপ্রতিভ ভাবে চলে গেল।

না, আমার কিছুই ভাল লাগছিল না, আমি দুপুরবেলা ঘুমোতে চাই না, কখনও ঘুমোইনি। অথচ এখন কী করব? বই পড়তে গেলে বমি আসে। গায়ত্রীকে আবার ডাকব কিংবা ওর

ঘরে গিয়ে গল্প করব? কেন জানি না, আমার সমস্ত শরীরে যেন শিকল নাড়াচাড়ার মতো ঝন ঝন করে শব্দ হচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। এদিকে আর বাড়ি নেই, অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, মাঝে মাঝে সবুজ নীল খেত, বেশ দূরে একটা নৈবেদ্য'র মতো পাহাড়। এসব কিছুই বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখবার নয়, মাঠের ডান দিকের কোণে একটা অতিকায় শিশুগাছ, ওখানে শ্মশান। অনিমেষের অফিস এখান থেকে দেখা যায় না, ও অবশ্য আজ গেছে তেঘড়িয়ায়, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে, সেখানে হাজিরা দিতে। মফঃস্বলের সরকারি চাকরি এই জন্যই জঘন্য। ছুটিতে থাকলেও নিষ্কৃতি নেই, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মন্ত্রী এলেই ছুটতে হবে। সকালে বেশ তাস জমে উঠেছিল, এমন সময় আর্দালি এসে ম্যাজিস্ট্রেটের শুভাগমনের কথা জানাতেই অনিমেষের মুখ শুকিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা দেবার জন্য ওকে ছুটির দিনেও দাড়ি কামাতে ও জুতো পালিশ করতে হল।

আমি চুপ করে বসে ছিলাম। পৃথিবীতে কোথাও কোনও শব্দ নেই। মাটিকাটা কামিনরা এখন বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। খবরের কাগজটা আমার হাত থেকে খসে যেতেই আমি তাতে একটা লাথি মারলাম। আমার চোখ খর খর করছে, আমার কিছুই করার নেই।

কাল সন্ধেবেলা আমরা যখন বাইরে টেবিল পেতে বসে চা খাচ্ছিলাম, সেসময় দু'জন ভদ্রলোক অনিমেষকে ডাকতে এসেছিল। ওদের দেখে যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ল অনিমেষ, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, আপনারাই যান, আমার অসুবিধে আছে, আমরা আর যাব না।

একটুক্ষণ কথাবার্তায় বোঝা গেল, আজ ওদের নেমন্তন্ন ছিল, কোনও কলিগের ছেলের অন্নপ্রাশন, আমরা এসেছি বলে অনিমেষ বিব্রত বোধ করছে। অথচ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুঝতে পারলাম। আমার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা আছে, লোকের সঙ্গে ফর্মালি পরিচিত না হলে বা কোনও কিছু জিজ্ঞাসিত না হলে কোনও কথা বলতে পারিনা। পরীক্ষিৎ ও-সব মানে না, চেঁচিয়ে উঠল, যা না, ঘুরে আয়, আমরা ততক্ষণ খানিকটা বেড়িয়ে আসি। একটু ওষুধ খেতে হবে, মাথা ধরে যাচ্ছে।

যাঃ, তোরা একা একা থাকবি!

একাই একশো, পরীক্ষিৎ বলে, ওষুধ কোথায় পাওয়া যায় রে? একটু চোখ নিচু করে ইঙ্গিত করল।

স্টেশনের কাছে, এগিয়ে এসে বলল অনিমেষ, এ-দিকে পাওয়া যায়, দিশি। কথাবার্তার মধ্যে গায়ত্রী উঠে ঘরে চলে গিয়েছিল। অনিমেষও ভেতরে গেল। একটু বাদে গায়ত্রীর তীক্ষ্ণ, অশোভন গলা শুনতে পেলাম, না, আমি যাব না, তুমি একা যাও। লোক দুটি আমাদের সামনে বসে ছিল। আলাপ করার চেষ্টায় মফঃস্বলের লোকদের একমাত্র প্রশ্ন, দাদারা কোথা থেকে, ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করেছিল।

ফরাক্কাবাদ! বলে পরীক্ষিৎ এমন ভাবে মুখ ঘুরিয়ে বসল যে, আর ওরা উৎসাহ পায়নি। গায়ত্রীর গলা শুনে ওরা হা-হা করে খানিকটা হেসে উঠল, বউদি ক্ষেপেছে মাইরি, চল দেখি। ওরা দু'জনে উঠে ঘরে গেল এবং খানিকক্ষণ চাষাড়ে রসিকতা, হি হি হে, মাইরি যা মশা পড়েছে এবার, ফাসক্লাস পর্দার রঙটা তো, কবে আপনার বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খাব বউদি, হ্যা-হা-হা, চলুন দাদা রাত হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদির খানিকটা পর গায়ত্রী এবং অনিমেষ সেজে বেরিয়ে আসে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরব, অনিমেষ বলল; গায়ত্রীর মুখ নিচু করা, দাদাদের ফেলে রেখে গেলাম, হ্যা হ্যা। লোক দুটির এক জন বা সমস্বরে বলে চলে গেল। আমি এতক্ষণ কোনও কথা না বলে চুপ করে ওদের দেখছিলাম। বেশ সবল লোক দুটি, ওদের আমার ভাল লাগাই উচিত, ওই রকম সরল, শুয়োরের মতো নির্ভীক জীবনই তো আমি এত কাল চেয়ে আসছি।

ওরা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এল আধ ঘণ্টার মধ্যে। চুপচাপ দু'জনে আধবোতল শেষ করার পর ও প্রথম কথা বলল, কেমন লাগছে রে এদের দু'জনকে?

ভালই। বেশ তো সুখেই আছে অনিমেষ বউকে নিয়ে।

হুঁ, সুখে আছে, পরীক্ষিৎ বিড় বিড় করল। কী করে বুঝলি তুই সুখে আছে?

কেন, দেখাই তো যাচ্ছে, ছোট্ট সুখের সংসার।

সত্যি, অনিমেষটাকে আর চেনাই যায় না। যেন বাঘের গায়ে কেউ সাদা চুনকাম করেছে। বুঝলি, বাঘের গায়ে! হালুম করার বদলে এখন মিউ মিউ করে।

আমি পরীক্ষিতের এই খেলো উপমাটাকে পাত্তা না দিয়ে বললাম, দেখা যাচ্ছে বিয়ে করার পর অনিমেষই বেশ সুখে আছে।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ চটে গেল, কেন সুখে থাকবে? কী অধিকার আছে ওর সুখে থাকার?

আমি

বললাম, বাঃ, পৃথিবীসুষ্ঠু লোককে তুই অসুখী থাকতে বলবি নাকি?

আমরা ঘেন্না করে, পরীক্ষিৎ বলল, রাত্তিরবেলা যখন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে, কী-রকম তেল-তেল মুখ হয় দেখেছিস? এত যে বন্ধুত্ব ছিল, বিয়ের আগে যে নদীর পাড়ে বসে এত কথা হল, সব হাওয়া? কাল বললাম, চার জনে এক সঙ্গে এক ঘরে শোব, হেসে উড়িয়ে দিল। কী হাসি দু'জনের। আমি কি ভাঁড় নাকি যে, হাসির কথা বলে মজা দেব? মজা তো বউ যথেষ্ট দিচ্ছে। রাত্তিরবেলা বউগুলোর স্বভাব দেখেছিস, যেন ঘুরঘুরে নেউল। বাথরুমে গা ধোয়, মুখে আরাম করে স্নো, বিছানা পেতে (অশ্লীল), কথাবার্তা বলছে অথচ...(ছাপার অযোগ্য)

ও-কথা থাক পরীক্ষিৎ, অন্য কথা বল।

না, এ-সব দেখলে আমার বমি আসে। অনিমেষটা আউট হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে ইলেকট্রিক নেই কেন? টিমটিমে টেমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আই ওয়ান্ট গ্লোরিয়াস

সানসাইন অলসো অ্যাট নাইট। আয়, ওই খড়ের গাদাটায় হ্যারিকেনটা ভেঙে উলটে দিই। খানিকক্ষণ বেশ আলো হবে। বলার সঙ্গে সঙ্গে ও হ্যারিকেনটা তুলে নিল।

তোর কি আধবোতলে নেশা হল, ছিঃ! আমি বললাম।

পরীক্ষিৎ ওর ছোট ছোট করমচার মতো চোখ দুটো সোজা তুলে যেন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে, তুই কী বলছিস অবিনাশ, আমার দোষ হল? তোর খারাপ লাগছে না? এত কথা হল, এত প্রতিজ্ঞা, আর এক জন বিয়ে করে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।

তুই- ও এক দিন ছেড়ে দিবি।

বিয়ে করে? পরীক্ষিৎ ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করে।

অথবা ক্লান্ত করে। সকলেই তাই দেয়। বয়স ঊনত্রিশ হল, খেয়াল আছে?

পরীক্ষিৎ নেশার ঝোঁকে আরও মুখ খারাপ করতে থাকে। আমার একটু একটু হাসি পায়, আমি চুপ করে থাকি। পরীক্ষিতের কি বয়স বাড়ে না? এক সময় কী সব ছেলেমানুষি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা, কেউ বিয়ে করব না, সারা দিনে মেয়েদের জন্য আধ ঘণ্টার বেশি ব্যয় করব না, শিল্পের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে- এই সব। এ-সব কেউ বেশি দিন মনে রাখে? এ-সব নিয়ে কেউ পরে সিরিয়াসলি অভিযোগ জানায়? পরীক্ষিৎটা পাগল, অনিমেষ বিয়ে করে সুখে আছে, তাতে দোষেব কী? বেশ তো ভালই আছে। আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, ও-পাশে কি ঝাউবন আছে নাকি রে? অমন শোঁ শোঁ শব্দ কীসেব?

পৃথিবীর ঝাউ কি সুপুরি কি জামরুল, ও-সব আমি চিনি না। সবই পৃথিবী। আর পৃথিবী ঠিকঠাক আছে। গায়ত্রী মেয়েটা কেমন?

ভালই তো, বেশ ছিমছাম। হাসির সময় ঠোঁট অল্প ফাঁক করে, সুতরাং অভিমানী।

কী করে জানলি? মেয়েদের অভিমান কি হাসিতে বোঝা যায়? ও জন্য তো ওদের শরীর জানতে হয়।

এই কথায় আমি একটু কেঁপে উঠেছিলাম। আমার আঁতে ঘা লাগে, পরীক্ষিৎ আমার কথাটাই ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে এই প্রসঙ্গে। গায়ত্রীর সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্তা বলে। আমি পারি না।

কোনও রকম শারীরিক বন্ধুত্ব না হলে অথবা করার চেষ্টা করে প্রত্যাখ্যাত না হলে আমার সঙ্গে কোনও মেয়ের অন্তরঙ্গতা হয় না। বেশির ভাগ মেয়ের কাছেই আমি এ-জন্য একটু অভদ্র বা লাজুক বলে পরিচিত। পরীক্ষিৎ আমার ব্যাপারটা জানে বলেই খোঁচা দিয়েছে। আমি ওকে চিনি। ওর হাড়ে হাড়ে গণ্ডগোল। ও আমাকে কী বলতে চায় তা আমি অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

.

তারও আগের দিন রাত্রে খাওয়ার পর আমরা তিন জন বসে গল্প করছিলাম, গায়ত্রী আমাঙ্গের সঙ্গে বসেনি, খুটখাট করে সংসারের কাজ সারল, দু ঘরের বিছানা পাতল পরিপাটি করে, তারপর সব কাজ শেষ করেও ও আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এল না। নিজের শোবার ঘরে চুপ করে বসে রুমালে ফুল তুলতে লাগল। ওর সেই একা বসে থাকা এক প্রবল প্রতিবাদের মতে, যেন প্রতি মিনিট ও আশা করছে আমরা কতক্ষণ আড্ডা শেষ করব এবং অনিমেষ শুতে যাবে, আমার তাই মনে হয়েছিল। সুতরাং আমি বলেছিলাম, চল এবার উঠে পড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে? সে কী, তোর? পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠল, মাঝে মাঝে সত্যি অবাক করে দিস তুই। ঘুম পাচ্ছে অবিনাশ মিত্তিরের? রাত এগারোটায়, যে আসলে একটা রাতের ঘুঘু! তোর কি ফর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? বউ কোথায় গেল। পরীক্ষিৎ বিরক্তি মিশিয়ে উঁচু গলায় বলল, যে-গলায় পরীক্ষিৎ গান গায়, রাগ প্রকাশের সময়ও ওর গলা সেইরকম দীর্ঘ

সুরেলা থাকে। অনিমেষ, বউকে বল, এক ঘরে বিছানা করতে, চার জনে এক ঘরে শুয়ে সারা রাত গল্প করব!

এ-কথা বলার সময় পরীক্ষিতের গলায় কোনও দ্বিধা ছিল না। বন্ধুত্বের চূড়ান্ত সঙ্ঘে ওর বিশ্বাস, বন্ধুদের সঙ্গে মারাত্মক সব পরীক্ষায় জীবন কাটাতে হবে এবং কখনও কোনও ক্লান্ত মুহূর্তে যার-যার ব্যক্তিগত শিল্প সৃষ্টি। পরীক্ষিৎ একথা জোর করে বলে। শিল্প-শিল্প করে ও গেল, শিল্প ওর মাথার ভূত। অনিমেষ ওর প্রস্তাবে বিষম উৎসাহিত হয়ে গায়ত্রীকে ডেকেছিল। গায়ত্রী এল বারান্দায়। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

.

পরীক্ষিৎ শেষ গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে বলেছিল, আমি অনিমেষকে বড় ভালবাসি। ও-রকম কবি হয় না। ওকে ডুবিয়ে দিতে চাই। ও-রকম সুখী সেজে থাকলে ওর দ্বারা আর কিছু হবে না জীবনে, আমাকে একটু তোর গ্লাস থেকে ঢেলে দে।

আমি ওকে একটু দিয়ে আমার গ্লাস শেষ করে দিয়েছিলাম।

অনিমেষের সুখের তুই বারোটা বাজিয়ে দে, অবিনাশ। তুই কী করছিস, যাঃ তুই একটা নিরেট –ও একটা মেয়েমানুষ পেয়ে সব ভুলে যাবে? আমি বললাম, সব ভুলে গেছে কোথায়? অনিমেষ তো আগের মতোই আমাদের সঙ্গে মিশে আড্ডা দিচ্ছে।

কোনও কারণ নেই, তবু পরীক্ষিৎ আমার একথা শুনে একটু মুচকি হাসি হাসল। রহস্যময় হাসি। বলল, তুই কি ভাবছিস, আমি বিয়ে করার বিরুদ্ধে কিছু বলেছি? করুক না বিয়ে যার ইচ্ছে। কিন্তু অনিমেষ ওর বউয়ের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন দেখলে মনে হয় যেন ও আলাদা একটা জগতে আছে। এই জগৎটা ভেঙে দিতে হবে। একটা মেয়েমানুষ মানেই কি আলাদা জগৎ? কী ভয়ানক মেয়েগুলো, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে আপত্তি করল কেন? যেহেতু এক বছরেই গোটা দুয়েক ডিম পাড়েনি। তুই ওর বিষ দাঁত ভেঙে দে না। আমি বললাম, আমি কেন ভাঙতে যাব? তাছাড়া, আমার কী-ই বা ক্ষমতা আছে? পরীক্ষিৎ

আমার কথা শুনল না, নিজের মনেই বলে চলল, কী হচ্ছে কাল থেকে, খালি খাওয়া আর গল্প, কী সব গল্প, ওমুক লোকটা, ওর মেজ শালি, সে-দিন হাটে পুলিশ এসে...এ-সব কী? মনে আছে গতবার আমরা সকলে মিলে কী নিয়ে যেন মারামারি করেছিলাম? এই দ্যাখ, আমার থুতনিতে একটা কাটা দাগ আছে, তুই ঘুষি মেরেছিলি। সে-সব দিন– ।

আমি বললাম, পরীক্ষিৎ, তুই তোর বিশ্বাস বা ইচ্ছে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাস কেন? এটা তোর একটা রোগ। আমার আর অতটা ভাল লাগে না। কোনও মানুষকেই আঘাত করার ইচ্ছে নেই আমার। সকলে সকলের ইচ্ছেমতো বাঁচুক। আমিও সরল, স্বাভাবিক জীবন চাই, অনেক দিন বাঁচতে চাই। অনিমেষের সংসার দেখে আমার সেই দিক দিয়ে লোভ হচ্ছে।

সে কী রে? এ যে দেখছি বাংলা সাহিত্যে যাকে বলে ‘জীবন-প্রেমিক’। যাঃ, আর হাসির কথা বলিসনি। তোর একটা অকারণে হিউমার করার স্বভাব আছে। অনিমেষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঢুকিয়ে দে। ও ভয় পেয়ে যাক, সন্দেহ করুক নিজেকে। না হলে ও আর কোনও দিন লিখতে পারবে না। ও না লিখলে আমারও আর ইচ্ছে করে না। বাংলা সাহিত্যে আমার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

কেন, বিমলেন্দু?

ওই মোটা হুঁৎকোটা? ও তো পাবলিকে হাততালি চায়। তাই পাবে। ওর কথা ছাড়।

তাহলে বিশ্বদেব?

মনীষী বিশ্বদেব বল, এরপর তুই বুঝি শেখরের নাম বলবি? তুই আমাকে এত ছোট ভাবিস?

তুই কিন্তু বিমলেন্দুর সামনে মুখ নিচু করে থাকিস। ওকে বলিস গ্রেট। আড়ালে নিন্দে করা তোর স্বভাব। চল, বাইরে ঘুরে আসি। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ভাল লাগবে। তুই ঘোলাটে জল খেতে বড় ভালোবাসিস, পরিষ্কার জল দেখলে তোর বমি আসে, না রে?

একটু হেসে পরীক্ষিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল, ওর পা একটু টলে যায়। আমি ওর হাতটা ধরে বাইরে এলাম। আঃ, ভারি সুন্দর চাঁদের আলো দিয়েছে। পরীক্ষিৎ বলল, এই আলো খেলে নেশা হবে?

আগেকার কালের লোকদের হত, যাদের মাথার মধ্যে ভালবাসা ছিল। নেশার ঘোরে উন্মাদ হয়ে যেত শেষ পর্যন্ত। ওই জন্য পাগলের ইংরেজি লুনাটিক। তোর ও-সব কিছু হবে না। তুই বড্ড সেয়ানা।

আমি চুপ করে বসে আছি। সেই দুপুরবেলা। আমার কিছুই করার নেই। পরীক্ষিতের বেশ নাক ডাকে দেখছি। অমন কায়দাবাজ নাক দিয়ে এ কী ভালগার আওয়াজ! এ-কথা মনে করিয়ে দিলে ওর মুখের চেহারা কী-রকম হয় বিকেলবেলা দেখতে হবে। চুপ করে বসে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ও-ঘরে গায়ত্রী বসে আছে, ওর সঙ্গে অনায়াসে গিয়ে গল্প করা যায়। যায়, যদি স্বাভাবিক ভাবে গিয়ে বসতে পারি। তা পারব না, কৃত্রিমতা একেবারে ঢুকে গেছে। কোনও যুবতী মেয়ের সঙ্গে যে একা ঘরে দুপুরবেলা বসে শুধু গল্প করা যায় এই বিশ্বাসটাই যে নেই। প্রিমিটিভ, একেবারে প্রিমিটিভ। দু-একটা হালকা গল্প-গুজব রসিকতায় কি গায়ত্রীর সঙ্গে এখন সময় কাটানো যায় না? কেন আমি শুধু শুধু একা বিরক্ত হয়ে বসে আছি? কাল আমি পরীক্ষিৎকে বলেছিলাম, গায়ত্রীকে নিয়ে তুই এমন ভাবে ভাবছিস কেন? বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছি, স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট চমৎকার সংসার এখানে। আয়, ঠাট্টা-ইয়ার্কি ফষ্টি-নষ্টি করি, লুকিয়ে প্রেম করার চেষ্টাও চলতে পারে। ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ লড়াই হোক-কেউ ব্যর্থ হয়ে দুঃখ পাক, কেউ সফল হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ুক, কেউ জ্বলে-পুড়ে মরুক মনে মনে সেইটাই তো স্বাভাবিক। জীবন এই রকম। তার বদলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে তুই আমাকে বলছিস ওর সঙ্গে সম্পর্ক করতে যাতে অনিমেষ দুঃখ পায়, ওর সুখ ভেঙে যায়, আর তুই থাকবি আড়ালে। আমার ব্যক্তিগত

লোভ থাক বা না থাক, অনিমেষকে কষ্ট দেবার জন্য আমি একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব–এ কী! পরীক্ষিৎ যথারীতি নিজের ভাষায় আমাকে কিছু গালাগালি দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না, অনিমেষ-গায়ত্রীর সুখের সংসার ভাঙতে আমার একটুও লোভ নেই। ওরা সুখে থাক।

আমি উঠে গিয়ে গায়ত্রীর ঘরের দরজা খুলে দাঁড়ালাম।

গায়ত্রী বলল, আসুন।

খাটে পা মুড়ে বসে দু' হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে ও সেলাই করছিল, আমাকে দেখে একটুও ভঙ্গি বদলাল না। লাল শাড়ির নিচে সাদা শায়ার লেস বেরিয়ে পড়েছে, তার নিচে পদ্মপাতার মতো গায়ত্রীর পায়ের রঙ, সে-দিক থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। গায়ত্রীর রঙ একটু কালো, গোল ধরনের মুখ। তেমন সুন্দর নয়, ছায়া কিংবা মায়ার পাশে দাঁড়ালে গায়ত্রীকে মেটেই রূপসী বলা যাবে না। কিন্তু জলের মাছের মতো গায়ত্রীর চকচকে স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যের অহঙ্কার ওর চোখে-মুখে। দু-এক ফোঁটা ঘাম জমে গড়িয়ে এসেছে থুতনি বেয়ে। ব্লাউজের একটা বোম খোলা, আমি সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। ডিজাইনকরা ব্লাউজের হাতা টাইট হয়ে চেপে বসেছে ওর বাম বাহুতে, আমার মনে হল একটা কুমির যেন ওর হাত কামড়ে ধরেছে। আমি সেদিক থেকেও চোখ ফিরিয়ে নিলাম। জানলা দিয়ে রোদ্র এসে ওর তৃণভূমির মতো ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়, সেখান থেকে ঠিকরে এসে লাগছে ওর চোখে, অথচ ও সরে বসেনি। ও কি জানত, আমি এক সময় এসে ওর উদ্ভাসিত মুখ দেখব?

আসুন, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসবেন না?

কারাগারের দরজায় যখন জল্লাদ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে কী-রকম দেখায়? আমার নিজেকে মনে হল সেই জল্লাদের মতো। আমার হাতে মারাত্মক অস্ত্র। আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি, আমার শরীর অন্য রকম লাগছিল। যেন কোথায় টঙ ঢঙ করে পাগলা

ঘন্টি বাজছিল। আমি তো এ ভেবে এ-ঘরে আসিনি, সরল পদক্ষেপে এসেছিলাম দরজা পর্যন্ত। এখন আমার বলতে ইচ্ছে হল, গায়ত্রী, শেষবারের মতো ঈশ্বরের নাম করে নাও।

দেখুন তো ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে? ওর কণ্ঠস্বর ময়ূরের মতো কর্কশ।

আমি কাছে এসে চেয়ারে কিংবা খাটে বসব ভাবছিলাম –গায়ত্রী একটু সরে হাত দিয়ে জায়গা দেখিয়ে বলল, বসুন না।

আমি বললাম, গায়ত্রী, কেমন আছ?

ও এক ঝলক হেসে বলল, হঠাৎ একথা?

সত্যিই হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। পরশু দিন এসেছি, আজ কি আর ও কথা জিজ্ঞেস কবা যায়! কিন্তু মেয়েদের কোনও সময় চোখের দিকে তাকালেই আমার মুখ দিয়ে এই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। এর কী উত্তর চাই, তা আমি জানি না। হয়ত ওদের ভিতরের কোনও গুপ্ত খবর ওদের মুখ থেকে বিষম ভাবে শুনতে চাই। এর পরেই আমার বলতে ইচ্ছে হয়, কত দিন তোমাকে দেখিনি। কিন্তু এ-কথাও বলা চলে না, কারণ গায়ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপই ছিল না, অনিমেষের বিয়ের সময়ও আমি আসিনি, পা ভেঙে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। তবু কত দিন তোমাকে দেখিনি এ কথা বলার ইচ্ছে আমার মধ্যে ছটফট করে।

গায়ত্রীর সঙ্গে মিনিট দশেক কী কী বিষয়ে যেন কথা বললাম। তারপর ও উঠে বলল, দাঁড়ান, চায়ের জল চাপিয়ে আসি। খাট থেকে নামতেই আমি ওর হাত ধরলাম। খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে আমি বসে ছিলাম, ওকে হাত ধরে পাশে নিয়ে এলাম। ও বলল, দেখেছেন, আমি কতটা লম্বা, প্রায় আপনার সমান।

আমি ওর বুকে মুখটা গুঁজে দিলাম। গায়ত্রী বলল, এ কী এ কী! কিন্তু সরে গেল না। আমি দুই হাতে ওর কোমর শক্ত করে জড়িয়ে ওর দুই বুকের মাঝখানের সমতলভূমিতে

গরম নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম, একটু একটু করে বুঝতে পারলাম, ওর বুকে তাপ আসছে, ওর শরীর আকন্দ ফুলের আঠার মতো আমার চোখে-মুখে লেগে যাচ্ছে, ও সরে দাঁড়াচ্ছে না। আমি মনে মনে কাতর অনুরোধ করলাম, গায়ত্রী সরে যাও, মনে মনে বলেছিলাম, গায়ত্রী আমাকে একটা থাপ্পড় মারো, ডেকে জাগাও পরীক্ষিৎকে। আমাকে বলো, নরকের কুকুর। গায়ত্রী, প্রতিবেশী দিয়ে আমাকে মার খাওয়াও, আমি তোমার প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, তোমাকে খুব ভালবাসব, সরে যাও গায়ত্রী।

খাটের ওপর জায়গা হচ্ছিল না বলে আমি লাথি মেরে পাশবালিশটা ফেলে দিলাম মাটিতে। গায়ত্রী সারা শরীর দিয়ে হাসছে। একবার বলল, ও, আপনার মনে এই ছিল। থুতনির একবিঘৎ নিচে কামড়ে গভীর লাল করে দিতে ও নিঃশব্দে আর্তনাদ করল। আমি অশ্লীল ভাবে হেসে বললাম, তোমার শরীরে তো জোর কম নয়। ও বলল, আপনিও বুঝি কবিতা লেখেন?

না, তোমার মুখের ভেতরটা দেখি!

তবে বুঝি গল্প?

দু-একটা। তোমার লাগছে?

না-আ, কী-রকম গল্প, পড়লে বোঝা যায়? নাকি ওদের মতো? মাথা খারাপ!

কী মাথা খারাপ? বোঝা যায় না!

তুমি ওসব পড়তে যাবে কেন? ও-সব পড়ার কী দরকার। মুখটা ফেরাও।

সবাই বলে, অনিমেষ এক জন বড় কবি। আমি পড়ে কিছুই বুঝতে পারি না। আমাকে কপি করতে দেয় মাঝে মাঝে। আমি এক বর্ণ বুঝি না। অবশ্য বলি, খুব চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে শেষের লাইনটা। ও খুশি হয়। গায়ত্রী গোপন আনন্দে হাসল। তারপর বলল, বুঝতে পারি না কেন? লেখার দোষ না আমার মাথার দোষ?

সব তোমার দোষ। তুমি কেন এত সুন্দরী হয়েছ?

আমি আবার সুন্দরী! আমার তো নাক ছোট, চোখের রঙ কটা।

সৌন্দর্য বুঝি নাকে-চোখে থাকে? সৌন্দর্য তো এই জায়গায়। আমি হাত দিয়ে ওর সৌন্দর্য স্থানগুলি দেখিয়ে দিলাম ও চুমু খেলাম। ও বলল, আপনি একটি আস্ত রাক্ষস। আঃ, সত্যি লাগছে, দাগ হয়ে যাবে যে!

আমি বললাম, গায়ত্রী, আমার আর বাঁচার পথ রইল না।

কেন?

এই যে আমি তোমার মধ্যে ডুবে গেলাম। আমি এর আগে কোনও মেয়েকে ছুঁইনি, কিন্তু পরশু দিন থেকেই তোমাকে দেখে– ।

গায়ত্রী পোশাক ঠিক করে উঠে বসল। তাকাল আমার দিকে এক দৃষ্টে। আমার মুখে সম্পূর্ণ সরলতা ছিল, মঞ্চে যে সরলতা দেখা যায়, যা ভয়ংকর বিশ্বাসজনক।

ও, আমারই বুঝি দোষ হল! গায়ত্রীর গলায় একটু ঝাঁঝ।

সব তোমার দোষ, কেন দুপুরে এ-ঘরে একা বসে ছিলে? একথা বলার সময় গোপনে পিছনে হাত দিয়ে ওর ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে দিলাম। ও এঁকে-বেঁকে হেসে উঠে আমার বুকে কিল মারতে লাগল। ওর তীব্র ঘনিষ্ঠতা দেখে হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, আমার নাম কি অবিনাশ না অনিমেষ? এক বছর আগে আমিই কি ওকে বিয়ে করেছিলাম?

আমরা দুজনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি শুয়ে রইলাম। আমি ওর একটা হাত তুলে ঘামের গন্ধ নিতে লাগলাম। এই গন্ধে বেশ নেশা আসে আমার। পরে ঘুম পায়। এই ঘামের গন্ধই মেয়েদের শরীরের গন্ধ। অনিমেষ তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালবাসে। ওর জন্য আমার মায়া হয়। জানেন, আমি খুব সুখী হয়েছি। আমি তো সব পেয়েছি। এমন সুন্দর স্বামী, সংসারের কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, ইচ্ছেমতো দিন কাটাতে পারি। অথচ মাঝে মাঝে তবু আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে কেন বলুন তো?

আমি মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বললাম, ও-সব গণ্ডগোলের প্রশ্ন আমাকে কোরো না।

এই সময় হঠাৎ আমার তাপসের কথা মনে পড়ে। তাপসের স্বভাবই হল পরে আসা। পরীক্ষিৎ নয়, তাপসই আমার সব চেয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার কানের কাছে মন্ত্র দিয়েছে, স্ত্রীলোক মাত্রই সুলভ, ওরা ভালবাসা চায় না, ওরা গোপনতা চায়। ওদের জন্য ভালবাসা খরচ করার দরকার নেই। ওরা চায় গোপনে অত্যাচারিত হতে। আমার মনে পড়ল, গায়ত্রীকে একবারও আমি বলিনি, ভালবাসি, এমনকী অভিনয় করেও না, গায়ত্রীও শুনতে চাইল না। আমি প্রথম ওর ব্লাউজ খুলে স্তনের কুঁড়িতে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলেছিলাম, কী সুন্দর তোমার বুক! তাতেও ও খুশি-চোখে তাকিয়েছিল। কিন্তু আমি তো বলিনি, কী সুন্দর তুমি! আমি ওর সম্পূর্ণ বসন সরিয়ে বলেছিলাম, কী সুন্দর তোমার ঊরু। বলিনি, কী সুন্দর তুমি। সে-কথাও শুনতে ও চায়নি। অর্থাৎ ভালবাসা কথাটা শুনতে চায়নি। মাত্র তিন দিনের চেনা এর মধ্যে আবার ভালোবাসা! ধ্যুৎ!

কী দুঃসাহস গায়ত্রীর, ও-ঘরে পরীক্ষিৎ শুয়ে, মাঝখানের দরজাটা ভেজানো, এমনকী বন্ধ না পর্যন্ত। প্রথম যখন ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম, তখনও ও রেগে উঠলে, অনায়াসে আমি ঠাট্টা বলে চালিয়ে দিতে পারতুম। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এ-সব ঠাট্টা কি আর চলে না! কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা যেন একটা বিশাল তালাভাঙা দরজার মতো ছিল, একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আসলে এর মধ্যে আমার কোনও লোভ, কোনও পরীক্ষা করার ইচ্ছে, অনিমেষকে যন্ত্রণা দেবার চেষ্টা, কিছুই ছিল না। শুধু দুপুরবেলার ঘুমহীনতা, শুধু এইটুকুই, এই জন্যই এসেছিলাম এ-ঘরে। কিছুদিন ধরে সব সময়ে আমি ছটফট করছি, কোনও রকম ভোগে আসক্তি নেই, মেয়েদের দেখলে তেমন একটা ইচ্ছে সত্যই জাগত না, গায়ত্রীও তেমন কিছু রূপসী নয়। হঠাৎ আনমনে চলে এসেছি এ-ঘরে, কথা বলতে

বলতে প্রায় অজান্তেই ধরেছি ওর হাত, স্বাভাবিক ভাবেই একটা হাত চলে গেছে ওর কোমরে, এবং তারপর বুকে মুখ না গোঁজার কোনওই মানে হয় না। আর বুকে মুখ গোঁজার পর কে না চায় পাশে টেনে শোয়াতে! অথচ যেন কী বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল, লোকে শুনলে তাই ভাববে। এরই জন্য খুনোখুনি হয়, আত্মহত্যা। না, শুধু এইটুকুই না বোধহয়, যারা খুনোখুনি বা আত্মহত্যা করে তারা মাত্র এর জন্যই করে না, আর একটা কিছু জড়িত থাকে ভালবাসা। সে-সম্পর্কে আমার তো কোনওই দাবি নেই, বোধ নেই, বোধ নেই বলা ঠিক হল না, আগে ছিল, আজ আর মনে পড়ে না। অনিমেষ, তোমার ভালবাসায় আমি কোনও ভাগ বসাইনি, তোমার স্ত্রীর ওপর কোনও লোভ করিনি, সম্পূর্ণ নির্লোভ আমার এই আজকের দুপুরের একটা ডুব, কোথাও কোনও মলিনতা নেই, একনদীতে কেউ দু'বার ডুব দেয় না। কী ক্ষতি হয় এতে?

হঠাৎ বিষম ভয় পেয়ে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে মারাত্মক অজগরের মতো একটা নীল রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ক্রমশ স্ফীত হতে হতে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়ার রেখাটা এসে আমাকে ছুঁয়ে কেটে গেল। এর মানে পরীক্ষিৎ জেগে আছে, আর শেষ পর্যন্ত আমি পরীক্ষিতের প্যাঁচে পড়লাম। ও যখন আমাকে আর অনিমেষকে নিয়ে ভয়ঙ্কর খেলা খেলবে, আমাকে সুস্থ হতে দেবে না, আমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেবে না। ওর এই নেশা আমি জানি। তাড়াতাড়ি আমি গায়ত্রীর মুখ এ-দিকে ফিরিয়ে দিলাম যাতে নীল ধোঁয়া ও দেখতে না পায়।

এখন চা খাবেন? ফিসফিস করে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল। চলুন না, আমি রান্নাঘরে গিয়ে তৈরি করব, আপনি পাশে বসবেন।

অনিমেষ বুঝি রোজ বসে?

না, ও তখন কবিতা লেখে। এই বলে গায়ত্রী নিয়ন আলোর মতো কুৎসিত ঢঙে হাসল। তারপর বলল, কলকাতায় আপনাদের বাড়ি যাব।

আমি তো মেসে থাকি, সেখানে মেয়েরা থাকতে পারে না।

তবে কোথায় থাকব? যাবনা কলকাতায়? আর দেখা হবে না?

বিমলেন্দুদের বাড়িতে থাকবে। ওদের বাড়িতে অনেক জায়গা আছে। বিমলেন্দু ছেলেও খুবই ভাল।

আমি তো চিনি। বিয়ের সময় এসেছিল। বড্ড গম্ভীর।

ওর চোখে-মুখে আমি লোভ দেখতে পাচ্ছি। আহা, অনিমেষের জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হল। এই সব মেয়ে স্ত্রী কাঁকড়াবিছের মতো, তাদের স্বামীদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে। আমার বুকের মধ্যে তবু হু হু করে কেন বলুন তো? গায়ত্রী একটু আগে আমাকে যে জিজ্ঞেস করেছিল, তার উত্তর আমি জানি। পরীক্ষিৎ কিংবা শেখর হলে অনেক বড় বড় কথা বলত, নিঃসঙ্গতা, উদাসীনতা এই সব। আসলে মেয়েটা একটু বেশি চায়। অল্পে খুশি হতে চায় না। অনিমেষের মতো সূক্ষ্ম ধরনের ছেলেকে বিয়ে করে ওর আশ মিটছে না, চায় একটা ধারাবাহিক নির্লজ্জ অনুষ্ঠান। অনিমেষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশি দিনের নয়, ও যে ঠিক কী-রকম ছেলে আমি জানি না। বিমলেন্দু আর তাপসের বন্ধু হিসেবেই পরিচয় হয়েছিল। তবে ওকে বড় ভাল লাগে আমার, যেন সব সময় তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এমন নিখুঁত। অনিমেষের কোনও ক্ষতি করতে চাই না আমি, আমি সত্যিই অনিমেষকে কোনও দুঃখ দিতে চাইনি। এতে কী আসে যায় অনিমেষের? এ তো হঠাৎ একটা দুপুরের দুর্ঘটনা। দুপুরবেলা কোনও কাজ ছিল না, ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। যাই হোক, অনিমেষ, আমি মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হল তো?

আমার তো কিছুরই অভাব নেই, তবু মাঝে মাঝে বিষম মনখারাপ লাগে কেন বলুন তো?

তোমার মন বলে যে কিছু আছে এই প্রথম জানলাম। কথাটা বলেই বুঝলাম, খুবই বেফাঁস হয়ে গেছে, তবুও গায়ত্রীর ওপর আমার বিষম ঘৃণা এসে গেল। আমি আদর করার ভঙ্গিতে ওকে কামড়ে দিলাম। গায়ত্রী আমার কথায় ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, কিন্তু আমার

মুখে সেই মঞ্চাভিনেতার সরল হাসি দেখে তৎক্ষণাৎ ভুলে গিয়ে নিজেও হাসল। আমাকে বুঝি খুব খারাপ ভাবছেন?

তোমাকে খারাপ ভাবতাম যদি না আজ দুপুরে তোমার কাছে আসতাম। তোমাকে মনে হত নিছক মফঃস্বলের বউ। তুমি একটি রত্ন। তুমি বিয়ের আগে ক'টা প্রেম করেছ?

যাঃ! ও হাসল আবার। আমি মানুষ হয়েছি কাশীতে, ওখানে মেয়েই বেশি, ছেলে কোথায়?

তবু?

সে কিছু না। বলার মতো কিছুনা।

আমি চোখ বুজলাম। একটু একটু ঘুম পাচ্ছে যেন।

খানিকটা পর চায়ের কাপ নিয়ে এসে আমার থুতনিতে একটা টোকা মেরে বলল, উঠুন, এবার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, লজ্জা নেই আপনার? বন্ধু দেখলে কী ভাববে এ-ঘরে এসে খাটে ঘুমোচ্ছেন?

পরীক্ষিৎ? আমি বললাম, কে ওকে গ্রাহ্য করে, ও আবার মানুষ নাকি?

এরই মধ্যে গায়ত্রী কখন স্নান করে নিয়েছে এবং আবার শুদ্ধ পবিত্র লাগছে ওকে। আমার মধ্যে আবার আলোড়ন হল, রূপ দেখেই তাকে নষ্ট করার পুরনো ইচ্ছে জেগে উঠল, হাতও বাড়িয়ে ছিলাম কিন্তু হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনলাম হাত তুড়ি মারার ভঙ্গিতে। ধীরে-সুস্থে উঠে পাশের ঘরের ইজিচেয়ারে বসলাম। গায়ত্রী বোধহয় আশা করেছিল আমি যাবার সময় ওকে একবার চুমু খাব।

গায়ত্রী পরীক্ষিৎকে ডাকতে লাগল। পরীক্ষিৎ ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। বিষম ডাকাডাকিতে ওঠে না। আমি ওকে একটা লাথি মারতেই আস্তে আস্তে চোখ তুলল, তারপর ঠোঁট ফাঁক করল, তারপর জিজ্ঞেস করল, কটা বাজে?

চা। নিন, উঠে মুখ ধুয়ে নিন। গায়ত্রী খুব মিষ্টি করে বলল ওকে।

.

অনিমেষ এল সন্ধের পর। খুব লজ্জিত মুখ। গলার টাই খুলতে খুলতে বলল, ইস, তোদের খুব কষ্ট দিয়েছি। এমন চাকরি, ছুটি নিলেও নিষ্কৃতি নেই! কী করলি সারা দুপুর? পরীক্ষিৎ বিরক্ত মুখে বলল, সারা দুপুর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোলাম শুধু। বিশ্রী ঘুম। অবিনাশ বোধহয় লিখছিল নাকি?

না, আমি লিখি-টিখিনি।

আসবার সময় একটা জিনিস দেখে মনটা বড় ভাল লাগছে। অনিমেষ বলল অন্য মনস্ক গলায়, শ্মশানের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি শ্মশান ধুচ্ছে। সব চিতা নেভানো, পরিষ্কার, কোনও লোকজন নেই। ডোমগুলো একটা সদ্য শেষ হওয়া চিতা জল ঢেলে ঢেলে ধুচ্ছে। আমি খানিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনে হল, পৃথিবী থেকে সব চিতা ওরা ধুয়ে ফেলছে। কোথাও আর কোনও মৃত্যু নেই।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, অনিমেষের মন এখন কবিত্বে ডুবে আছে। আমাদের দুপুর কাটানো নিয়ে ও আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না।

বাইরে বসে চা খেতে খেতে খানিকক্ষণ আড়ার পর পরীক্ষিৎ হঠাৎ অনিমেষকে একটু আড়ালে ডেকে বলল, শোন– ।

আমি সাধারণত কেউ আড়ালে গিয়ে কথা বললে সেখানে যাই না, কান পাতি না, কিন্তু এখন আমি কিছুতে অনিমেষ আর পরীক্ষিৎকে এক সঙ্গে থাকতে দিতে চাই না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিরীহ মুখে বললাম, কী বলছিস রে?

রাত্তিরের দিকে একটু খেলে হত না? পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু গায়ত্রীর সামনে, অনিমেষ বিব্রত মুখে বলল, কোনও দিন তো খাইনি। তুই যদি বলিস–

কোনও দিন খাসনি, আজ থেকে শুরু কর! পরীক্ষিৎ ওকে খোঁচা মারে। আমি বুঝতে পারলাম অনিমেষ সত্যিই চায় না। বললাম, তার চেয়ে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে বসে।

নদীর ধারে চমৎকার ঘাট বাঁধানো। দূরে মার্বেল পাহাড় দেখা যায়। বাকি অন্ধকার। একেবারে শেষ সিঁড়িতে এক জন সাধু বসে আছে অনেকক্ষণ। দূরে শ্মশান। অনিমেষের ধারণা সত্যি নয়। তিনটে চিতা এক সঙ্গে জ্বলছে হু-হু করে। শীতকালের এই শেষ দিকটাতেই বেশি লোক মরে, পুরনো রোগীরা টেকে না। তিন জনে চুপচাপ বসে, ওয়াটার বটলের গ্লাসে জল মিশিয়ে খাচ্ছি। পরীক্ষিৎ অস্বাভাবিক চুপ। সাধারণত ও একটু নেশা হলেই বিষম বক বক করে। আজ এমন চুপ কেন? ওর যে-কোনও ব্যবহারই আমার কাছে সন্দেহজনক লাগছে। অনিমেষ বলল, কাল সন্ধ্যাবেলা রূপগিরি ঝরনায় বেড়াতে যাব, ভারি সুন্দর জায়গাটা।

এই সময় অন্ধকারে সাইকেল রিকশার আওয়াজ হল। আমরা সচকিত হয়ে দেখলাম তাপস। আরে বাবা, বহু দিন বাঁচবি তুই, পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে বলল, সোজা এখানে এলি কী করে, গন্ধ শুঁকে?

না, বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তোরা নদীর পাড়ে এসেছিস। বাড়িতে বসতে পারতাম, কিন্তু গায়ত্রী রান্নায় ব্যস্ত, মাংস চাপিয়েছে, তাই সোজা চলে এলাম।

আমরা তিন জনে তিনটি বাতিস্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়েও মুখোমুখি বসে ছিলাম এতক্ষণ, তাপস এসেই প্রথমে একচুমুকে বোতলের বাকিটুকু শেষ করে নিজের ব্যাগ থেকে একটা পুরো বোতল বার করল। তারপর বলল, খবরের কাগজ পড়িস? এখানে বাংলা কাগজ আসে?

না! কেন রে? আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম।

সুধীন দত্ত মারা গেছেন।

সে কী? এই সেদিনও তো দেখে এলাম সবিতাব্রতর বাড়িতে। রীতিমতো শক্ত চেহারা। কী হয়েছিল?

ঠিক জানি না বিমলেন্দু, শেখর, অম্লান, ছায়া ওরা গিয়েছিল ওঁর বাড়িতে। ওরা শ্মশানে যাবার সময় খাটে কাঁধও দিয়েছিল। আমি যাইনি। মৃত্যুর পর মানিকবাবুকে দেখে এমন অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম যে, আর কারুর মৃত্যুতে যাই না। শুনলাম, হার্ট ফেলিওর। রাত্তিরবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছেন, মাঝরাত্তিরে উঠে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে একবার কাশি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা, চুপ করে থাকার সময় আমার মন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ভুলে বার বার চলে যাচ্ছিল গায়ত্রীর সঙ্গে দুপুরের দিকে সেখান থেকে আমার সুটকেসের চাবিহারিয়ে যাওয়ায়, তারপর পকেটের দেশলাইয়ে, হঠাৎ জলের শব্দে, শ্মশানের আগুনে, তারপর আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তেফিরে এসে খুব আন্তরিকভাবে তার জন্য দুঃখ বোধ করলাম। সবিতাব্রতর বাড়িতে তিনি আমাকে কী কী যেন বলেছিলেন, আমার মনে পড়ল না। আহা, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল তাকে, মার গেলেন! যাকগে কী আর হবে। ওয়াটার বটলে একটুও জল নেই। এখন কোথায় জল পাব?

একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিস, সুধীন দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ, এদের কারুরই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অনিমেষ বলল, অসুখে ভুগে ভুগে মরলে এদের যেন মানাত না।

আয়, সুধীনবাবুর নাম করে আমরা বাকি বোতলটা খাই। পরীক্ষিৎ বলল। শেষের দিকে আমাদের চার জনেরই বেশ নেশা লেগে গেল। আমি কতবার মনে করার চেষ্টা করলাম, স্যুটকেসের চাবিটা আমি কলকাতাতেই ফেলে এসেছি, না এখানে এসেহারাল? কিছুতেই মনে পড়ে না।

পরীক্ষিৎ ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে। সাধুবাবার সঙ্গে কী নিয়ে কিছুক্ষণ বচসা করে ফিরে এসে বলল, না, নেই!

কী?

গাঁজা।

তাপস বলল, রাত্তিরটা কী করবি?

ঘুমোব, আমি বললাম।

ইয়ার্কি আর কী! এত দূরে এলাম ঘুমোবার জন্য? অনিমেষ ওর বউকে নিয়ে এক ঘরে ঘুমোবে, আর আমরা তিন-তিনটে মদ্দা এক ঘরে? ধৎ, এর কোনও মানে হয়?

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা, গায়ত্রী পাশের ঘরে একা থাক, আর আমরা চার জনে এক সঙ্গে সোব।

কেন বাবা। তাপস ধমকে উঠল, আমি না হয় তোমার বউয়ের সঙ্গে আজ শুই, আর তুমি ওদের সঙ্গে শোও। একটা রাত্তিরে কিছু হবে না। আমি বিয়ে করলে তুমি এক দিন শুয়ে নিও। শোধ হয়ে যাবে।

তাই নাকি! হা-হা করে পরীক্ষিৎ অট্টহাসি করে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল, হাসি থামতেই চায় না। চমৎকার বলেছিস, ওফ। আবার হাসি। শেষে একটা থাপ্পড় মেরে ওকে থামাতে হল।

অনিমেষ মুচকি হেসে বলল, এ-সব কি আর এত সহজে হয়! অন্য জনেরও তো একটা মতামত আছে।

তাপস বলল, ঠিক আছে, আমি ওর মত যাচাই করে দেখছি। তোর কোনও আপত্তি নেই তো?

এ-সব আলোচনা যত হয়, ততই আমার ভাল। ব্যাপারটা হালকা দিকে থাকে। আমার ঘটনা পরীক্ষিৎ বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এরা তিন জনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু! কত স্বপ্ন, পরিকল্পনা করেছি এক সঙ্গে। কিন্তু আজ আমার কেমন খাপছাড়া লাগছে। মনে হচ্ছে আমি ওদের দলের বাইরে, আমার সঙ্গে আর মিলছে না। এই খেপে ওঠানো সময়, সব রকম নিয়মহীনতা। এখনও তো পৃথিবীতে আছে কত মানুষ, আত্মবিস্মৃত, হেমন্তের অবিরল পাতার মতো। ঘুমোত যায় ও জেগে ওঠে, দশটায় অফিস যাবে বলে সারা সকালটাই যায় সেই প্রস্তুতিতে, এবং সত্যি সত্যিই অফিস যায় রোজ। তারা সিনেমা দেখে আনন্দ পায়, বউকে নিয়ে রিকশায় চাপতে পারে, তাস খেলায় দু'বাজি জিতে স্বর্গসুখ পায়। আমিও তাদের মতোই বাঁচতে চাই, দু-চারটে গল্প কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার ভার আমাকে কে দিয়েছে? কী এমন বিষম দরকারি এই বন্ধুসঙ্গ, এই অসামাজিকতা, এই বিবেকহীন, বাসনাহীন, রমণীসম্ভোগ! না, আমি এ-সব আর চাই না। এখান থেকে কলকাতা গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব, বহু দিনের ঘুম, সারাটা জীবন ঘুমন্ত মানুষের মতো ঘুরব-ফিরবঅজ্ঞানে। আমার শিরা-উপশিরায় সমস্ত রক্ত ভীত এবং ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এ-সব বখাটে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমি মোটেই মিশতে চাই না আর।

কিন্তু তার আগে যদি এবারের মতো বেঁচে যাই, পরীক্ষিৎকে সামলাতে পারি, যদি দ্বিধাহীন রেখে যেতে পারি অনিমেষের মন। হঠাৎ কেন আজ দুপুরবেলা! খুব অন্যায় কি? আমি কিন্তু সত্যিই অনিমেষকে কোনও কষ্ট দিতে চাই না।

পরীক্ষিৎ হাই তুলে বলল, অসম্ভব ঘুমিয়েছি দুপুরে। এখনও ঘুম গায়ে লেগে আছে। তুই কী করলি রে?

অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পরীক্ষিতের। যে যেটা চিন্তা করে গোপনে, ও ঠিক সেই প্রসঙ্গে কথা বলবে। অন্তত আমার সঙ্গে তো অসম্ভব মেলে। বললাম, দূরের বাঁধের কাছটায় গিয়েছিলাম আদিবাসীদের দেখতে। কিন্তু আজকাল আর আদিবাসী-মেয়েরা তেমন সুন্দরী নেই। পাঁচ-ছ'বছর আগেও ছত্তিশগঢ়ি মেয়েদের যা দেখেছি! এখন ব্লাউজ-শায়া পরে, কাচের চুড়ি পরে না, স্নান করার সময়ও সব কিছু খোলে না।

অনিমেষ বলল, আপনি বুঝি ভেবেছিলেন সব কিছু রেডি থাকবে খুটে-টুলে, আর আপনি গিয়ে চোখ ভরে দেখে আসবেন। আদিবাসীরাও সভ্য আর সজাগ হয়ে যাচ্ছে।

আমি অন্য মনস্ক গলায় বললাম, হয়তো আগেই ওরা বরং সভ্য ছিল, এখন আমাদের মতো অসভ্য হচ্ছে। বলেই মনে হল, একথাটা বেশ বোকাবোকা হয়ে গেল, কারণ অনিমেষের কথায় বোধহয় ঠাট্টার সুর ছিল। কিন্তু আমার দুপুর-কাটানোর প্রসঙ্গের চেয়ে ছত্তিশগঢ়ি মেয়েদের নিয়ে সাধারণ কথাবার্তা ভাল। তাছাড়া, আমি আরও বললাম, সাঁওতালরা...আমার মনে হয় না, তাঁ, আমি..কী কী বলেছিলাম মনে নেই, তবে আদিবাসী প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু মোক্ষম কথা বলল পরীক্ষিৎ, অবিনাশটা মেয়েছেলে ছাড়া কিছু জানে না। এই তিন দিন তুই কাটাচ্ছিস কী করে? নাকি চালাচ্ছিস কিছু গোপনে?

আমার চোখ দুটো হঠাৎ ঝিমিয়ে এল। ইচ্ছে হল ওকে খুন করি সেই মুহূর্তে। একবার ওর দিকে তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত উদাসীন হেসে আমি অনিমেষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, আপনি আজকাল কী লিখছেন?

অনিমেষ বলল, না, কবিতার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি বোধহয়। কলম হাতে নিয়ে বসি, সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু ভাষা নেই।

আমার বড় খিদে পেয়েছে, তোদের পায়নি? তাপস জিজ্ঞেস করে। গায়ত্রীকে দেখে এলাম মাংস চাপিয়েছে। চল যাই।

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। পরীক্ষিতের পা টলছে। তাপস আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, মুখটা গম্ভীর করলে তোকে একদম মানায় না, অবিনাশ।

.

চার জনে আমরা এক ঘরে শুয়েছি। পাশের ঘরে গায়ত্রী। আজ খাবার পর সকলে এক সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম, গায়ত্রীও। তাপস খুব জমিয়ে দিয়েছিল। তাপস এসে পড়ায় খুব ভাল হয়েছে, পরীক্ষিতের পাগলামি আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে না। তারপর বেশ রাত হলে অনিমেষ গায়ত্রীকে বলল, আজ এ-ঘরেই থাকি। তোমার একা থাকতে ভয় করবে?

না, ভয় কেন! না না। গায়ত্রী মিষ্টি হেসে বলল।

ভয় করলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। তাপস সরল মুখে জানাল।

তাহলেই আমার বেশি ভয় করবে। সমস্বরে হাসি। গায়ত্রীর চোখের দিকে তাকাইনি।

গায়ত্রী ও ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দেবার পর আমরা চার জনে খানিকক্ষণ তাস খেলোম। আমার ভাল লাগছিল না। একবার খুব ভাল হাত পেতেই আমি তাসগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, নাঃ, এবার তোল।

প্রত্যেকেরই অল্প নেশা ছিল তখনও, সুতরাং শুয়ে শুয়ে গল্প করার নাম করে আলো নিভিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না।

মাঝ রাতে বুকের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে জেগে উঠলাম। অসম্ভব লেগেছিল, স্পষ্ট আর্তনাদ করেআমি উঠেবসলাম। আমার পাশে তাপস, তারপরঅনিমেষ, তারপর পরীক্ষিৎ। আমার চোখে তখনও ঘুমঘোর কিন্তু বুকে যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে এরা তিন জনেই বহুক্ষণ ঘুমন্ত। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতেই পরীক্ষিতের সুরেলা গলা শুনতে পেলাম, অবিনাশ কোথায় গিয়েছিলি রে?

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি ওর মতলব। বললাম, কোথাও যাইনি তো, হঠাৎ..।

এই যে দেখলাম, তুই বাইরে থেকে এলি, মিটিমিটি হাসল পরীক্ষিৎ, আলো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সাপখোপ আছে।

এবার বুঝলাম, ও কী চায়। ও সাজাতে চায়, আমি চুপি চুপি গিয়েছিলাম। অর্থাৎ গায়ত্রীর ঘরে হয়তো। পরীক্ষিতের খাড়া নাকটার দিকে একবার তাকালাম। তারপর পাজামার দড়িটা ভাল করে বেঁধে ওর দিকে এগুতে যাবার আগেই অনিমেষ বলল, না, না, আমি দেখেছি পরীক্ষিৎ আপনাকে ঘুষি মেরে জাগিয়েছে।

রাগ ভুলে সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরনো হুল্লোড়ের ভাবটা এসে গেল। সে কী মশাই, আপনি জেগে আছেন? কেন? ওঃ হো- বলে এমন জোরে হেসে উঠলাম যে তাপসও ঘুম ভেঙে তাকাল। আমার মধ্যে একটা অসভ্য, বিকৃত, মজার ইচ্ছে আগেকার দিনগুলোর মতো হঠাৎ ছটফট করে উঠল। উঠুন, উঠুন, অনিমেষকে হাত ধরে টেনে তুললাম, তারপর গায়ত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম বেশ শব্দ করে। এক শরীর ঘুম নিয়ে গায়ত্রী উঠে আসতেই আমি অনিমেষকে হিড়হিড় করে টেনে আনলাম। অমন ডেলিকেট ধরনের ছেলে অনিমেষ, আমার এ-রকম বর্বরতায় খুব বিব্রত বোধ করছিল, কিন্তু ওর চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি, ওকে উঁচু করে তুলে গায়ত্রীর ঘরে ঠেলে দিয়ে বললাম, এই নাও তোমার জিনিস। তারপর দরজা টেনে দিলাম।

আমার ব্যবহারটা বোধহয় জমল না, বোধহয় খানিকটা অতি-নাটকীয় হয়েছিল, তাই পরীক্ষিৎবা তাপস যোগ দেয়নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ শোনার পর তাপস জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার রে?

কিছু না, ঘুমের ঘোরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাই বেচারাকে ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। পরীক্ষিৎ বলল, শোন অবিনাশ...। আমি বললাম, আজ নয়, আজ আমার ঘুম পেয়েছে, কোনও কথা শুনবনা।

সেদিন রাত্রে আমি একটা ছোট স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নটা হয়তো ছোট নয়, কিংবা অনেকগুলো স্বপ্ন। কিন্তু আমার অল্প একটু মনে আছে।

স্বপ্নটা এই রকম :

প্রশ্ন: তোমার জিভটার বদলে কী দেবে?

আমি: আর যাই হোক, দু'চোখের মণি নয়।

প্রশ্ন: তবে?

আমি: আমার একটা পা –।

তা কি সমান হল? জিভের সমান একটা পা?

তবে, আমার হাতের আঙুলগুলো নিন, ডান হাতের আঙুল, যে-হাত দিয়ে আমি লিখি।

না, জিভ থাকলে তুমি অন্য লোক দিয়েও লেখাতে পারবে।

তবে কী দেব? বুকের একটা পাঁজরা নিন।

না, জিভের বদলে আর কিছু হয় না। আমি তোমার জিভটাই চাই।

কেন? কেন?

তুমি এক ধরনের সুখ চাও, তাই-ই পাবে। সে-সুখের জন্য মানুষের জিভটা অবান্তর।

না না।

কেন, পৃথিবীতে বোবা মানুষেরা যৌনসুখ পায় না?

কী জানি। পায় হয়তো। অন্তত পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, পাবনা। আমাকে দয়া করুন!

কাজ সেরে যখন চলে যাচ্ছিল তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, আপনি কোন দেবতা তা তো জানা হল না! কিন্তু তখন আমার জিভ নেই। সুতরাং আমার কথা বোঝা গেল না, দেবতাটি অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। আমি দরজার পাশে পরীক্ষিৎকে পুরো ব্যাপারটার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম।

পরদিন সকালে আমার ঘুম একটু দেরিতে ভেঙেছিল। স্বপ্নের কথাটা সকালে মনে পড়েনি। মনে পড়ল অনেক দিন পর, আজ লেখার সময়। আমি মুখ ধুতে বাথরুমে পেস্ট আনতে গেছি, গায়ত্রী বেসিনে কাপ-ডিশ ধুচ্ছিল, আমাকে দেখে চাপা গলায় বলল, আপনি একটি অসভ্য ও ইতর। কাল রাত্তিরে কী করলেন?

উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে পড়ল জিভ-ছোলাটা আনা হয়নি, মুখ ধোবার সময় ওইটা চাই-ই, নইলে বড় নোংরা লাগে। আমি আবার বাথরুমে ঢুকতেই গায়ত্রী সামান্য একটুও কি-ছি ছি। আমি বললাম, খুব কি খারাপ করেছি? অনিমেষের জন্য আমার মায়া হচ্ছিল।

লজ্জা করে না আপনার?

আমি ওর নিচু থাকা ঘাড়ে আলতো দাঁত বসিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও বনবিড়ালির মতো ঘুরে দাঁড়াতেই আমি বেরিয়ে গেলাম।

.

আমলকি গাছের ছায়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছে পরীক্ষিৎ, তাপস খবরের কাগজের একটা শিটের উপর শুয়ে আর একটা শিট সম্পূর্ণ খুলে ধরে পড়ছে। অনিমেষ নেই। বেশ

ঝকঝকে সকালটি, এক ছিটে মেঘ নেই আকাশে, ফটফট করছে নীল রঙ। তাপস চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, ওর চোখের মণি দুটোও খানিকটা নীলচে। ঘড় ঘড় করে একটা তিন চাকার কিম্ভুতকিমাকার গাড়ি চালিয়ে একটা লোক এসে উপস্থিত হল। আওয়াজটায় বিরক্ত হয়েছিলাম। আমি চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলাম, কী চাই? লোকটার বেশ তেল-চকচকে গোল মুখখানি, কিন্তু গলা কিংবা ঘাড় বলে কিছু নেই, থুতনির নিচেই বুক। বলল, আমি আজ্ঞে, মনোহারি জিনিসপত্তর এনেছি।

কী আছে তোমার?

পাঁউরুটি, বিস্কুট, গরমমশলা, বাঁধাকপি, তেজপাতা, ঘি, তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, শোনপাপড়ি, আসল বাঙালির তৈরি –। লোকটা অনেক কিছু বলত এমন ওর মুখের ভাব, থামিয়ে বললাম, চাইনা।

আজ্ঞে?

চাইনা।

আজ্ঞে?

বিরাট চিৎকার করে বললুম, চাইনা। লোকটা বুঝতে পেরে গাড়ি ঘোরাল। তাপস মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিল, শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ তুলতে পারছিল না। এবার হঠাৎ বলল, ডাক, ডাক লোকটাকে। ভারি চমৎকার ওর মুখখানা, ওকে আমার কাজে লাগবে। বিষম হল্লা করে লোকটাকে অনেকক্ষণ ডাকার পর ঘাড় ফেরাল, ঠিক ঘাড় না, বুক ফেরাল বলা যায়। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এল।

দোকান খোল, দেখি কী আছে?

খাবাব-টাবার নেবেন, না তরকারি, স্টেশনারি?

কী খাবার, দেখাও।

চন্দ্রপুলি, তিলকুটো, শোনপাপড়ি।

দাম বলো, কত করে?

দু’আনা পিস। ডজন। দেড় টাকা। খাঁটি এক টাকা ছ’আনা পাবেন, স্যার।

বারো আনা দিতে পারি, এর চেয়ে বেশি হয় না ভাই।

না, পারব না স্যার, কেনা দাম পড়ে না।

ও, তোমার কেনা জিনিস নাকি? আমরা ভেবেছিলাম ঘরে তৈরি। তবে কে কিনবে?

না, মানে মালপত্তর স্যার, কিনতেই হয় স্যার, খরচ পোষায় না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ক্ষতি করতে চাই না। তুমি আদ্দেক-আদ্দেক দিয়ে যাও।

আধ ডজন করে নেবেন?

না, সব জিনিসের আদ্দেক। বারো আনায় চন্দ্রপুলির চন্দ্রটা দিয়ে যাও, পুলিটা তোমার থাক।

চন্দ্র? শুধুচন্দ্র?

হ্যাঁ। যেমন ধরো তিলকুটো। তিলগুলোই দাও (না হয় শালা তর্পণ করব এক মাস), তাপস আমার দিকে তাকিয়ে বলল। তুমি কুটোগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো।

পারব না স্যার। লোকটা খানিকক্ষণ কী ভাবল, তারপর বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তুমি হয়তো ভাবছ, পরীক্ষিৎ বলল, আমরা প্রথম দিকটা মানে ভাল দিকটা নিয়ে নিচ্ছি বলে তোমার ক্ষতি হচ্ছে। বেশ তো, শোনপাপড়ির প্রথমটুকুই তুমি নাও, আমাদের পাপড়িগুলোই দাও! কী হে?

না, হয় না, তা হয় না।

পাঁউরুটির কোন ভাগটা নিবি? তাপস জিজ্ঞেস করল, পাঁউ না রুটি?

আমি রুটি খাই না। পরীক্ষিৎ জানাল।

তবে বুঝি পাঁউ খাস? দাও, ওকে পাউটা দিয়ে দাও। পাঁউ দিতে পারবে তো?

লোকটা চুপ। ওর চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

আর কী আছে দেখি? পরীক্ষিৎ এগিয়ে ওর দোকানগাড়ির ঢাকনা খুলে দেখল।

দারচিনি মানে দারুচিনি, শুধু দারু হ্যায় তুমারা পাশ? মহুল কিংবা পচাই?

না।

অ! দারচিনিকে আবার গরম মশলাও বলে। গরম মশলাটার পুরোটাই নেব। আমি মশলাটুকু খাব আর অবিনাশবাবুকে গরমটুকু দিয়ে দাও। তেজপাতারও পাতা চাই না। তেজ দাও অবিনাশবাবুকেই, ওর দরকার। আমি হাসলাম। লোকটা পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল বার করে মুখ মুছল। এটা কী ও পরীক্ষিৎ হাত ঢুকিয়ে একটুকরো আদা তুলল। আচ্ছা, ভাল জিনিস পাওয়া গেছে। পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল।

পুরোটা নিসনি, পুরোটা নিসনি, ওর ক্ষতি হয়ে যাবে। শোনো, আমি বললুম, এরও তুমি আদ্দেক বেচে দাও, তোমার লাভই হবে ভাই। আদার আ-টুকু দাও পরীক্ষিৎবাবুকে, তুমি

দা-টা নিয়ে যাও। এরপব তুমি চাই দা, চাই দা বলে ফেরি করবে। লোকে কিনতে এলে তুমি দায়ের বদলে আদা বেচে দেবে! আর পরীক্ষিৎবাবুআ নিয়ে যা করবার করবেন।

দুর শালা! যত সব বাজে ঠাট্টা এই নিরীহ লোকটাকে নিয়ে। তাপস বলল, আসল জিনিসটার খোঁজ নে!

পরীক্ষিৎ বলল, দাঁড়া, আমি বার করছি। খুব মনোযোগ দিয়ে বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো দেখল। তারপর একটা পাউরুটি কাটা ছুরি হাত দিয়ে তুলল। হ্যাঁ, এতেই অনেকটা হবে। শোনো ভাই, সিরিয়াসলি, তোমার কাছে মেরামত করার জিনিস আছে? এই ছুরিটা মেরামত করতে হবে। লোকটা কিছু একটা উত্তব দিল, বোঝা গেল না।

এই ছুরিটা মেরামত করা দরকার বুঝতে পারছ না? চন্দ্রপুলি তো দেখালে, চন্দ্রবিন্দু আছে?

লোকটা বিকট ঘড় ঘড় শব্দ করল।

আঃ, বুঝতে পারছ না? ছুরির ছ' য়ের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসাতে হবে, আর একটা অনর্থড় লাগবে মানে ড-এ শূন্য-র। এইটুকু বদলাতে পারলেই অবিনাশবাবু যত ইচ্ছে দাম দেবে। জিনিসটা তাহলে কী হল? হুঁড়ি। তোমার হাতে চুড়ি-টুড়ি আছে?

আসল কথায় এসো তো ভাই, তাপস বলল নিচু গলায়, তোমার সন্ধানে মেয়েছেলে-টেলে আছে?

আজ্ঞে?

দেখো না ভেবে। তোমাদের এখানে এসেছি, দাও দু'একটা জোগাড় করে। সন্ধের দিকে নিয়ে আসবে।

পারব না স্যার।

পারবে না একথা বলতে নেই! ছিঃ! চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। চেষ্টা করো আগে, চেষ্টা করার আগেই কী করে বুঝলে যে পারবে না?

লোকটা একটা অপ্রত্যাশিত কথা বলল এবার। প্রায় ফোঁপানো গলায়, বাবু, আমি লেখাপড়া শিখিনি আপনাদের মতে, আমি গরিব মানুষ, আমি গরিব, ওই –

একটুক্ষণ আমরা তিন জনেই চুপ করে রইলাম। তাপস লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি গরিব মানুষ। হায় হায়, আগে বলোনি কেন, আমরাও বিষম গরিব, হায় হায়। তাপস লোকটার গলা জড়িয়ে ধরতে গেল, ওঃ, বুক জ্বলে যায়, আমরা কত গরিব জানো না, আমাদের কিছু নেই, আমরা তোমার আধখানা করেও কিনতে পারব না, চলে যাও, আমরা ভিখিরি, লেখাপড়া-জানা ভিখিরি ওঃ। তাপস হঠাৎ এমন মড়াকান্না জুড়ে দিল যে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, আর লোকটাও গাড়ি ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল মন্থর পায়ে।

গায়ত্রী লোকটাকে বলল, ও মুকুন্দ, আধ সের পিঁয়াজ দিয়ে যাও।

লোকটা কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধরা গলায় বলল, পুরোটাই নেবেন তো মা, আদ্দেক দিতে পারব না আমি।

তাপস সমেত আমাদের তিন জনের হাসির চিৎকার অনিমেষ গেটের কাছ থেকে শুনতে পেল।

.

দুপুরে কী কী করেছিলাম মনে নেই। খুব বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে। আর খাবার সময় গায়ত্রী ভেবেছিল আমি শক্ত করে ধরেছি, সুতরাং গায়ত্রী ছেড়ে দিল এবং আমি ধরিনি, বাটিটা পড়ে ছিটকে ভেঙে গেল। আমি ব্যতীত সকলে হাসাহাসি করার সময় পরীক্ষিৎ টেবিলের তলা থেকে আমার পায়ে লাথি মেরেছিল।

বিকেলবেলা আমরা একটা সাপ মারলাম। দলবল মিলে বেরুতে যাচ্ছি, বাড়ির গেটে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাপস বলল, সাপ! সাপ! গায়ত্রী! প্রত্যেকেই এক সেকেন্ডে তিন পা পিছিয়ে দেখলাম, গায়ত্রীর খুব কাছে একটা সাপ -বেশ বড়, কালো বেল্টের মতো, এতগুলো তোক দেখে চট করে ফুলবাগানে ঢুকে পড়ল। সর্বনাশ, বাড়িতে সাপ পুষে রেখেছিস? লাঠি নিয়ে আয়, তাপস বলল, যা যা। পরীক্ষিৎ গম্ভীরমুখে জানাল, ওটা সাপ নয়, এই শীতে সাপ আসবে কোথা থেকে? ওটা আসলে শয়তান। গায়ত্রীকে কোনও একটা গোপন কথা বলতে এসেছিল।

যাঃ, ঠাট্টা নয়, আমার বুক কাঁপছে এখনও, উঃ! গায়ত্রী সরে এসে অনিমেষ ও আমার মাঝখানে দাঁড়াল। পরীক্ষিৎ কথাটা এমন সুন্দর ভাবে বলেছে যে, আমি ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সাপটা গায়ত্রীর সায়ার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল, এই রসমণীর দুই উরুর মাঝখানে কোন গুপ্ত কথা বলে। যেন কোনও পৌরাণিক কাহিনির সত্য এই মুহূর্তে এখানে ঘোষিত হয়ে গেল। শয়তান শুধু নারীর কাছেই সে-সত্য ঘোষণা করে যেতে পারে। এই মুহূর্তের জন্য দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, চাক্ষুষ ভাবে দৃশ্যটা সত্যই ভয়ঙ্কর, আমি তাই অনিমেষকে বললাম, যান লাঠি নিয়ে আসুন, ওটাকে কি এখানে পুষে রাখবেন নাকি?

আমি আসছি, তাপস দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সুরকির পথ পেরিয়ে। ও এমন ভিতু স্বভাবের, যাবার সময় এমনভাবে গেল পা ফেলে, যেন ওর কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই এখন সাপে ভর্তি।

কী দরকার ওটাকে মারার, অনিমেষ বলল, এর আগেও ওটাকে কয়েক বার দেখেছি, কোনও ক্ষতি করে না কিন্তু।

কী যা-তা বলছেন! সাপ রোজ ক্ষতি করেনা, একদিনই করে। অন্ধকারে গায়ে পা দিলে চৈতন্যদেবের বাণী শোনাবে না। এখন ওদের হাইবারনেশন পিরিয়ড শেষ হচ্ছে, খোলস

ছেড়ে বেরিয়ে আসছে নতুন জীবনে। এখন ওদের তেজও যেমন, বিষও সেই রকম মারাত্মক।

পরীক্ষিৎ বলল, যাই বল, জিনিসটা দেখতে ভারি সুন্দর। কীরকম উদাসীন ভঙ্গিতে চলে গেল, অকারণে মারিসনি।

তাছাড়া, ওটার তো বিষ না-ও থাকতে পারে। অনিমেষ বলল, অত বড় সাপ-বোধহয় দাঁড়াস, অর্থাৎ যাকে ঢ্যামনা বলে।

মোটই ঢ্যামনা নয়, ঢ্যামনা হয় ছাই-ছাই হলুদ, এটা একদম কালো।

বিষ নিশ্চয়ই আছে, পরীক্ষিৎ বলল, সম্পূর্ণ বিষহীন কোনও জিনিস কোনও মহিলার কাছে আসবেই-বা কেন?

ধ্যাত, আপনি সব সময় অসভ্য কথা বলেন।

অনিমেষ আর আমি হাসলাম। পরীক্ষিৎ আমার চোখে চোখ ফেলেছে।

তাপস দুটো দরজার খিল এনে এগিয়ে দিয়ে বলল, কে মারবে মারো, আমি ওর মধ্যে নেই। তবে মারা দরকার। এই হুস, বেরিয়ে আয়। বলে একটা খবরের কাগজে আগুন জ্বালিয়ে ঝোপটায় ছুঁড়ে দিল।

সাপটা ওখানেই আছে, কোথাও যায়নি, আমি লক্ষ্য রেখেছি, গায়ত্রী বলল।

কিন্তু ফুলগাছগুলো নষ্ট হবে। পরীক্ষিৎ নিচু গলায় বলল।

অনিমেষ লাঠিটা তুলে এগুতে গিয়েও যেন এই কথা শুনেই পিছিয়ে এল। ওদের অস্বাভাবিক কবিত্ব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটু বিরক্ত বোধ হল। ঝাঝালো গলায় বললাম, ওগুলো তো দোপাটির ঝোপ, বিনা যত্নেই হয়, আবার হবে। তাছাড়া শোন, সাপ

হচ্ছে মানুষের শত্রু। শত্রুকে কখনও আক্রমণের সুযোগ দিতে নেই, তার আগেই মারতে হয়।

ওঃ! পরীক্ষিৎ হঠাৎ চুপ করে গেল, যেন আমি এক অমোঘ যুক্তি দিয়েছি যার উত্তর হয় না। তারপর বলল, যদি মারতেই হয় সর আমি মারছি। পরীক্ষিৎ ঝোপটার অনেকটা কাছে এগিয়ে গেল খিল হাতে, তারপর খুব সহজেই কাজ হয়ে গেল। লাল-সাদা ফুলের ঝাকের ওপর আন্দাজে একটা বাড়ি মারতেই স্প্রিঙের খেলনার সাপের মতো সাপটা তড়াক করে ফনা তুলে উঁচু হল। আঁকরে গায়ত্রী একটা সরু আওয়াজ তুলে পিছিয়ে গেল দৌড়ে। পরীক্ষিৎ সাপটার দিকে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল, একটুও ভয় নেই, যেন ও কোনও এক গুণিনের মতো মন্ত্র দিয়ে বশ করতে চায় সাপটাকে। আমি ওর ডান পাশে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দুজনের হাতেই খিলের ডাণ্ডা, একটু দূরে সাপটা অল্প অল্প দুলছে। পরীক্ষিৎ আমার দিকে তাকাল, ওকে একেবারে মারতে হবে বুঝলি, পালাবার চেষ্টা করলে মুশকিল হবে। তারপর যেমন ভাবে গালে থাপ্পড় মারে, সেই রকম পরীক্ষিৎ ওর লাঠিটা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সাপটার ফনায় মারল, আমিও সেই সময় লাঠি চালিয়েছিলাম, ঠক। করে শব্দ হল দু'জনেরটা লেগে। সাপটা মাটিতে পড়তেই আমরা দুজনে ধুপধুপ করে পেটালাম। অল্প সময়েই সাপটা নিস্তেজ হয়ে গেল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, এখন এটাকে কী করবি? সাপকে ফেলে রাখলে আবার বেঁচে যায়। বৃষ্টি পড়লেই বেঁচে উঠবে। পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কী করবি? সাপটা কিন্তু জাতের, খাঁটি চন্দ্রবোড়া।

কিন্তু কে এখন ওটাকে পোড়াবে বসে বসে?

এক কাজ করা যাক, আমি বললাম, ওটাকে নিয়ে চল বড় রাস্তায় ফেলে দিই। কয়েকখানা বড় বড় ট্রাক ওটার ওপর দিয়ে চলে গেলেই হবে।

সেটা মন্দ না। পরীক্ষিৎ ওর লাঠিটার মাথায় মরা থ্যাৎলানো সাপটাকে তুলল। তারপর সৈন্যবাহিনীর শোক-শোভাযাত্রার আগে নিচু পতাকা হাতে যে-লোকটা হাঁটে তার মতো

ভঙ্গিতে পরীক্ষিৎ এগিয়ে চলল। যেন ওর সত্যিই খুব দুঃখ হয়েছে। পরীক্ষিৎকে আমি জ্যান্ত মুরগির ছাল ছাড়াতে দেখেছি। জীবজন্তুর ওপর ওর দয়ামায়া বোধ যে খুব প্রবল, তার তো কখনও পরিচয় পাইনি। কিন্তু বোধহয় সাপ, টিকটিকি এই জাতীয় ঠাণ্ডা রক্তের জীবের প্রতি ওর সত্যিকারের কোনও টান আছে।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। লাল আকাশটার কোনও এক দিকে সূর্য। এই সময় সূর্যের রশ্মিগুলো আলাদা ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এখন একটু চেষ্টা করলেই কল্পনা করা যায় যে, সন্ধেবেলার সূর্য থেকে অসংখ্য লাল রঙের সাপ পৃথিবীতে ঝরে পড়েছে। পরীক্ষিৎ লাঠিটা বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগে একবার সূর্যের দিকে তাকাল।

অনেক দিন আগে আমরা এখানে একবার বেড়াতে এসেছিলাম। বছর সাতেক আগে। তখনও জায়গাটা অন্য রকম ছিল। একটা ঝিরঝিরে ঝরনা। পাশে ছোট মন্দির। এখন দেখছি রীতিমতো একটা নদী। বেশ গভীর জল মনে হয়, প্রবল স্রোত। ও-পারে ব্রিজ বানিয়েছে, এসব ব্রিজ-ট্রিজ কিছুই আগে ছিল না। বেশ ঝকমকে চওড়া কংক্রিটের, নদীর চেয়ে ব্রিজটাও কিছু কম সুন্দর দেখতে নয়। প্রশস্ত চাঁদের আলোয় ফট ফট করছে সাদা রঙ। গায়ত্রী একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে, সুতরাং প্রায়শই ও মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার সঙ্গে। আশেপাশে লোকজন নেই। মন্দিরের কাছে কয়েকটা দোকান। অনিমেষ কী যেন আলোচনা করছে তাপসের সঙ্গে। আমি রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছিলাম নিচে। কী খুঁজছিলাম মনে পড়ছিল না, গভীর মনোযোগ দিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছি অথচ কেন, ঠিক কী দেখতে চাই যেন মনে আসছেনা। কী খুঁজছি অনেকক্ষণ পর মনে পড়ল, একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেকে। স্পষ্ট মনে আছে, আগের বার যখন এসেছিলাম, আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম ঝরনাটার পাশে। আমার বার বার মনে হল, ঝুঁকে তাকালে এখনও সেই ছেলেটাকে দেখতে পাব। ঝরনার (এখন নদী) পাশে একটি মুগ্ধ যুবা বসে আছে। না, কিছু দেখা যায় না অন্ধকারে। তখন কী সুন্দর চোখ ছিল আমার, ঝরনার চাঁদের আলো দেখলে কী ভালই লাগত। আমি হু-হু করে ভেসে আসা হাওয়ায় বার বার নিশ্বাস নিয়েছিলাম। আজ কিছুই ভাল লাগছে না, অথচ আজও এ জায়গাটা কম

সুন্দর নয়। বন্ধুরা, গায়ত্রী, চমৎকার ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না, এমনকী যথেষ্ট সিগারেট আছে পকেটে। কিন্তু আমার খালি মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাই। বন্ধুদের কারুকে না বলে পালাই। যেন ভুল জায়গায় এসেছি। এই যুগপৎ জ্যোৎস্না ও হাওয়ার রাত আমার জন্য নয়। বুকের মধ্যে ব্যথা ও ভয় হচ্ছে। বিষম পালিয়ে যাবার ইচ্ছে। তবু নিচে জলের কাছে পাথরের ওপর সেই ছেলেটাকে যদিবসে থাকতে দেখি, তবে হয়তো এবারের মতো বেঁচে যাব।

তাপস বলল, আই নীড এ উওম্যান, না হলে আমি ঠিক জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াতে পারি না।

এবার একটা চটপট বিয়ে করে ফ্যাল, অনিমেষ বলল।

ভাগ শালা। চল অবিনাশ, ওই চায়ের দোকানটায় যাই, যদি ফোক টোক জোগাড় করা যায়।

না রে, আমার ইচ্ছে নেই।

বিয়ে করাটাকে অত ঠাট্টা করিস না, অনিমেষ বলল।

কেন, কী এমন পরমার্থ পেয়েছিস?

অনেক সুবিধে আছে। আমি তো ভাই বেশ সুখে আছি।

কে চার হাত-পায়ে সুখ চায়! তাছাড়া সুখটাই-বা কী? কানের দুল, শাড়ি, মেনস্টুরেশান, ডাক্তার, নেমন্তন্ন;-সব চেয়ে মুশকিল, কখনও একা থাকা যায় না। কিন্তু এ-সব বাদ দিয়েও তো মেয়েছেলে পাওয়া যায় বিয়ে না করে!

যাঃ, শুধু শুধু থিওরিটিক্যাল কথা বলিস না। যে-সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা নেই, সে-সম্বন্ধে কথা বলা উচিত না।

তাপস চকিতে অনিমেষের দিকে সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি মুখে বলি না কখনও, লিখে জানাই। তাছাড়া বিয়ে সম্বন্ধে তোরই-বা কী নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে? তুই কি পৃথিবীতে নতুন বিয়ে করেছিস? পৃথিবীতে মানুষ বিয়ে করছে অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে, তাদের সকলের অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানি।

তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা খারাপ?

কী গাড়োলামি করছিস? বিয়ে করা উচিত কি না তাই নিয়ে সিম্পোসিয়াম চালাবি নাকি? যার ইচ্ছে করবে। কিন্তু একটা মেয়েছেলে চাই, এ-কথায় বিয়ের প্রসঙ্গ আসে কী করে?

আমার বিয়ের কথাই মনে হল। কারণ বিয়ে করে আমি স্ত্রীলোক এবং শান্তি দুটোই পেয়েছি।

পরীক্ষিৎ গান গাইছিল। হঠাৎ গান থামিয়ে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, কিন্তু অনিমেষের মতো সুন্দরী বউ থাকলে ভাই শান্তি বেশি দিন রাখা যায় না।

অনিমেষ কথাটা শুনল, কিন্তু কান দিল না। বলল, তাপস, তুই আর এ-রকম পাগলামি কত দিন করবি? তোর তো লেখার জন্য সময়ের দরকার।

আমিও সুযোগ পেলে একটা ছোটখাটো বিয়ে করে ফেলব। আমি নিরীহ ভাল মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই। আমি বললাম।

তাপস একাই চলে গেল চায়ের দোকানের দিকে।

পরীক্ষিৎ ব্রিজের রেলিঙের ওপর উঠে বসেছে। প্রথমে গুন গুন করে গান করছিল, তারপর বেশ গলা ছেড়ে দিল। পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত না থেমে শেষ করার পর বলল, বিনা নেশায় চেঁচালে বড় গলা ব্যথা করে। গতবার আমরা সবাই মিলে কী গান গাইতাম রে?

কী জানি, আমার মনে নেই। আমি একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিতে না-দিতেই সেটা হাত ফসকে জলে পড়ে গেল।

তাপস জানে। তাপস ওটা খুব গাইত। গেল কোথায় ছোকরা? একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, কাণ্ডটা দ্যাখ! সাধে কি আমি রাগি।

গায়ত্রী গিয়েছিল মন্দিরে। ফিরে এসে ব্রিজের ও-পাশে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছে। অনিমেষ চলে গেছে ওর কাছে, দু'জনে নিবিষ্ট হয়ে কী যেন বলছে।

দেখেছিস, একটু চান্স পেয়েই জোড়া মেরে গেছে। এই জন্যই (অশ্লীল) আমি (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য) একটু অন্ধকার পেলেই (অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)।

যাক গে, ছেড়ে দে। নতুন বিয়ে করেছে, একেবারে একা থাকতে পারছে না আমাদের উপদ্রবে।

শুনেছিস, কাল অনিমেষ কা বলল। একদম লিখতে পারছে না, ভাষা নেই ফাসা নেই, যত (অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)। বিয়ে করে মজে গেছে। ওই বলল না, শান্তি পেয়েছে। আমি ওর শান্তির বারোটা বাজাতে চাই। আজই।

তোর নতুন বইটা কবে বেরুচ্ছে, নাটকটা শেষ করলি না?

কার জন্য লিখব? তুই লিখিস না আজকাল। তাপসটা লেখে ব্লাডি রোজ। এক অনিমেষ–তা-ও বিয়ে করে শান্তি পেয়েছে। দাঁড়া ওর শান্তি ভেঙে দিচ্ছি। ওকে বলে দিই, যাকে নিয়ে অত সোহাগ করছ, সেই তোমার বউয়ের (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য)।

ও-সব চালাকি ছাড় অবিনাশ মিত্তির! আমি সোজা কথা বলব। পরীক্ষিৎ হাতের সিগারেটে জোর টান দিয়ে এক মুখ ধোয়া ছেড়ে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর দোল খেল।

পড়ে যাবি, পরীক্ষিৎ, ঠিকহয়ে বোস। আমি দেখতে পেলুম সেই অজগরের মতো নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওর মাথার চারপাশে। লম্বা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ মনে হল ওর মাথা দিয়ে দুটো শিং বেরুচ্ছে। গায়ত্রী মেয়েটা খুব ভাল, আমি বললাম, ওরা দুজনেই দু'জনকে খুব ভালবাসে।

আমার মুখের দিকে গভীরভাবে তাকাল পরীক্ষিৎ। বলল, আর তুই?

আমি হোপলেস, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

আমার নাটকটার জন্য কাঁচা মাল দরকার। আমার অনিমেষকে চাই।

এ খুব ছেঁদো কথা হল। তোর কি মডেল লাগে লেখার জন্য?

ওকে নিয়ে লিখব কে বলেছে। ওর গণ্ডগোল নিয়ে লিখব। গল্প তো বানাতে পারি না রে, তাহলে তো এত দিনে উপন্যাস-ফুপন্যাস লিখে কেলেঙ্কারি করতাম। অনিমেষকে ঈর্ষা করে লিখতে ইচ্ছে হয়।

শেক্সপিয়ার কিংবা ইয়োনেস্কোকে ঈর্ষা করনা!

যাঃ, বাজে বকিস না। তুই আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিস। কিন্তু এরই-বা কী মানে হয়। বন্ধুরা বইল এক দিকে, আর বউয়ের সঙ্গে গুজুর গুজুর। শোন অবিনাশ, আমিও ওর সত্যিকারের বন্ধু। আমি ওর উপকারই করতে চাই। একটা মেয়ের কাছে ডুবে যেতে দিতে পারি না।

পরীক্ষিৎ, কাল ক'টার ট্রেনে ফিরব রে আমরা?

জানি না। অনিমেষকে ডাকি!

কলকাতায় ফিরে তোর নাটকটা স্টেজে করব। হল ভাড়া নিয়ে।

তুই আমাকে ভোলাতে চাইছিস? না, আমি অনিমেষকে ডেকে বলতে চাই, আজই এখনই, অনিমেষ –

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুই অনিমেষকে কী বলনি? যত সব পাগলামি!

পরীক্ষিৎ গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকাল, একটাও কথা না বলে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। কী বিশ্রি ওর সেই হাসি। সেই হাসির মধ্যেও নীল ধোঁয়া। আমি অস্বস্তিকর ভাবেওর হাসির সঙ্গে যোগ দিতে চাইলাম। আমার তখন হাসি পেল না।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ বিষম জোরে অনিমেষের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল। আমি থতমত খেয়ে বললাম, পরীক্ষিৎ, আগুনটা দে তো। বলে, ওর মুখের সিগারেট থেকে আমার সিগারেট ধরিয়ে নেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তারপর ডান হাত দিয়ে ওর পেটে একটা আলতো ধাক্কা দিতেই হাত দুটো ওপরে তুলে বাতাস ধরার চেষ্টা করে পরীক্ষিৎ উলটে পড়ে গেল। নিচের নদীর জলে ঝুপ করে একটা শব্দ হল। আর শোনা গেল, পরীক্ষিতের আর্তনাদ নয়, জারুল গাছের একটা রাত-পাখির কর্কশ ডাক। গায়ত্রী আর অনিমেষ ছুটে এল চিৎকার করে। পরমুহূর্তেই বিষম অনুশোচনায় আমার মন ভরে গেল। ছিঃ, কেন পরীক্ষিৎকে আমি জলে ফেলে দিলাম। খুবই বোকার মতো কাজ হল এটা। কোনও মানে হয় না। ও খুবই ভাল সাঁতার জানে, নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। এর বদলে ওকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

২. বিমলেন্দু

বিমলেন্দু

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে দেখলাম, অত্যন্ত গম্ভীর এবং নিবিষ্ট চোখ মুখে তাপস, অবিনাশ আর হেমকান্তি, সামনে তাস ছড়ানো। তিন জনে বসে আছে অথচ চার জনের তাস ভাগ করা। যেন চতুর্থ লোকের প্রতীক্ষায় ছিল, আমাকে দেখেই বলে উঠল, আয়, তাস তোল।

আমি তাস খেলতে জানি না।

শিখে নিবি, বসে পড়, অবিনাশ বলল।

না, ওসব আমার ভাল লাগে না।

ও! অবিনাশ চোখ না তুলেই বলল। ওদের খেলা থামল না। অবিনাশ বলল, ফাইভ নো ট্রামপস্। চার জনের তাস বিছিয়েও যে তিন জনে ব্রিজ খেলা যায় আমি জানতাম না। এখন আমাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে, অত্যন্ত বিরক্তিকর আমি উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবি ঘোরালাম, যুদ্ধের বোমা বর্ষণের মতো আওয়াজ ও মাঝে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া গানের লাইন। আঃ, বিরক্ত করিস না, তাপস বলল, দে, একটা সিগারেট দে! আমি উঠে পাশের ঘরে গেলাম। মায়া দাঁত দিয়ে কালো ফিতে চেপে ধরে চুল বাঁধছে আয়নার সামনে। ফর্সা গালে ফিতেটা শায়া ও ব্লাউজ পরা, ভাঁজ করা শাড়িটা হাঁটুর উপর। আমাকে দেখে চমকে উঠল না, লজ্জা পেয়ে শাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে বুকে জড়াল না, ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দিদি কোথায়, মায়া?

বাথরুমে।

তোমার কাছে একটা খালি খাম আছে? একটি চিঠি পোস্ট করব।

না নেই। আপনি পাশের ঘরে বসুন। মায়া তখনও আমার চোখের দিকে চেয়ে ছিল, অত্যন্ত হিম সেই চেয়ে থাকা।

বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি? পিসিমা?

না। আপনি পাশের ঘরে বসুন। দিদি যাচ্ছে।

মায়া, তুমি আমাকে একটা রুমাল দেবে বলেছিলে।

মায়া ঘুরে দ্রুত চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে, ড্রয়ার খুলে একটা ফর্সা ও সোনালি কাজ করা রুমাল এনে বলল, এই নিন, পাশের ঘরে বসুন।

আর কেউ আমাকে দেখেনি, তবু বুঝতে পারলাম, কী বোকা ও নির্লজ্জের মতো আমি রুমালটা চেয়েছিলাম। আর একটু দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু মায়ার সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলতেই পারি না, ভয় পাই। এক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় মায়াকে ভাল করে দেখব, মনে মনে ভাবলাম।

ও-ঘরে কী কারণে ওরা চেঁচিয়ে উঠতেই মনে হল, তাস খেলা শেষ হয়েছে। ফিরে এলাম। অবিনাশ পয়সা গুনছে। হেমকান্তি ওর লম্বা মুখ তুলে আমাকে কিছু যেন বলতে চাইল। পরক্ষণেই আবার মুখ নিচু করল সতরঞ্চির দিকে। ওর স্বভাবই এই। মুখ দিয়ে ক'টা ওর কথা বের হয়, আঙুলে গোনা যায়। কোন কথাটা কীভাবে বলবে, ও হয়তো ভেবে পায় না। আমি বললাম, আজ কীসের মিটিং রে? হঠাৎ ফোন করে আসতে বললি কেন?

আজ মাংস খাব। পয়সা নেই। অবিনাশ বলল, তুই তো ইয়া লাশ আছিস, তোর উরু থেকে সের খানেক মাংস দেনা, মশলা দিয়ে রাঁধি। মানুষের মাংস কেমন খেতে একটু চেখে দেখি।

যদি খেতেই হয়, তবে আমার কেন, কোনও সুন্দরী মেয়ের মাংস খা না।

দুর ব্লকহেড! ওদের মাংস খেতে হয় চেটে চেটে কিংবা চুষে চুষে। চিবিয়ে গিলে ফেললে তো একেবারেই ফুরিয়ে গেল।

মায়া ও ছায়াদি দুই বোন ঘরে এল। ছায়াদিসদ্য স্নান করে এসেছে। ওর চুল, চোখের পাতা, চিবুক, ভুরু এখনও ভিজে। বলল, চা খাবে? তোমরা যে আজ আসবে তা আগে জানাবে তো?

কেন, তাহলে কি চায়ের বদলে মদ খাওয়াতিস? তাপস বলল।

ধেৎ! তা নয়, মায়া যে দু’খানা সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে।

তা মায়া যাক না অন্য কারুকে সঙ্গে নিয়ে, তুমি থাকো।

কে যাবে ওর সঙ্গে? তোমরা যাবে কেউ?

কেন, এত বয়স হল, কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে না?

করে, আমার সঙ্গে। অবিনাশ গম্ভীর গলায় জানাল।

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আপনারা কোনও ওষুধ –? হঠাৎ হেমকান্তি বলে উঠল, বড় যন্ত্রণা করে, রোজ সন্ধে হলেই –।

অ্যাসপ্রো আছে, এনে দেব?

না, ওতে কমে না। অন্য কোনও...আপনারা.. ওষুধ।

আমি জানি, হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে তাপস বলল, নেচার ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু শক্ত, পারবেন?

না, ও পারবে না, আমি জানালাম। তাপসের চোখে বদমাইসি।

কেন পারবে না? শুনুন, আপনি উঠে দাঁড়ান, ডান হাত দিয়ে বাঁ-কান ও বাঁ-হাত দিয়ে ডান কান ধরে ভাল করে ঈশ্বরকে প্রণাম করুন, তারপর মাথাটা জোর করে ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়ে ফুঁ দিন, পারবেন তো? তারপর একটা বেগুনি রঙের পাখির কথা ভেবে উলটো মুখ করে সিঁড়ি গুণে গুণে নেমে যান, শেষ ধাপটায় একবার বসুন, আর ঘাড়ে ফুঁ দিন। এবার রাস্তার পানের দোকান থেকে দু'টো পান কিনে নিজে একটা খেয়ে বাকিটা প্রথম যে-মেয়ে ভিখারি দেখবেন, তাকে দান করুন। নির্ঘাৎ সেরে যাবে, সারতে বাধ্য।

মায়া ফুলে ফুলে হাসছিল। হেমকান্তি নিচু দিকে মুখ রেখেই বলল, ওঃ, আচ্ছা? এমন ভাবে বলল, যেন অব্যর্থ বলে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু আজ নয় কাল পরীক্ষা করে দেখবে।

যাঃ, কেন ওকে বিরক্ত করছিস তাপস? সত্যি, মাথা ধরলে ভারি কষ্ট হয়, ছায়াদি বলল, আপনি বরং মায়ার সঙ্গে সিনেমায় যান না। সেরে যেতে পারে।

হেমকান্তি কোনও উত্তর দিল না। ওর লম্বা মুখখানা এমন ভাবে তুলে ধরল, যেন ওকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও ভাল হত এর বদলে।

না, এক জন অসুস্থ লোককে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না, মায়া জানাল।

আমি যাব? আমি নিজেই ব্যগ্র গলায় বললাম।

হ্যাঁ, আপনি আর দিদি যান। মায়া সেই ঠাণ্ডা চোখ আমার দিকে তুলেছে।

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না। অবিনাশ বলল, আমাদের সকলের নামগুলো নিয়ে লটারি হোক। যাব নাম উঠবে সেই যাবে।

এই সময় বেশ জুতোর শব্দ করে পরীক্ষিৎ ঢুকল। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। অনিমেষদের ওখানে বেড়াতে গিয়েও নাকি নদীতে পড়ে গিয়েছিল ব্রিজ থেকে। পরীক্ষিতের চোখ

অসম্ভব লাল। অবিনাশ টুকরো টুকরো কাগজে আমাদের নামগুলো লিখে গুলি পাকাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, তোর নাম দেব? তুই যাবি পরীক্ষিৎ, মায়ার সঙ্গে সিনেমায়?

হোয়াই নট? কী ছবি? বাংলা?

হ্যাঁ, ছায়াদি বলল।

খারাপ নয়। বই খারাপ হলেও মায়াও তো থাকবেই পাশে।

অবিনাশ কাগজের গুলিগুলো হাতে ঝেঁকে ছড়িয়ে দিল সতরঞ্চিতে। বলল, তুমি তোলো মায়া।

আমি না, দিদি তুলুক।

না, দিদি কেন? তুমিই বেছে নাও না, কে যাবে তোমার সঙ্গে, অনেকটা স্বয়ম্বর সভার স্বাদ পাওয়া। যাবে। জানি তো আমাকেই বেছে নেবে, সেটা মুখ ফুটে বলতে অত লজ্জা কীসের?

কক্ষনো না, মায়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। আমার ইচ্ছে পরীক্ষিৎদার সঙ্গে যাওযার। দেখবেন, ওর নামই উঠবে। মায়া তুলতে যাচ্ছিল, অবিনাশ ওর হাতখানা চেপে ধরে বলল, কিন্তু শোনো মায়া, যার নাম উঠবে তার সঙ্গেই কিন্তু যেতে হবে, এমনকী হেমকান্তির নাম উঠলেও।

আমি? অসহায় চোখে হেমকান্তি।

মা একটা কাগজের গুলি তুলে একা একা দেখে বলল, পরীক্ষিৎদার নাম। ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপছে।

দেখি দেখি, বলে তাড়াতাড়ি করে ছায়াদি আর আমি কাগজটা দেখলাম। না, অবিনাশের –

জানতাম! অবিনাশ হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মোজা পরতে শুরু করে দেয়। মায়া হাসতে হাসতে বলল, ওঃ কী গরজ। কী হ্যাংলা আপনি বাবা।

পরীক্ষিৎ একটা লম্বা চুরুট ধরিয়েছে। মুচকি হেসে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই চললি, তোর সঙ্গে যে কয়েকটা কথা ছিল। ফিরছিস তো এখানেই?

ফিরতে পাবি, কিন্তু যদি মায়া দেবী শো'র পর আমার সঙ্গে ময়দানে ঘুরতে কিংবা রেস্টুরেন্টে বসতে রাজি হন। তবে দেবি হবে।

খবরদাব মায়া, কোথাও যাবি না, মায়ার অভিভাবিকা বলে।

মায়া বলল, আপনি কিন্তু হলের মধ্যে বসে ইয়ার্কি করতে পারবেন না। নিজে সাহিত্যিক বলে, ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্তব্য করবেন, ও-সব অহঙ্কার চলবেনা।

পাগল হয়েছ, অবিনাশ বলল, তোমার কাছে আমি অহঙ্কার করব। সুন্দরীর পাশে আবার সাহিত্যিকের কোনও মূল্য আছে নাকি। বিমলেন্দু, দশটা টাকা দে তো?

আমার কাছে নেই।

নেই কী! খবরের কাগজে লিখে তো খুব টাকা পিটছিস। কিছু ছাড়।

না বে, সঙ্গে কিছু নেই।

নেই? যাঃ শালা, শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা কর।

এই নে। পরীক্ষিৎ চুরুটটা দাঁতে চেপে পকেট থেকে চামড়ার ব্যাগ বার করল। দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে গিয়ে বলল, আসবার সময় একটা পাঁইট আনিস।

তুই তো যথেষ্ট মেরে এসেছিস। আবার কেন?

বাড়ি নিয়ে যাব। রাত্তিরে দরকার।

অবিনাশ মায়ার বাহু ছুঁয়ে বলল, চলো যাই। ছায়া, এদের একটু সামলে টামলে রেখো। ওঃ, একটা কথা বলিনি, অবিনাশ আবার ঘুরে দাঁড়াল, তারপর না-হাসার ভঙ্গি করে বলল, কাগজের গোল্লাগুলো খুলে দেখ, সবগুলোতেই আমার নাম লেখা। মায়া যেটা তুলত, সেটাই আমার। গুড নাইট, বয়েজ।

আমাদের সকলের হাসি থামলে তাপস বলল, হারামজাদা!

আমি খুব অপমানিত বোধ করছিলাম। মায়ার জন্য নয়। মায়ার সঙ্গে যাবার আন্তরিক ইচ্ছে হয়েছিল আমার, সে-জন্য। মায়ার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি, বরং ওকে সাহায্য করেছি। অনেক, পরীক্ষার সময়। আসলে মায়া আমাকে ঘৃণা করে ছায়াদির জন্য। ছায়াদি এমন ভাব দেখায়, যেন আমাকে কত ভালবাসে। বেচারির এ পর্যন্ত বিয়ে তো হলই না, প্রেমিকও নেই। এতটা বয়স পর্যন্ত কুমারী। ছায়াদি যদি অনুরোধ করে, তুবে অনায়াসেই ওকে বিয়ে করতে পারি আমি। শ্বেতি মোটই ছোঁয়াচে রোগনয়, তাছাড়া মেয়েটা বড় শান্ত, অনেকটা মায়ের মতো, আমার বড় শান্তি লাগে ছায়াদির কাছে। শুধু ওর ওই ন্যাকা পদ্যগুলো লেখার অভ্যেস ছাড়া দরকার। মায়া আমাকে ভুল ভেবেছে, আসলে যে, অবিনাশের সঙ্গে ওর এত মাখামাখি, ওই অবিনাশটাই লম্পট, বিবেকহীন, বদমাশ। ও-ই মজা লুটে পালাবে। মায়াকে নিয়ে ও শেষ পর্যন্ত কী করবে, কী জানি! ভাবতেও ভয় হয়। মায়ার ও-রকম ঝরনার জলে ধোওয়া শরীর। লেখার জন্য জীবনটা কলুষিত করতেই হবে? তাপস-পরীক্ষিৎ-অবিনাশদের তাই ধারণা। ওদের কারুর অসুখ হলে কপালের ওপর কে ঠাণ্ডা হাত রাখবে জানি না।

আমাদের বাড়ির ছাদে কয়েকটা সুন্দর গোলাপ ফুলের চারা টবে বসানো। এক দিন চা খেতে খেতে গাজিপুরের লালগোলাপটা দেখাচ্ছিলাম ওদের। অনেক চেষ্টার পর একটা গাছে সে-দিন প্রথম ফুল ফুটেছে। হয়তো আমার গলায় একটু বেশি উচ্ছ্বাস লেগেছিল, পরীক্ষিৎহঠাৎ সেই টবটা আছড়ে ভেঙে দিল। আধুনিকতা সম্বন্ধে এ-রকম ছেলেমানুষি

ধারণা ওদের! জানে না, একশো বছর আগে ফুলকে অবহেলা করে এখন আবার ফুলের স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। অবিনাশটা আবার ফুল খায়। গোলাপ, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী -যেখানে যে ফুল দেখে -লোকের বাড়ির ফুলদানিতে বা উপহারে, বাগানে, ও অমনি ছুটে যায়, ফুল আমি বড্ড ভালবাসি বলে পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খায়। আমি একদিন সরল ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই ফুল খাস কেন রে? দ্যাটস দা আনলি ওয়ে অভ অ্যাপ্রিসিয়েসান! কথাটা খুব গর্বের সঙ্গে বলে, যেন ভবিষ্যকাল ওর এই বাণীটি মনে রাখবে।

পরীক্ষিৎ বিশাল কাঁধের হাড় দুটো উঁচু করে চেয়ারে উঠে বসল। ছায়া, চা খাওয়াচ্ছ না কেন? যাও, চা-খাবার টাবার নিয়ে এসো। ছায়াদি বেরিয়ে যেতেই তাপসের দিকে ফিরে বলল, তোদের একটা কথা আছে, ভুলে যাবার আগেই বলি। দিন কয়েক ও-পাড়ার দিকে যাসনি কিন্তু।

কেন?

পরশু একটা খুন হয়ে গেছে ও-পাড়ায়। পুলিশে ছেয়ে গেছে। দিন কয়েক—

তুই ওদিকে গিয়েছিলি কেন? তোর হঠাৎ একা..।

অবিনাশকে খুঁজতে খুঁজতে। তারপর কী রুক্ষু ঝঞ্ঝাট। এক মক্কেল পুলিশ তো আমাকে ধরে ফেলে আর কী! আমি দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সে-বুড়িটা তো আমাকে দেখেই আঁতকে উঠেছে। আমি বললাম, চেঁচিও না মা লক্ষ্মী, চোর-ডাকাত নই, পুলিশের হামলা কমলেই বেরিয়ে যাব। ও সেই ক্যানকেনে গলায় বলল, আজ এখানে এসেছ কেন মরতে?

তাপস জিজ্ঞেস করল, কোন বাড়িতে খুন হয়েছে?

প্রসন্নর বাড়িতে। লক্ষ্মীর কাছে সব শুনলাম। প্রসন্নর বাড়ির তিন তলায় মল্লিকার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটা অন্ধকার থাকত, তোর মনে আছে? ও- ঘরে হাসিনা বলে একটা মেয়ের কাছে আসত গোলক গুণ্ডা। সে নাকি মাস্তান, ও-পাড়ার সবাই তাকে চেনে। প্রসন্ন বাড়িওয়ালা এক দিন বলল, তুমি আর এসোনা বাবা, তোমার ভয়ে আমার বাড়িতে লোক আসেনা। চোপ শুয়ার! বলে গোলক তাকে ধমকে দিয়েছে। তখন প্রসন্ন হাসিনাকে বলল, তুই ওকে ঢুকতে দিবি না ঘরে। হাসিনা বলল, ওমরদকে আমার সাধ্য কী, না বলি। জোর করে ঢুকরে। তাছাড়া টাকা-পয়সা ঠিক দিচ্ছে, এ বাড়িতে ও আসছে-যাচ্ছে ভদ্রলোকের মতো। রুপিয়াও জায়দা দিচ্ছে। কোনওদিন তো এখানে হাকরেনি। করেনি, করতে কতক্ষণ। প্রসন্ন হেঁকেছে, তারপর দিয়েছে হাসিনার ঘরের আলোর লাইন কেটে। গোলক তাতেও কোনও আপত্তিকরেনি। রোজ আসবার সময় মোমবাতি কিনে আনত। কাল মল্লিকার ঘরে সন্ধেবেলা তিনটে বাবু এসেছিল। তারা আর এক জন চেয়েছে। হাসিনা, তখন বাথরুম থেকে খালি গায় বেরুচ্ছিল, তাকে দেখেই বাবুদের পছন্দ। কিন্তু হাসিনা রাজিনয়, ওটা গোলকের আসবার দিন। তখন বাড়িওয়ালা জোর করে দুটো লোককে ঢুকিয়ে দিল ওর ঘরে। খানিকক্ষণ বাদে গোলক হাজির হতেই লেগে গেল।

পরীক্ষিৎ চুরুট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোলক ধরা পড়ল? মাথা খারাপ! দুটো লোক আর একটা মেয়েকে ছুরি মেরে সে হাওয়া। আমাকে লক্ষ্মী বলল, গোলকের কিন্তু দোষ নেই বাপু, যাই বলল। তার যা ব্যাভার ছিল, বাবুদের মাথায় হাগে। কেন তাকে ঘাটানো! সে তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যই দুটোকে ছুরি চালিয়েছে। দেখলাম, গোলকের ওপর ওদের খুব ভক্তি। ওদের হিরো। আমি প্রসন্নর বাড়ি খুন শুনেই ভয় পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম কাছাকাছি। তাতেই তো পুলিশের হাতে পড়ছিলাম প্রায়! লোক দুটোর চেহারার ডেসক্রিপশন শুনেই বুঝতে পারলাম অবিনাশ নয়, তাছাড়া অবিনাশ খুন হবার ছেলেই নয়।

আর মেয়েটা কে?

মল্লিকা! পরীক্ষিৎ অন্য মনস্ক গলায় বলল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। মল্লিকার নাম শুনে ওরা বিষণ্ন হয়ে গেছে মনে হয়। আমিও মল্লিকাকে চিনতাম। একদিন ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওরা জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে আলো ঝলমল পর পর ঘর। মল্লিকা মেয়েটার ঘর ছিল চমৎকার সাজানো-গোছানো। রেডিয়োত ইংরিজি সুর বাজছিল। মা কালি আর সিগারেট কোম্পানির ক্যালেন্ডারে ন্যাংটো মেয়ের ছবি পাশাপাশি দেয়ালে এবং অশ্বারূঢ় শিবাজি। এ ছাড়া কয়েকটি নকল টিকটিকি, আরশোলা, কাকড়াবিছে এখানে-সেখানে ঝুলছে। বিরাট ভাসে এক ঝাড় লাল গোলাপ, অমন সাটিনের মতো ঝলমলে লাল গোলাপ আগে কখনও দেখিনি। মেয়েটা একেবারে পাগলাটে ধরনের ফর্সা, টান করে চুল বাঁধা, অল্প নেশার ঘোরে দুলছিল। বলেছিল, তোমরা আবার কেন এসেছ? মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে প্রাইভেট কথা বলবে, একদম দেখতে পারি না। ওই লোকটা আবার বই লেখে। তাপসের দিকে আঙুল দেখিয়ে, ওসব লেখক-টেখক আমার সয় না, মাইরি। অবিনাশ ততক্ষণে ওর বিছানায় টান টান শুয়ে পড়ে হুকুম করেছে, রেডিয়োটা বন্ধ করে দে মল্লিকা, পাখাটা খোল না। তারপর বলেছে, এই নে সিগারেট খাবি? ভাল সিগারেট আছে আজ। তাপসের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হল মেয়েটার। তাপস বলল, নাও, টাকা নাও, একটা বোতল আনাও। দু’টোক গিললেই মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে।

না। আজ ভাগো। আমার শরীর ভাল নয়।

তাতে কী হয়েছে, না হয় একটু গল্প-গুজবই করব আজ।

না, হবে না। বেরোও বলছি। মেয়েটা খুবই রেগে গেছে কী জানি।

আচ্ছা বাবা, তোমার টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছি।

টাকা দেখাচ্ছ মল্লিকা মিত্তিরকে? কত টাকা, দেখি।

তাপস কুড়িটা টাকা এগিয়ে দিল। হাসতে হাসতে মেয়েটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে টলে গিয়ে দেয়াল ধরে সামলাতে সামলাতে কাশতে লাগল।

আচ্ছা, আর পাঁচ টাকা বেশি নাও।

পাঁচ টাকা, আবার পাঁচ টাকা! সরু গলায় বিশ্রীভাবে হেসে উঠল মল্লিকা।

তাপস চটে উঠল এবার। তোমার ওই রূপের জন্য আবার কত চাও?

কী! মল্লিকা বাঘিনীর মত ফুঁসে ওঠে তাপসের দিকে। ঘন নিশ্বাসে ওর বুক ফুলে ফুলে উঠছে। আস্তে আস্তে বলল, রূপের দাম? রূপ কি কিস্মৎ পাঁচ ঘা জুতি! যাবার সময় পাঁচ ঘা জুতো মেরে যেও বলে দশ টাকার নোট দু'খানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। আমি চুপ করে এই নাটক দেখছিলাম। অবিনাশ উঠে বলল, কী ঝঞ্ঝাট করছ মাইরি। দাও, এক গ্লাস জল দাও।

জল! মল্লিকা ছুটে গিয়ে খাটের তলা থেকে কাচের কুঁজোটা টেনে বের করল, তারপর হঠাৎ দুম করে কুঁজোটা ফেলে দিল মাটিতে। অবিনাশ আর কোনও কথাবার্তা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল যাই, মাসির আজ মান হয়েছে! আমরা বেরিয়ে আসার সময় মল্লিকা বলল, দেখো, যেন কা 1 পা কাটে না কাঁচে। আমার ঘরে রক্ত-ফক্ত চলবে না।

আমি বললাম, খবরটা শুনলে অবিনাশ খুবই দুঃখ পাবে। অবিনাশের ওপর মেয়েটার সত্যিই টান ছিল।

না, পাবে না। তাপস বলল।

সত্যিই পাবে না। পরীক্ষিৎ বলে, ওই হারামজাদার বুকের মধ্যে দয়া মায়া কিছুই নেই। ওর আত্মাই নেই বোধহয়।

অবিনাশও তোর সম্বন্ধে এই কথা বলে। আমি বললাম।

যা যা! আমার বুকে ভালবাসা আছে, তাই আমি কবিতা লিখি। অবিনাশ যা লিখেছে, ওগুলো আবার লেখা নাকি? ওর দ্বারা কিছু হবে না।

তোদের ভালবাসা কী-রকম জানিস। একটা পিঁপড়ে মরলে তোদের প্রাণ কাঁদে, কিন্তু বাড়িতে তোর মা খেতে পেল কিনা সে-সম্বন্ধে গ্রাহ্য নেই!

তাপস আমাকে বলল, শালা, তোর কথার মধ্যে বক্তৃতার ঢঙ এসে যায় কেন রে?

আমি চুপ করে গেলাম। পরীক্ষিৎ উদাস ভাবে বলল, ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। মায়ের মুখটাও আমার ভাল করে মনে পড়ে না।

ছায়াদি ট্রেতে করে গরম নিমকি ভাজা আর চা নিয়ে এল। এতক্ষণ লাগে তোমার চা বানাতে? পরীক্ষিৎ চমকে উঠল। তাপস বলল, তোর কবিতাগুলো কখন শোনাবি?

চা খাওয়ার পর না হয় ।

না, চা খেতে খেতেই শোনা যাক।

ছায়াদি নির্লজ্জের মতো বাঁধানো খাতাখানা এনে সতরঞ্চির এক পাশে বসল।

খারাপ লাগলে স্পষ্ট করে বলবে কিন্তু, হেমকান্তিবাবু, আপনার কি খুবই শরীর খারাপ লাগছে?

না, হেমকান্তি মুখ গুঁজে বসে ছিল। এবার মাথা তুলল।

ছায়াদি পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগল। আমি একদম মনোযোগ দিলাম না সে-দিকে। সব ছন্দ-মিল দেওয়া ট্র্যাশ। পরীক্ষিৎ, তাপসও নিশ্চিত শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। ছায়াদির কী যে এই দুর্বলতা। বাশি বাশি লিখে চলেছে এই সব, ছাপাও হয়

নানা জায়গায়, তবু তরুণ সাহিত্যিকদের শোনাবার কী লোভ। মাঝে মাঝে ওদের পিসিমা বাড়ি থাকে না, বা মনে হয় ছায়াদিই ওঁকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়। তখন এ বাড়িতে দলেবলে আড্ডা। পিসিমা ভারি ঠাণ্ডা মানুষটি, কাঁচা বেলের ভেবে মতো গায়ের রঙ, সব সময়েই হাসিমুখ। এক দিন শেখর এসে বমি করেছিল, পিসিমা নিজে হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। আমাদের বাড়িতে মা-পিসিমারা এ সব করার কথা কখনও ভাবতে পারেন? তা নয়, পিসিমা এদের অভিভাবিকা তো নয়, গলগ্রহ। বুদ্ধিমতী মহিলার মতো তাই মানিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের পক্ষে অবশ্য ভালই, চমৎকার আড্ডার জায়গা। তাছাড়া দুটি মেয়ে উপস্থিত থাকলে জমজমাট হয়। একমাত্র মুশকিল, মাঝে মাঝে ছায়াদির লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। তবে মেয়েদের স্তুতি করাটা ঠিক মিথ্যে নয়, চর্চা রাখা ভাল। দুপুরে তাপস যখন ফোন করল তখনই বুঝতে পারলাম, কপালে আজ কিছু বাজে পদ্য শোনার দুঃখ আছে। মেয়ের লেখা কবিতা –এ যেন গোল বোতলে চৌকো কর্ক মাইরি, অবিনাশ বলে। অনেকটা ঠিকই বলে। ও ধড়িবাজ ছেলে, কী চমৎকার কেটে পড়ল মায়াকে নিয়ে। মায়াকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। কিশোরী অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে ওকে বড় হয়ে উঠতে দেখলাম। ওই ওই সুকুমার, স্বর্গীয় শরীর, অবিনাশ কবে নষ্ট করে দেবে, কে জানে।

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম, দেখলাম ছায়াদিও বেরিয়ে এসেছে। বলল, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বলো।

এখানে দাঁড়িয়ে বলব না, চলো ওপরের ঘরে যাই।

ওপরের ঘরের দরজা ঠেলে খোলার আগেই বলল, না থাক, চলো ছাদে যাই। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। অনেকগুলো টবে সাদা ফুলগুলো ফুটে উঠেছে। তিন চার রকমের গন্ধ আমার নাকে লাগছে। ছোট একটা ঘর আছে ছাদে। চারদিকে চমৎকার নির্জন। ছায়াদিকে কী-রকম রহস্যময় দেখাচ্ছে। আমাকে কী বলতে চায়। আমাকে দিয়ে কোনও কাজ

করাবার মতলব নাকি? আমি এতক্ষণে ওকে নিশ্চয়ই একটা চুমু খেয়ে খুশি করতাম, কিন্তু মায়ার ব্যবহারে মনটা কী-রকম বিষিয়ে আছে। আমাকে ওর ভাল লাগতে না পারে, কিন্তু আমাকে দেখে ওর ব্রেসিযার-পরা বুকে শাড়িটা অন্তত জড়িয়ে নিতে পারত।

চলো, এই কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে চিলেছাদে উঠবে? হু-হু করে হাওয়া ধাক্কা মারবে।

কী ব্যাপার, মনে হচ্ছে তোমার কথাটা বলার জন্য যেন পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু জায়গা দরকার?

হ্যাঁ, সে-কথা স্বর্গে দাঁড়িয়ে বলা উচিত।

আশা করি তুমি এখন বলবে না, তুমি আমাকে ভালবাসো?

ছায়াদি থতমত খেয়ে আমার চোখে চোখ রাখল। তারপর খাদে গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুমিও বুঝি প্রাণপণে হৃদয়হীন আধুনিক হবার চেষ্টা করছ বিমলেন্দু?

না, তা নয়, তুমি বলার আগে আমি বলতে চাই। পৃথিবীর দিন এসে গেলেও একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি, একথা বলায় কোনও আধুনিকতা নেই। ছায়াদি, তুমি আমার কাছে কী চাও?

আমি তোমার কাছে অমৃত চাই।

আমার কাছে অমৃত নেই। সামান্য ভালবাসা আছে।

না, ইয়ার্কি নয় বিমলেন্দু, আমি সত্যি তোমাকে কিছু জানাতে চাই।

আমি ইয়ার্কি করছিনা, আমি প্রাণ থেকে বলছি।

ওকথা থাক। আমি অনেককে জানি, কিন্তু তোমাকেই আমার সব চেয়ে আপন লোক মনে হয়। কারুকে না বলে আমি আর পারছি না বিমলেন্দু, আমি আর বেশি দিন বাঁচবনা।

সে তো আমরা কেউ-ই আর বেশি দিন বাঁচবনা। মানুষ জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

না, সেকথা নয়, অসুখ। আমার লিউকোমিয়া হয়েছে।

লিউকোর্ডামা? ও আবার একটা অসুখ নাকি?

লুইকোডার্মা নয়, লিউকোমিয়া। এ অসুখ হলে মানুষ বাঁচে না। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যাকে বলে ব্লাড ক্যানসার। এর কোনও চিকিৎসা নেই। চলো, তোমাকে ডাক্তারের রিপোর্ট দেখাচ্ছি। ডাক্তার বলেছে, আমি আর বড় জোর বছর খানেক।

ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, আজ ছমাস ধরে যাচ্ছি। তুমি যে-দিন আমার শ্বেতির দাগধরা ঠোঁটে আদর করলে, সেদিনই মনে হল শ্বেতি দাগটা না সারিয়ে দিলে আমরা চলবে না। কারণ তোমার ঠোঁটে সেদিনই একটা চাপা অহঙ্কার দেখতে পেয়েছিলাম। অহঙ্কার এই জন্য যে, তোমার মন এত বড়, তুমি ওসব দাগ-টাগ ঘেন্না করো না, এটা দেখাতে পারলে। কেন, তোমাদের কাছে আমি এ-রকম ছোট হয়ে থাকব? জন্ম থেকে আমার শ্বেতি, তোমার নেই কেন?

তোমার ভুল ধারণা।

আমার সারা শরীর শির শির করে, জ্বালা করে। তাই ডাক্তারের কাছে–

আজ থাক, এই সন্ধেবেলা ওসব কথা আমার ভাল লাগে না। চলো নিচে যাই।

না, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি আর সময় পাব না।

কী ছেলেমানুষি করছ, চলো নিচে।

না, বিমল, শোনো।

না, নিচে চল। নিচে। আমার বড় অস্বস্তি লাগছে। আমার তেষ্টা পেয়েছে।

ছায়াদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি এগিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। ওর সারা শরীরে যেন কোনও স্পন্দন নেই। আমি হাত ধরে নিচে নিয়ে এলাম। যেন ওর পায়ের তলায় চাকা লাগানো, সমস্ত শরীরটা অস্থিহীন, বাসনা বা প্রতিরোধ নেই, নেমে এল নিচে।

.

রাত্তির সাড়ে দশটার মধ্যেও অবিনাশ ফিরল না মায়াকে নিয়ে। এর মধ্যে আবার গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়েছে শেখর আর অম্লান। হইহই ও চিৎকারে কান পাতা যায়নি এতক্ষণ। শেখর কাচের গ্লাস ভেঙেছে, অম্লান হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জানালা দিয়ে, তাস অদৃশ্য করার ম্যাজিক দেখাবার ভান করে। এখন কী চেহারা হয়েছে ঘরটার। অসংখ্য পোড়া সিগারেটের, চুরুটের ছাই, কাপ উলটে চা পড়েছে বিছানা ও চাদরে, শ'খানেক দেশলাইয়ের কাঠি, তাপসের কানে একটা মরা প্রজাপতি। ওটার উপর যতবার আমার চোখ পড়েছে আমি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। প্রজাপতি নয়, হয়তো মথ, যেগুলো রাত্রে ওড়ে। হলুদও কালোয় মেশানোদুই ডানা মেলে ওটা পড়ে আছে। একটু আগেহঠাৎ উড়তে উড়তে ঘরে এসেছিল। সারা ঘরটা যখন পাক দিচ্ছিল অন্ধের মতো, তখন আমাদের সকলের চোখগুলি ছিল ওর পিছনে। আবার কাকে দল থেকে খসাতে এসেছেরে ওটা! পরীক্ষিৎ বলেছিল, কার হলুদ খামে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানিক।

বেশ সুন্দর দেখতে রে পোকাটাকে, যা ছায়ার কপালে গিয়ে বোস। ওর যে বয়স পেরিয়ে গেল।

এই তাপস, আমি তোর চেয়ে বয়সে ছোট জানিস, ছায়াদি চেঁচিয়ে উঠল। হেমকান্তি একদৃষ্টিতে ওকে দেখছিল। মাথা ধরার জন্যই কিনা, ওর দু'চোখ অসম্ভব লাল, দুই বিস্ফারিত চক্ষুতে প্রজাপতি দেখছিল হেমকান্তি। হঠাৎ ওটা ঝপ করে উড়ে বসল তাপসের গায়ে। এ কী রে, এ কী, উঃ বলে আরশোলা গায়ে বসলে কোনও কোনও মেয়ের ভঙ্গির মতো ছটফট করে উঠল তাপস। একঝটকায় ওটাকে গা থেকে ফেলে দিল। সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল, প্রজাপতিটা স্থির হয়ে পড়ে রইল।

এ কী, মেরে ফেললি নাকি? পরীক্ষিৎ আলতো ভাবে ওর হাতের চেটোয় তুলে নিল, তারপর নিজের দৃষ্টি যেন ওর শরীরে মধ্যে ঢুকিয়ে দেখে বলল, না, শেষ হয়ে গেছে। ওটাকে ফেলে দিয়ে আবার অন্য কথাবার্তা বলতে লাগল। তারপর থেকে আমরা ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ বাদে চুরুট ধরাবার সময় অন্য মনস্ক ভাবে পরীক্ষিৎ দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে দিতেই সেটা গিয়ে পড়ল ওর ছড়ানো ডানায়, দপ দপ করে জ্বলতে ও কাঁপতে লাগল আগুনের ছোট্ট শিখা, ধোঁয়া উঠতে লাগল সেখান থেকে। ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি। আমি খুব চুপিচুপি যেন কেউ দেখতে না পায়- যেন কোনও খুব অন্যায় করতে যাচ্ছি, এইভাবে কাঠিটা আস্তে তুলে অন্য জায়গায় ফেলে দিয়েছিলাম।

নাঃ, ভাল লাগছে না, বাড়ি যাই। পরীক্ষিৎ বলল। ওর শরীর যথেষ্ট খারাপ দেখায়, তবু কী করে ঘুরে বেড়ায়, কে জানে! মাথা ফাটিয়েছে ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে, তারপর কেউ আবার বেঁচে ওঠে, একথা কখনও শুনিনি। ও বলেই বেঁচেছে।

শুধু তাই নয়, ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যাওয়াও পরীক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব। কী জানি ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দিয়েছে কিনা, হয়তো প্রাণে বেশি কবিত্ব এসেছিল।

আমারও আর বসতে ইচ্ছে করছিল না। ছায়াদিকে বললাম, আজ যাই, কাল-পরশু তুমি আমার ওখানে আসবে একবার! আমিই যেতাম, কিন্তু তোমাদের অফিসের ওই ব্যানার্জি বড় বিশ্রীভাবে তাকায়।

তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাব।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারি খোঁজাখুঁজি করে দু'খানা পেপারব্যাক গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নিলাম।

এগুলো এখন কেউ পড়ছে নাকি? জিজ্ঞেস করলাম। ঘাড় নেড়ে ছায়াদি 'না' জানাল।

পরশু দিনের মধ্যে আমাকে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে একটা লিখতে হবে, তার আগে এ-রকম কিছু হালকা বই না পড়লে আমার কিছুতেই মন বসে না।

তাপস, তুই এখন যাবি?

না, একটু অবিনাশের জন্য বসে যাই।

আপনি যাবেন নাকি পরীক্ষিৎবাবু?

অবিনাশের সঙ্গে আমার দরকার আছে। তাছাড়া টাকাটা নিয়ে গেল।

দেয়ালে পারিবারিক গ্রুপ ফটোগ্রাফের মধ্যে ফ্রকপরা মায়াকে দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হল ওরা কী আজ সারা রাত এখানে বেলেল্লা করবে?

ছায়াদি বোধহয় আপত্তি করবে না। কিন্তু মায়া থাকতে দেবে না কারুকে। মায়া এসব ব্যাপারে খুব কঠিন, হয়তো তার কারণ মায়ার কবিতা লেখার রোগ নেই।

আমি যাব, দাঁড়ান। হেমকান্তি উঠে দাঁড়াল। যেন ওর বিষম দরকার, এখুনি না গেলে চলবে না। অথচ আমি জানি, আমাদের মধ্যে যে-কোনও এক জন যদি যাবার কথা না বলত, তবে হেমকান্তি এখানেই অনন্তকাল বসে থাকত।

আরেকটু বসে যা বিমলেন্দু, আমি যাব। শেখর বলল।

তুই তো অন্য দিকে। আমি যাই।

বোস না, তোকে এগিয়ে দেব এখন।

কত দূর এগিয়ে দিবি?

নরক পর্যন্ত।

ওদের ফেলেই আমি আর হেমকান্তি বেরিয়ে এলাম। বাইরে বিষম ঠাণ্ডা। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। আপনার মাথা ধরা কমেছে?

হেমকান্তি ওর সুন্দর, বিষণ্ণ মুখ আমার দিকে তুলে বলল, না। হেমকান্তির মতো রূপবান যুবা আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তো নেই-ই, দেখেছিও খুব কম। আমার চেয়েও প্রায় আধ হাত লম্বা, চৈতন্যদেবের মতো গায়ের রঙ, ছিপছিপে শরীর, কপালের ওপর জোড়া ভুরু। অথচ মেয়েরা হেমকান্তিকে পছন্দ করে না। অবিনাশের চেহারা গুণ্ডার মতো, একমাথা চুল, চাপা নাক, তবুঅবিনাশ ললনাপ্রিয়। হেমকান্তির কী অসুখ আমি জানি না, সব সময় চুপ করে থাকে, কথা বলতে চায় না, অথচ বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ ভালবাসে। যে-কোনও আড্ডায় আসা চাই, শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকবে, না জিজ্ঞেস করলে একটাও মন্তব্য করে না। চরম উত্তেজনা, বিষম তর্কাতর্কির মধ্যেও হেমকান্তি নিঃশব্দ। এমন যখন ওর স্বভাব তখন ও একা থাকলেই পারে, কিন্তু কে বলবে, চাকরি-বাকরি করে না, তবু বাড়ির অবস্থা বোধহয় অসচ্ছল নয়। বাড়ির লোকেরা ওর এই অদ্ভুত জীবন কী করে সহ্য করে বুঝি না! ওর এই রকম নম্রভাবে চুপ করে থাকা আমারও বিরক্তিকর লাগে।

সব চেয়ে মজা হয় মেয়েদের সঙ্গে। যখন মেয়েরা থাকে, স্বভাবতই রূপবান হেমকান্তির দিকে তাদের বেশি কৌতূহল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের দিকে তাকায়নি, কথা বলেনি, প্রশ্ন করলে এক অক্ষরে উত্তর দিয়েছে। মেয়েরা এখন ওকে নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করে। মায়া ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। হেমকান্তি সম্বন্ধে গভীর বিতৃষ্ণা মায়ার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে, আমি দেখেছি।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে হাঁটবার পর হেমকান্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি...বাড়ি ফিরবেন?

হ্যাঁ, আমি বললাম, কেন, আপনি ফিরবেন না!

ঠিক ইচ্ছে...আমার মায়ের খুব...অসুখ। হেমকান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার মানে? অসুখ বলেই ফিরবেন না? কী-রকম অসুখ?

খুবই...বলা যায় ।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম হেমকান্তির অবস্থা। সকলে বিষম ব্যস্ত, উৎকণ্ঠা, ডাক্তার আসা যাওয়া করছে। হেমকান্তি চুপ করে সারা দিন বসে আছে নিজের ঘরে, অথবা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সকলের ব্যস্ততা দেখছে। তার নিজের কিছুই করার নেই, কেউ তাকে ডাক্তার ডাকতে বলবে না, ওষুধের দোকানে পাঠাবে না। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেও ওর মা যদি একবার আকুল ভাবে ডেকে ওঠেন, হেম, কোথায়, হেমকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে, হেম –তখনও হেমকান্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাববে সাড়া দেবে কি না, জোরে কথা বলতে হবে না ফিসফিসিয়ে, মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াব না হাঁটু মুড়ে বসব, কপালে হাত রাখবনা কাঁদপ পা ছুঁয়ে, এ-সব বিপুল সমস্যার বদলে বাড়ির বাইরে থাকাই ভাল –হেমকান্তি ভাবে নিশ্চিত। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। অনেক পোষা কুকুরের মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকালে যেমন মনে হয়, মানুষের ভাষায় কথা বলার জন্য বেদনা জেগে উঠছে তাদের মধ্যে, হেমকান্তির মুখেও সেই বেদনা। যেন ও মানুষদের ভাষা জানে না।

আমি হেমকান্তিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী বলছেন? খুব বেশি অসুখ নাকি? এতক্ষণ কিছু হয়ে যায়নি তো?

জানি না।

আমার বিষম ভয় হল। হেমকান্তি বোধহয় মায়ের মৃত্যুর সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণ কিছুই জানায়নি।

শিগগির চলুন বাড়ি। আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

কয়েক পা এগিয়েই হেমকান্তি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, না, আপনি...মানে..আমি একাই যাই। এ-সব জিনিস দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যায় না।

হেমকান্তির বাম বাহু জোর করে চেপে আমি ছুটে চললাম। কাছেই সাদার্ন রোডের মুখটায় বাড়ি।

বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। সদরের সামনে খোলা জায়গাটায় চড়া পাওয়ারের আলো। রাস্তায় বিপুল জ্যোৎস্না আজ। সুতরাং কাছের ইলেকট্রিকের আলো আর জ্যোৎস্না এক জায়গায় মিশেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মিশ্রিত আলোর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে পা দিলাম দুজনে। এ বিষয়ে আমার অনুভূতি একেবারে নির্ভুল। আমি জানি, হেমকান্তির মা আর বেঁচে নেই। এই নিস্তব্ধতা, সিঁড়ি কিংবা দেয়াল-এর যে-কোনও একটা দেখলেই এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথা বুঝতে পারা যায়। যে-বাড়িতে মৃত্যু হয়, সে-বাড়িরই দরজা সে-রাত্রে হাট করে খোলা থাকে, আমি দেখেছি। কেন? চোর-ডাকাতের কথা তখন মনে থাকে না কারুর? কেন? মৃত্যুর থেকে আর বড় চুরি হয় না এই ভেবে? যাই হোক, মৃত্যুর বাড়িতে কখনও চুরি হয়েছে আমি শুনিনি। সে-বাড়ির দরজার একটা পাল্লা ভেজানো পর্যন্ত থাকে না। দুটো দরজাই সম্পূর্ণ খোলা থাকে, আমি বার বার লক্ষ্য করেছি। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার বাড়িতে ভাত ঢাকা দিয়ে মা আমার জন্য জেগে বসে আছে। আমি কেন এত দেরি করছি। আর কোনও দিন দেরি করব না। কিন্তু এখন তো হেমকান্তিকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই দেখা গেল তিন জন দামি পোশাক-পরা ভদ্রলোক দ্রুত বেরিয়ে আসছেন একটা ঘর থেকে। হেমকান্তিকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়ালেন।

এ কী, তুমি শ্মশানে যাওনি? সারা কলকাতা খোঁজা হচ্ছে তোমাকে!

তাঁদের কথার মধ্যে ভর্ৎসনার সুর ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক মুচড়ে উঠল। হেমকান্তি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

চলো, আমাদের গাড়ি আছে, শ্মশানে যেতে হয়, জুতো খোলা! সেই তিন জনের মধ্যে এক জন খুব নরম গলায় বললেন।

মামাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শ্মশান দেখতে পারি না।

সেই ভদ্রলোক কাছে এসে হেমকান্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বুকের মধ্যে অনেকখানি হাওয়া টেনে নিয়ে হু-হু করা গলায় বললেন, তোকে আমি কী আর বলব হেম, চল, যেতে হয়। যে গেল সেছিল আমার দিদি, তোর মা। তোকে সান্ত্বনা দিতে পারব না আমি। চল, হিন্দুধর্মের নিয়মগুলো মেনে দেখ, দুঃখ- কষ্ট আপনি কমে যাবে।

আমি হেমকান্তির মুখের দিকে ভাল করে খুঁজে খুঁজে দেখলাম। সাদা পাথরের মূর্তির মতো স্পন্দনহীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কী জানি কী-রকম দুঃখ-কষ্ট ওর চোখে-মুখে যার কোনও চিহ্ন ফোটে না। হঠাৎ হেমকান্তিকে আমার অত্যন্ত নির্লজ্জ রকমের বিলাসী পুরুষ বলে মনে হল।

৩. ছায়া

ছায়া

ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, ছায়া, তোকে আমি আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেব, তুই খুব নামকরা শিল্পী হবি। বাবা আমাকে রঙের বাক্স কিনে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমি হরপার্বতী, গাছের মাথায় চাঁদ আঁকতাম। বাবা আমার লেখাপড়া সম্বন্ধেও খুব যত্ন নিতেন। আমার জন্য মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আমি ছেলেবেলায় খুব অসুখে ভুগতাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম শুধু। বাবা আমার জন্য লাইব্রেরি থেকে রোজ বই এনে দিতেন। বলতেন, লেখাপড়া শিখে বড় হবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, পৃথিবীর কাউকে গ্রাহ্য করবিনা। আজকাল মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভর না করেও বাঁচতে পারে। পরে বুঝেছিলাম, বাবার অতসব কথা বলার মানে, আমার ঠোঁটের নিচে, কানের পাশে সাদা দাগ। শ্বেতি। তাপসই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাপস বলত, দেখবি, ক্রমশ তোর সারা মুখ, হাত-পা সাদা হয়ে যাবে। তোর আর বিয়ে হবে না।

তাপস আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত –সেই তমলুকে, উনিশশো বেয়াল্লিশে, চুয়াল্লিশে। ওর বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার, আমার বাবা দারোগা। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে আমি আর মায়া ফুলের বাগান করেছিলাম। মা সিঁড়ির ওপর বসে বসে দেখতেন। মায়ের হাঁপানি ছিল বিষম, হাঁটা চলা করতে পারতেন না। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলতেন, তোদর দুজনের এক জনও যদি ছেলে হতিস, আমার কোনও ভাবনা থাকত না। আমরা আসলে পূর্ববঙ্গর লোক বলে বাঙাল বাঙাল' বলত অনেকে, দারোগার মেয়ে বলে ভয়ও করত। তাপসরা খুলনার, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করত না। তাপসের মা বলত, খুকি বাড়ি যাও, ঝড় আসতিছে, পরে আর যাতি পারবা না।

তাপসরা হাতে লেখা পত্রিকা বার করত আমাকে দিত তার ছবি আঁকতে। আমি সুন্দর করে নানা রঙের ফুল লতাপাতা এঁকে দিতাম। আমি একবার বলেছিলাম, তাপস, আমার

একটা পদ্য ছাপাবি এবারের বইটাতে? তাপস বলেছিল, ভাগ, তুই আবার কবিতা লিখবি কী রে? মেয়েদের দ্বারা কবিতা হয় না। মেয়েদের নিয়েই তো কবিতা লিখতে হয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই কোন মেয়েকে নিয়ে লিখিস রে?

সুরঞ্জনাকে নিয়ে। অম্লানবদনে ও বলেছিল। চৌধুরী বাড়ির মেয়ে সুরঞ্জনা। তাপসের কথা শুনে আমার রাগহলেও খুব বেশিহয়নি, কারণ সুরঞ্জনা ছিল রাজকন্যার মতো রূপসী। আমি বলেছিলাম, যা যা, সুরঞ্জনা তোর দিকে কোনও দিন ফিরেও তাকাবে না। তাপস আর আমার দু'জনেরই বয়েস তখন তেরো। মায়ার আট।

তাপস ছিল ছেলেবেলা থেকেই একটু বখাটে ধরনের। স্কুলে পড়তে পড়তেই বিড়ি-সিগারেট খেত। দুপুরবেলা বাবা থানায় চলে যাবার পর তাপস আমাদের বাড়িতে আসত। মা ঘুমিয়ে পড়লে ও দিব্যি সিগারেট ধরাত, দেশলাই জ্বালাবার সময় খুক করে একবার কেশে শব্দটা চাপা দিত। নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করত, রিং করত, আমাকে বলত, খাবি? খা-না। মায়া এক-এক দিন ওকে ভয় দেখাত, বাবাকে বলে দেব। তাপস বাবাকে খুব ভয় করত। তখন থেকেই তাপস অসম্ভব নিষ্ঠুর আর নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাপসরা আজকাল নিজেদের বলে আধুনিক সাহিত্যিক। আধুনিকতা মানে বুঝি নিষ্ঠুরতা!

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় টেস্টের পর আমরা দুজনে এক সঙ্গে পড়াশুনো করতাম। তখনও বাবা মারা যাননি। আমাদের বাড়ির পিছন দিকটার ছোটঘরে বই-খাতা ছড়িয়ে বসতাম। তাপস অধিকাংশ সময়ই চিৎহয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলত, তুই থিয়োরেমগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ কর তোর পড়া ধরব। আমারটা শুনে শুনেই তাপসের মুখস্থ হয়ে যেত। এমনিতে বদমায়েশি-বখামি করলেও পড়াশুনোয় ও ভাল ছেলে ছিল। নিজের সম্বন্ধে বিষম অহঙ্কার ছিল তখন থেকেই। বলত, দেখবি এক কালে তোদের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার সময় আমার গল্প-কবিতার ব্যাখ্যা মুখস্থ করবে। দু'জন উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে দুপুর কাটাতাম, কিন্তু কখনও কোনও অসভ্যতা করেনি তাপস। আমিই বরং মাঝে মাঝে ওর একটা হাত অনেকক্ষণ ধরে থাকতাম।

তাপসের কোনও ভাবান্তর ছিল না। কখনও কখনও ও আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, তারপর আমার ঠোঁটে-মুখে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোকে আশীর্বাদ করছি ছায়া, তোর ওই দাগ এক দিন মিলিয়ে যাবে। এমনিতে তোকে বেশ সুন্দর দেখতে। তাছাড়া দাগ না উঠলেও ক্ষতি নেই। ও দাগ ছোঁয়াচে নয়, ওতে কোনও দোষ হয় না। তাপসের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকে মিশেছি, ছোট ছেলে-মেয়েরা যে কতগুলো ঠিকে অসভ্যতা করে –আড়ালে চুমু খাওয়া, জড়াজড়ি, কি প্যান্ট-ফ্রক খুলে দেখাদেখি সে-সব কখনও না।

যখন আমি প্রথম বালিকা থেকে নারী হলাম, তখন কয়েক দিনের জন্য আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সব সময় ছটফট করতাম, চুল বাঁধতে ইচ্ছে করত না, আয়নায় শরীর দেখতাম, নিজেই নিজের বাহুতে চুমু খেতাম। শুয়ে শুয়ে বা বাথরুমে আমি নানা ছেলের কথা ভাবতাম চোখ বুজে– যেন তারা আমাকে আদর করছে কিংবা পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু কখনও তাপসের কথা ভাবিনি।

তাপস একবার মাত্র অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল। সেদিন দুপুরে ঘোর বৃষ্টি। আমি খাওয়ার পর পড়ার ঘরে বই খুলে বসে আছি, তাপস এল অনেক দেরি করে, ভিজতে ভিজতে। পরীক্ষার মাত্র এক মাস দেরি। তাপস সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ রইল, কোনও কথা নেই, যেন কান পেতে কোনও শব্দ শুনছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই, বৃষ্টির আওয়াজে সর্বত্র শব্দহীন। বাড়িতে কেউ জেগে নেই মায়া স্কুলে। জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, ভূতের মতো রইলি যে? আজ না গ্রাফের অঙ্ক কষার কথা ছিল। ভিজে জামাটা খুলে ফেল না!

শুকনো মুখে তাপস বলল, আজ সকালে একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ হল না। গল্পটা শেষ করতে না পারলে মন স্থির হচ্ছে না। তোকে একটা কথা বলব?

কী?

কিছু মনে করিস না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হিসেবেও ধরতে পারিস। মনে কর, আমরা হাইজিন পড়ছি।

কী ব্যাপার কী?

রাগ করা চলবে না কিন্তু। তোর শাড়ি-ব্লাউজগুলো সব একবার খুলে ফেলবি? আমি একবার তোকে দেখব।

শুনেই কী যে হল আমার, বৃষ্টির শব্দ ছাড়িয়েও বুকের মধ্যে অন্য একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। বুঝতে পারলাম, শরীর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি ঘরের কোণের দিকে সরে গেলাম।

না না, মানে জানিস, খারাপ কিছু না, আমি কোনও মেয়ের সম্পূর্ণ শরীর দেখিনি। একবার দেখতে চাই। শুধু দূর থেকে– ।

তাপস!

তোর ভয় নেই, গায়ে হাত দেব না, দুর থেকে একবার, কেউ তো নেই এ-দিকে।

তাপস, তুই এতটা– ।

সত্যি, আমার খুব ইচ্ছে হয়। গল্পটা শেষ করতে পারছি না। গল্পে এ-রকম একটা ব্যাপার আছে। অথচ নিজে না দেখে, অভিজ্ঞতা ছাড়া...লুকিয়ে চুরিয়ে যে কখনও দেখিনি তা নয়, ছোটমাসিকে চান করার সময় বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে দেখেছি, কিন্তু সামনা-সামনি স্পষ্ট দেখতে চাই। তোকে ছাড়া আর কাকে বলব?

আমার শরীর কাঁপছিল। বললাম, ইতর কোথাকার। এটুকুও জানিস না, এ-কথা কোনও মেয়েকে বলার আগে বলে নিতে হয়, আমি তোমাকে ভালবাসি।

তাপস হো-হো করে হেসে উঠল। তারপব বলল, ওঃ, তুইও বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ পড়েছিস?

না, পড়িনি। তোকে আমার সহ্য হচ্ছে না, তুই চলে যা।

পড়িসনি? তাহলে সব মেয়েই বুঝি এই কথা বলে? আচ্ছা থাক।

তাপসের চেহারা খারাপ নয়, মাজা মাজা গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মুখে একটা পাগলাটে ধরনের শ্রী ছিল। কিন্তু সেদিন আমার মনে হল ওর মধ্যে যেন শয়তান ভর করেছে। আমি বললাম, তুই এক্ষুনি চলে যা, আর আমাদের বাড়িতে আসিস না। তোকে বাদ দিয়েই আমি পাশ করতে পারব।

সেবার অবশ্য আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

বছর আষ্টেক বাদে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত তাপস আমার নিরাবরণ শরীব দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ওরই জিত হল। সেটা ছিল সম্পূর্ণ আমার দোষ। তখন তাপসরা তরুণ সাহিত্যিকদের দল আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে শুরু করেছে। তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলাম। মাথার ওপর কোনও অভিভাবক ছিল না। এখন আমি নিজেই নিজের অভিভাবিকা হতে পেরেছি। আমার স্বাস্থ্য এমনিতেই ভাল, দু'বেলা খিদে পায়, মাঝরাত্তিরেও অন্য রকম খিদে পেত। কিন্তু ছেলেরা কেউ আমাকে দিদি বলত, কেউ বন্ধুর মতো। কিন্তু কেউ আমাকে আড়ালে ডাকেনি, আমাকে কেউ একা চায়নি। আমি সবার সঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কিন্তু কান্না পেত, কারুর বুকে আমি জীবনে মাথা রাখিনি। সেই রকমই এক বৃষ্টির দুপুরে তাপস এল। এসেই বলল, হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ল ছায়া। তাই এলাম। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ অভিমানে আমার বুক ভরে গেল। কেউ আসে না হঠাৎ আমার কথা ভেবে, আমি জানি। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, তাই নাকি? বোস।

তমলুক গিয়েছিলাম, আজই ফিরেছি। স্টেশন থেকে সোজা তোর এখানে এলাম। তোকে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ তমলুকে গিয়ে বিষম মনে পড়ল। তোদের কোয়ার্টারে অনেক লোক এসেছে। সামনের বাগানটায় ফুলের বদলে বেগুনের চারা লাগিয়েছে। বড় খারাপ লাগল। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিতেই মনে হল তোর মা যেন সিঁড়ির ওপর বসে আছেন আর তুই ফ্রক পরে জলের ঝারি হাতে ঘুরছিস। আমার

ছেলেবেলাটাকে তুই বড় দখল করে আছিস। তখনই মনে হল, ফিরেই তোর কাছে যাব। বড় খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিবি?

দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল তখন, পিসিমা ঘুমোচ্ছেন।

কী খেতে দেব? দুধ-চিড়ে খাবি?

হ্যাঁ, তাই দে না, খিদেয় পেট জ্বলছে।

তাপস সোজা আমার কাছে চলে এল, কী করে ওর এ-রকম দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, জানি না। আমার মুখটাকে জোর করে ধরে ঠিক আমার ঠোঁটের নিচে ও কানের পাশে -যেখানে সাদা দাগ, দীর্ঘ চুমু খেল। আমার চোখে কান্না এসেছিল, আমি দু'হাতে ওকে ঠেলে দিতে গেলাম। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। ও আমার ব্লাউজ, শাড়ি, শায়া সব খুলে ফেলল। আমি আর বাধা দিইনি। তাপস আমাকে বিছানায় শুইয়ে ফেলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি ক্লিষ্ট গলায় বললাম, তুই কি কখনও কোনও মেয়ের শরীর দেখিসনি?

হ্যাঁ, দেখেছি অনেক। কিন্তু প্রত্যেকে অন্য রকম। ছায়া, আমি তোকে সম্পূর্ণ ভাবে না দেখলে তোকে কখনও চিনতে পারতাম না। তুই সত্যিই অসাধারণ।

আমার শরীরের অন্য কোনও জায়গায় আর সাদা ক্ষত ছিল না বলে আমি সেদিন খুশি হয়েছিলাম, নাহলে আমি চোর হয়ে যেতাম। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাপস, তুই আমাকে বিয়ে করবি?

না।

কেন!

কারণ, তোর কথা কখনও আমি ভাবিনি।

তবে আজ কী জন্য এসেছিস? শরীর?

হ্যাঁ।

কেন?

কারণ, আমি তোকে ভালবাসি।

আমি উঠে বসে কাপড়টা জড়িয়ে বললাম, এর মানে কী?

মানে হয় না বুঝি? তাহলে জানি না। যা মনে হল তাই বললাম।

এ কী-রকম অদ্ভুত মনে হওয়া?

সত্যিই তা জানি না রে ছায়া! আমার যা মনে হয়, তাই বলি, তাই লিখি। বিচার-বিবেচনা করে অত দেখতে ইচ্ছে করে না। আজ যা বললাম, কাল হয়তো তা মনে হবে না। তাতে দোষ কী? আমি এ-রকম ভাবেই জীবন কাটাতে চাই।

আমি মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। আমার চোখের জল থামছিল না। সম্পূর্ণ বিচার বিবেচনাহীন চোখের জল। বুক থেকে ঠাণ্ডা একটা গভীর উদাসীনতা উঠে এল। তারপর তাপসের দিকে ফিরে খাটের ওপর খানিকটা জায়গা করে দিয়ে বললাম, আয়, দেখি, তোকেও দেখে সম্পূর্ণ চেনা যায় কিনা।

সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, কারণ পরীক্ষার সাত দিন আগে বাবা খুন হয়েছিলেন। বাবা গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন ইন্সপেকশনে। রাত্রে ফিরলেন না। পরদিন তাকে নিয়ে আসা হল একটা গোরুর গাড়িতে, বরফের গুড়োয় সারা শরীর ঢেকে। মরা মানুষের চোখ যে কত বিশ্রী হয়, সেই প্রথম দেখলাম। সেই ঘটনায় মা কিছু দিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন বেশ হাসি-খুশি মানুষ, খুব বড় চরিত্রের নয়। বাবা ঘুষ নিতেন, সন্ধের দিকে রোজ খানিকটা মদ খেতেন, আমরা জানতাম। চোর-ডাকাতদের দমন করার বদলে তাদের নিয়ে

শান্তিতে বসবাস করাই ছিল তাঁর নীতি। ঘুষের টাকা জমিয়েই তিনি কলকাতায় আমার নামে এই ছোট বাড়িটা কিনে ভাড়া দিয়েছিলেন। তবেমদ চোলাই-এর দলটাকে দমন করবার জন্য তিনি কেন উঠেপড়ে লেগেছিলেন জানি না, বোধহয় তারা বাবার মদেই ভেজাল দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওটা টেররিস্টদের আড্ডা, আগস্ট আন্দোলনের রেশতখনও থামেনি।

বাবা মারা যাবার পর আমাদের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল। তারপরও কিছুদিন আমরা তমলুকে ছিলাম। অন্য একটা বাড়িভাড়া করে। কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার সময় মায়া বলেছিল, দিদি, ফুলগাছগুলো তো আমাদের, ওগুলো নিয়ে যাব। আমি বলেছিলাম, থাক না। মায়া ছেলেবেলা থেকেই বিষম জেদি, যাবার সময় টেনে টেনে ফুলগাছগুলো তুলে নিল। যে-বাড়িটায় আমরা গেলাম, সামনে মাঠ নেই, ছোট, অন্ধকারমতো। মায়া একটুখানি জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে গাছগুলোলাগাল, কিন্তু গোলাপ, ডালিয়া, যুঁই, ক্যানা একটাও বাঁচল না।

আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না সেবার। বর্ধমান থেকে বড় পিসিমা এসে রইলেন কাছে, তাছাড়া বরদাউকিল বাবার বন্ধু ছিলেন, আমরা জেঠাবাবুবলতাম, তিনি আমাদের দেখাশনো করতে লাগলেন। বাবার টাকাকড়ির ব্যবস্থা করা, কলকাতার বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা, সবই করেছিলেন। তাপস তত দিনে পাশ করে কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হল। সেবারই পুজোর ছুটিতে ওরসঙ্গে ওর দুই বন্ধু এসেছিল বেড়াতে, পরীক্ষিৎ আর অনিমেষ। তিনটে ঝকঝকে টাটকা ছেলে, সন্ধের সময় রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত। আমার সঙ্গে একবার বন্ধুদের নিয়ে দেখা করতে এসেছিল তাপস। কিন্তু তখন ওর ওপর আমার রাগছিল, সেই জন্য ভালভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। তখন আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছি, মাঝে মাঝে ডাকে নানা পত্রিকায় পাঠাতাম।

কোনও কোনও সময় তাপস, পরীক্ষিৎ আর আমার লেখা একই পত্রিকায় বেরুতো, কিন্তু আমি ওদের লেখা পড়ে বুঝতে পারতাম না।

কলকাতার বাড়িতে একতলায় নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দোতলায় আমরা উঠে এলাম বছরখানেক বাদে। তমলুক সেই ছেড়ে আসা চিরকালের জন্য আমার ছেলেবেলার তমলুক। আসবার সময় মনে হয়েছিল, ওখানে আমরা বাবাকে ফেলে এলাম। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা দরকার ছিল।

মা বিছানায় শুয়ে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। মায়া ক্রমে যুবতী হয়ে উঠেছে। রাত্তিরে খাবার সময় অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতাম আমি, মায়া, পিসিমা, মা। মা বলতেন, কলকাতা শহরে থাকার এই সুবিধে, পুরুষমানুষ না থাকলেও চলে। মায়ার নানা রকম ছেলেমানুষি কাণ্ড নিয়ে আমরা রোজ রাত্রে খুব হাসাহাসি করতাম। মায়া কোনও কারণে রেগে গেলে সাতখানা-আটখানা করে কাচের গেলাসই ভাঙত। স্কুলে যাবার সময় ছেলে-ছোকরারা যদি কোনও মন্তব্য করত, মায়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উত্তর দিত। মোড়ের মাথায় একটা ছেলে ওর সামনে শিস দিয়েছিল বলে মায়া সোজা সেই ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে তার বাবাকে বলে দেয়। সেই ভালেক পরে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে যান। মায়া একবার বায়না ধরেছিল, শীতকালে প্যান্ট-কোট পরে রাস্তায় বেরুবে। মা, পিসিমা কত ঠাট্টা করলেন, বিবিসাহেব, মসিবাবা কত কী বলে হাসাহাসি করা হল, কিন্তু মায়া অটল। এ যেসম্ভবনা, অ মায়াকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। সেই নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি শুরু হয়ে গেল। আমি মায়াকে কোনও দিন বকিনি, কিন্তু ওর বোকা গোঁয়ারতুমি দেখে চড় মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মায়া ত বদলাবে না, রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দিল। মা শেষটায় বললেন, দে ছায়া, ওকে এক সেট বানিয়ে দে। বাড়িতে দর্জি ডেকে মাপ দেওয়া হল। যখন তৈরি হয়ে এল, সব পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ার কী হাসি। মা বিছানার ওপর উঠে বসেছেন, পিসিমা আর আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মায়া বাবার শোলার টুপিটা পর্যন্ত

মাথায় দিয়ে দুলে দুলে হেসে খুন হল। মা বললেন, আমার ছেলে ছিল না, এই তো একটা ছেলে হল!

মায়া সে-পোশাক পরে এক দিনও বেরোয়নি। কখনও খুব রেগে গেলে মায়াকে আমি সেই পোশাকের কথা তুলে ঠাট্টা করি।

মায়া এক দিন সন্ধেবেলা এ-বাড়িতে তাপস আর পরীক্ষিৎকে নিয়ে এসেছিল। পথে দেখা হবার পর তাপস মায়াকে চিনতে পারেনি। ওকে এত বড় হতে তো দেখেনি তাপস। মায়াই তাপসদা, তাপসদা বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিল, তারপর টেনে এনেছিল বাড়িতে। ক্রমে ক্রমে এল ওর বন্ধুবান্ধবদের দল অবিনাশ, হেমকান্তি, অম্লান, অনিমেষ, শেখর, বিমলেন্দু। মা তখনও বেঁচে। বিমলেন্দুর দিদি আমার সঙ্গে বি.এ.-তে পড়ত, সেজন্য ও আমাকে ছায়াদি বলে। সেই শুনে শুনে শেখর, অনিমেষ ওরাও। কেউ আপনি বলে, কেউ তুমি, তুই। অবিনাশ বলে, মেয়েদের মধ্যে একমাত্র আমার কবিতাই নাকি পাঠযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে আমিই প্রথম আধুনিক। শেখর একটা কবিতা পত্রিকার সম্পাদক, প্রতি সংখ্যায় ও আমার লেখা আগ্রহ করে ছাপে। আমি যদিও আমার গোপন দুঃখের কথা কিছুই এ পর্যন্ত লিখতে পারি না। মায়া অবশ্য আমার লেখা সম্পর্কে ঠোঁট ওলটায়। একবার পুজো সংখ্যার লেখার জন্য মানি অর্ডারে টাকা পেয়েছিলাম। মায়া বলেছিল, সে কী রে দিদি, ওই পদ্য লেখার জন্যও লোকে টাকা দেয়? কে পড়ে রে?

মায়ের মৃত্যুর সময় তাপসের বন্ধুবান্ধবরা খুব সাহায্য করেছিল। ওদের মধ্যে কেউ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, কেউ উদাসীন, কেউ লোভী, কিন্তু ওরা কেউই অসৎ নয়। মনে মনে ওরা প্রত্যেকেই সম্রাট কিংবা জলদস্যু, কেউই ছিচকে নয়, সেই জন্যই ওরা সাধারণ নয় কেউ, ওরা সাহিত্যিক, আমি জানি। এক-এক জন পাগল।

মায়ের মৃত্যুর কথা মনে হলেই এখনও আমি সামনে-পিছনে তাকাই। এত ভয়ঙ্করশান্ত মৃত্যু যে হয় আমি ভাবতে পারিনি। এখন যেটা বসবার ঘর করেছি, আগে ওই ঘরটায় একটা খাটে মায়ের দু'পাশে আমি আর মায়া শুতাম। সে-দিন ঘুমোত যাবার আগে মা

আমাদের দু'জনের চুল বেঁধে দিলেন টান করে। সে-দিন মায়া ওর তিন জন মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেয়েছে, এই কথা মাকে বলল। মায়ার কোনও কিছুই গোপন ছিল না, আমাকে আর মাকে সব কথা বলে দিত। ছেলেরা কেন সিগারেট খায় শখ করে সেটা দেখবার জন্য খেয়েছিলাম, জানো মা। প্রত্যেকে তিনটে করে টেনে দেখলাম গীতালিদের ছাদের ঘরে, গীতালি তে কাশতে কাশতে বাঁচে না। আমার কোনও কষ্ট হয়নি, তবে অত আহ্লাদ করে খাবার কী আছে বুঝতে পারিনি।

মা এক হাতে মায়ার চুলের গোছা ধরে আরেক হাতে চিরুনি চালাচ্ছিলেন। আমি মায়ার মুখোমুখি বসে। আমি বললাম, ও এক দিন খেলে কিছুই বোঝা যায় না, পর পর কদিন খেলে রোজ খেতে ইচ্ছে করবে। সেই রোজ খাওয়ার ইচ্ছেটাই নেশা।

ওঃ, তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই রোজ খেয়ে দেখেছিস!

মা হাসতে হাসতে বললেন, দিদি লেখে কিনা, তাই জানে। লেখক-লেখিকাদের সব জানতে হয়।

আমি রোজ খেয়ে দেখব মা? ছেলেরা পারে তো আমরা পারব না কেন? খাওয়ার জিনিসে আবার ছেলে-মেয়ে কী?

খেতে পারিস, তবে বিড়ি-সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। মেয়েদের কালো ঠোঁট দেখা তো কারুর অভ্যেস নেই, তাই খারাপ লাগবে।

তবে মেমসাহেবরা যে খায়?

মেমসাহেবরা ঠোঁট লাল করার জন্য লিপস্টিক মাখে। তুই মাখবি?

না না, লিপস্টিক বিচ্ছিরি।

আমি আর মা হেসে উঠলাম। কদিন ধরে মায়ের শরীর একটু ভাল ছিল। আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। সেদিন সারা রাত আমার সুন্দর ঘুম হয়েছিল। এক ছিটে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। সকালবেলা চোখ মেলে দেখলাম, মায়া উঠে বসে আছে, এক দৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে। কোনও কথা নেই। মায়ের দু'ঠোঁট খোলা, পাশ দিয়ে রক্ত। মা মায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা বেঁচে নেই। সারা রাত আমরা মায়ের পাশে শুয়ে ছিলাম। কোনও এক সময় মা আমাদের ঘুম না ভাঙিয়ে চলে গেছেন। সারা রাত আমরা মৃতদেহের পাশে। এ-কথা যখনই ভাবি, শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। এখনও মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়, মায়া ও আমার মধ্যে মা শুয়ে আছেন। এমনকী অফিসে, ট্রামে, বাসেও মাঝে মাঝে আমার পাশে মায়ের মৃত শরীরের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে। এই অনুভূতির মধ্যে কোনও ভয় নেই, মায়ের চরিত্রের মতোই শান্ত স্নেহময়। কখনও কখনও মনে হয় এই স্নেহময় মৃত্যু আমার শরীরে ঢুকে গেছে। আমারও ইচ্ছে করে ও ওই শান্তভাবে মরে যেতে।

সারা দিন আমি কী করি? কিছুই না। মনে হয় চোখ বুজে কাটাচ্ছি। ভোরে ওঠা স্বভাব, উঠেই হিটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিয়েই চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে দিই। তারপরে বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, আমি একা অনেকক্ষণ স্নানের ঘরে থাকি। মায়ার স্বভাবটা আদুরে ধরনের হয়েছে, বার বার ডাকাডাকি করলে ও উঠতে চায় না। বুনো ধরনের ঘুম ওর, কাপড়-চোপড় এলোমেলো করে দু'পা মুড়ে ঘুমোয়। স্নান করে বেরিয়ে এসে চায়ের কাপ ওর মাথার কাছে রাখি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমি এমন সংসারী হয়েছি, খানিকটা বুড়োটে হয়ে গেছি আমি। সেই জন্যই মায়াকে ওর জলের মতো জীবন কাটাতে দিতে চাই। তাছাড়া ওকে কত সুন্দর দেখতে। আমি যদি মায়া হতাম, আমার এক-এক সময় মনে হয়। এক-এক দিন রাত্রে আমি যখন সংসার খরচের হিসাব লিখি, তখন হিসেব না মিললে আমার রাগ হয়, তার পরেই হাসি পায়, মনে হয় যদি আমিও মায়ার মতো এখন পাশের ঘরে বসে রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা শুনতে পারতাম! কখনও কখনও নিচতলার ভাড়াটে ভুবনবাবু এসে বলেন, ছায়া দেবী, আমাদের নর্দমা দিয়ে জল সরছে না, একটা ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া আপনাদের

বারান্দা দিয়ে জল ঢাললে আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছড় ছড় করে পড়ে। আমি তো বাড়িতে প্রায়ই থাকি না –হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন, কিন্তু আমার ওয়াইফ বললেন, যখন মাস মাস ভাড়া গুনে যাচ্ছি, তখন অসুবিধে ভোগকরব কেন? তুমি বাড়িউলিকে বলো! (বাড়িউলি শব্দটা উচ্চারণ করেই টুথব্রাশ-গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক লজ্জা পান। আমার সম্পর্কে ওরা নিজেদের মধ্যে যে-ভাষা ব্যবহার করে তাই বেরিয়ে পড়েছে হঠাৎ। ছিপছিপে, চশমা-পরা, এমএ পাশ যুবতী যদি বাড়ির মালিক হয় তাহলে যে তাকে সামনাসামনি বড়িউলি বলা যায় না, এ বিশ্বাস ওর আছে মনে হল।) তখন ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে ঠাস করে লোকটার গালে চড় মারি। তার বদলে আমি এ-দিক ওদিক তাকিয়ে দেখি মায়া আছে কি না। ও থাকলে চড় না মেরেও নিশ্চিত ঝগড়া বাধিয়ে দিত। আমি শান্তভাবে বলি, আপনি একটা লোক ডেকে ব্যবস্থা করুন, খরচ যা হয় ভাড়া থেকে কেটে নেবেন। লোকটা তখনও নড়তে চায় না, বুঝতে পারলাম, পর পর সাত দিন নাই ডিউটি দেবার পর আজ ওর ছুটি। ভাঁজ করা কাপড়ের লুঙ্গি-পরা লোকটা চেয়ারের দিকে গুটি গুটি এগোয়। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলি, একটা মিস্ত্রি পেলে আমাদের বারান্দাটাও সারিয়ে নেবেন।

আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে ভিড়ের ট্রাম-বাস। হাজার-হাজার নিশ্বাসের গরমে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসতে চায়। ইচ্ছে হয়, ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠি। লোকগুলো আমাকে প্রাণে মারতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই, ঠিক দশটার সময় আমাকে অফিসে যেতে হয়। কাজ ভাল লাগে না। পাবলিসিটির ফার্মের কাজ। নানা লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, লে আউট, ব্লক, কপি, ম্যাট, বিজ্ঞাপনের উমেদার, আর্টিস্ট। মাঝে মাঝে ছোটখাটো কাগজ থেকে ছেলেরা আসে। প্রথমে আমার কবিতা চায় একটা, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিজ্ঞাপনের কথা বলে। রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়, কিন্তু আমার এই-ই চাকরি, সুতরাং মিষ্টি করে হাসি, বলি, বিজ্ঞাপনের বাজেট তো শেষ হয়ে গেছে ভাই, এপ্রিলের আগে আর তো হবে না! কবিতা অবশ্য দিতে পারি– পনেরো পাতা, ছাপবেন? ছেলেগুলো কিন্তু কিন্তু করে হাসে, তারপর নেকস্ট উইকে আসছি বলে সরে পড়ে। তবুএ চাকরিটা এক দিকে থেকে ভাল, অন্য ঝামেলা নেই। ওপরের অফিসারদের মাঝে মাঝে

গাড়ি করে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলে ছুটির পর সত্যিইছুটি। কিছুদিন কলেজের প্রফেসারি করেছিলাম, হাজার প্রশ্ন সেখানে বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই কেন, কার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি, কারা সব বাড়িতে আসে? অসহ্য!

আমি তো তবু ইচ্ছে মতো চাকরি বদলাতে পারছি। আর তাপস? একটা স্কুলে চাকরি করত, ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছে, তারপর আজ প্রায় দেড় বছর বেকার। ছি ছি, ছেলেদের এত দিন বেকার থাকা মোটেই মানায় না। কিন্তু তাপসের তো দোষ দিতেও পারি না, ও তো চেষ্টাও কম করছে না। তাপসের মাথা খুব ভাল ছিল, মন দিয়ে পড়াশুনো করলে ব্রিলিয়ান্ট স্কলার হতে পারত। তবু যাই হোক ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বিএ তো পাশ করেছিল। শরীরে কোনও রোগ নেই, শক্ত স্বাস্থ্য, বিএ পাশ এক জন ছেলে কোনও চাকরি পাবে না? ব্রিলিয়ান্ট স্কলার তো অন্য অনেকেই হয়, কারুকে কারুকে তো লেখকও হতে হবেই, কিন্তু সে কোনও জীবিকার সন্ধান পাবে না? স্কুলের চাকরিটা হারাবার ব্যাপারেও তাপসের কোনও দোষ নেই। পড়াবার সময় ও ক্লাসে বসে সিগারেট খেত, তাই নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে ওর ঝগড়া। অঙ্কের মাস্টার কিংবা পণ্ডিতরা ক্লাসে বসে নস্যি নেয়, তাতে কোনও দোষ নেই, আর ইংরিজির মাস্টার ক্লাসে বসে সিগারেট খেলেই দোষ? ছেলেরা দেখে দেখে শিখবে? ক্লাস থেকে বেরুলে ছেলেরা আর কারুকে সিগারেট খেতে দেখেনা? বাবাকে দাদাকে দেখে না? ছেলেরা অনেক কিছুনা দেখেও শেখে, শিখবেই। সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী? স্কুলে এসে লেখাপড়াটা ঠিকমতো শিখছে কি না সেটুকু অন্তত দেখলেই যথেষ্ট। আসলে, শুধু সিগারেট খাওয়া নয়, তাপস যে হেডমাস্টারের কথা নতমস্তকে মেনে নেয়নি, সেইটাই আসল দোষ। প্রবীণ হেডমাস্টার যখন সিগরেট খাওয়া নিয়ে আপত্তি করেছিলেন, তখন তরুণ শিক্ষকের উচিত ছিল লাজুক মুখে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলা, ভুল হয়ে গেছে স্যার, আর করব না। প্রধান শিক্ষককে অন্য শিক্ষকরা শ্রদ্ধা করবে, এইটাই তো নিয়ম। কিন্তু শ্রদ্ধা করবেই-বা কী করে? হেডমাস্টার মশাই তাপসকে একটা চিঠি লিখেছিলেন বাংলায়, তাপস সেটা আমাদের দেখিয়েছিল হাসতে হাসতে, চোদ্দো লাইনের চিঠিতে পাঁচটা বানান ভুল, গোটা দশেক ইংরিজি শব্দ। হেডমাস্টার মশাইইতিহাসের লোক, তাই তার চিঠিতে বানান ভুল থাকরে? একটা গোটা

বাংলা চিঠিও লিখতে জানবেন না? এদের হাতে শিক্ষার ভার, এরা প্রধান শিক্ষক, এদের লোকে শ্রদ্ধা করবে কী করে? নিজের বানান ভুল না শুধরে অন্যের সিগারেট খাওয়ার দোষ ধরতে এসেছে!

তাপস আর একটা ইন্টারভিউ' র গল্প বলেছিল, শুনে হাসতে হাসতে আমরা মরি। রেলওয়ের গুডস ডিপার্টমেন্টের একটা কেরানির চাকরি। কেরানির চাকরি, তারই ইন্টারভিউ নিচ্ছে পাঁচ জন জাঁদরেল অফিসার। তিন জন বাঙালি, এক জন পাঞ্জাবি, এক জন মাদ্রাজি। ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে শ'খানেক ছেলেকে, তার মধ্যে এমএ পাশই জনাদশেক। তাপস ঢোকার পর সবাই নিবিষ্ট ভাবেওরঅ্যাপ্লিকেশনটা পড়তে লাগল। রেলের চাকরির অ্যাপ্লিকেশনে নাকি চোদ্দো পুরুষের ঠিকুজি কুষ্টি সব দিতে হয়, তবু ওদের এক জন তাপসকে আবার নাম, বয়স, কত দূর লেখাপড়া, এসব জিজ্ঞেস করল। তাপস কোনও গোলমাল না করে উত্তর দিয়েছে। গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবিটা বলল, তোমার তো স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে, তুমি এ চাকরি করতে এসেছ কেন?

তাপস বলল, একটা কোনও চাকরি তো করতে হবে। আর কোনও চাকরি পাচ্ছি না।

তুমি এ কাজ পারবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি দায়িত্বের সঙ্গে সব কাজ করব এবং নিশ্চিত আশা করি, আমার কাজে আপনাদের খুশি করতে পারব।

অর্থাৎ তাপস বেশ বিনীত ভাবেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক জন আচমকা জিজ্ঞেস করল, তুমি জানো, আকবর কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন?

তাপস চমকে গিয়েছিল, তবু বিনীত ভাবে বলেছে, ঠিক মনে নেই। এ চাকরির পক্ষে এটা জানা খুব দরকারি কি?

এ-সব সাধারণ জ্ঞান। সমস্ত শিক্ষিত লোকেরই জানা উচিত।

না, আমি ঠিক জানি না।

পৃথিবীতে তুলোর চাষ সব চেয়ে বেশি কোথায় হয়?

এটাও আমি ঠিক জানি না। পরে জেনে নিতে পারি।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। নেকস্ট।

এইবার তাপস জেগে উঠল। টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, স্যার আমার ইন্টারভিউ হয়ে গেল? আমার চাকরির খুবই দরকার, আমার ইংরিজি লেখার পরীক্ষা নিলেন না?

তোমার হয়ে গেছে, তুমি যেতে পারো।

না স্যার, অত সহজে আমি যাচ্ছি না। আমিও দু-একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আপনাদের কাছে জেনে যাব। বলুন তো, সিরাজদৌল্লার বাবার নাম কী? আমি এটা জানি। আপনি জানেন?

বলছি তো তুমি এখন যেতে পারো, বেয়ারা।

মাইরি আর কী, বেয়ারা ডাকলেই আমি যাচ্ছি! ওটা খুব শক্ত, না? আচ্ছা, বলুন তো, কোন সালে প্রথম বাষ্প এঞ্জিন চলেছিল? বলুন।

বেয়ারা, বাবুকো দরজা দেখা দেও।

ওসব বেয়ারা-ফেয়ারা ডেকে কোনও লাভ হবে না। একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আমি জেনে যাবই। তোমাদের মধ্যে কার ক্যান্ডিডেট ঠিক করা আছে আগে থেকে?

বেয়ারা, দরোওয়ানকো বোলাও।

আবার দরোওয়ান দেখানো হচ্ছে। ও-কথার জবাব না পেলে আমি এখানে ডিগবাজি খাব, কাপড় খুলে নাচব, তোমাদের থুতনিতে চুমু খাব। ইয়ার্কি পেয়েছ শালারা? তোমাদের গুষ্টির পিণ্ডি করব আজ।

শেষ পর্যন্ত দরোওয়ানরা এসেই ওকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে দেয়। তাপস অনবরত আস্ফালন করতে থাকে, সেই ইন্টারভিউ বোর্ডের পাঁচ জনেরও সর্বনাশ করে দেবে।

কিন্তু কিছুই সর্বনাশ তাপস ওদের করতে পারেনি। ওরা মোটরগাড়িতে চেপে ঘোরাঘুরি করে। সাহেবপাড়ায় থাকে, ওদের সমাজ আলাদা, দুর্গের মতো সে-সমাজ সুরক্ষিত। তাপসরা সেখানে কিছুই করতে পারে না। তাপস অবশ্য এখনও শাসায়, ও আর সারা জীবনে রেলে চড়ার সময় টিকিট কাটবে না, সুযোগ পেলেই রেলের বাথরুমে আয়নার কাঁচ ভাঙবে, বা চুরি করবে। কিন্তু তাতে ওদের কী ক্ষতি হবে?

তাপস আজও চাকরি পেল না, আমার বড় মায়া লাগে, যখন তাপস বন্ধুদের কাছে গাড়ি ভাড়া চায়। যে-রকম সাংঘাতিক লেখক হিসেবে তাপসের নাম, ওইটুকু নামেই যে-কোনও ইংরেজ লেখক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করত। এক-এক দিন তাপসের মুখখানা শুকনো দেখায়, বড় বেশি গম্ভীর থাকে। সেই সব দিনে ওকে দেখলে ভয় করে, মনে হয়, ও যেন কোনও ভয়ঙ্কর সর্বনাশের প্রতীক্ষায় আছে।

কিন্তু তাপসের কথা আমি ভাবছি কেন? তাপস নিষ্ঠুর, তাপস আমাকে গ্রাহ্য করে না। সেই এক দুপুরবেলা এসেছিল, তারপর থেকে আর আসেনি কখনও একা, ও আর আমাকে একা এসে দেখতে চায় না। আমিই কাঙালিনীর মতো ওর কাছে গিয়েছিলাম কয়েক বার, কী নির্লিপ্ত আর উদাসীন ওর ব্যবহার। একদিন শুধু সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আয় ছায়া, তোকে একটা চুমু খাই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঝট করে এগিয়ে এসে আমাকে চুমু খেল, তারপর চলে গেল। যেন হঠাই ওর আমাকে চুমু খাওয়ার কথা মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা চুকিয়ে নিল, আবার পরমুহূর্তেই ভুলে গেল আমার কথা। এই মানুষকে কেউ সহ্য করতে পারে না। তাপস

আমার কেউ না। এর চেয়ে বিমলেন্দু অনেক ভাল, বিমলেন্দু অনেক নির্ভরযোগ্য। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা সান্ত্বনা আছে।

কোনও কোনও দিন বিমলেন্দু খোঁজ করে অফিসে, ছায়াদি, আজ বিকেলে কী করছ? একটা ফিমে যাবে নাকি? বাইবেল হাউসের বারান্দার নিচে বুক-খোলা শার্ট গায়ে বিমলেন্দুদাঁড়িয়ে থাকে। একটু নার্ভাস ভাবে সিগারেট টানে। আমার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেই আমার গা শির শির করে, আমার শ্বেতির দাগ-ধরা ঠোঁট জ্বালা করে ওঠে যেন। দুর থেকে যখন হেঁটে আসি হাওয়ার বিপরীত দিক দিয়ে, শাড়ি উড়তে থাকে, বিমলেন্দুকে দেখে আমার লজ্জা করে, কেন লজ্জা করে ঠিক জানি না। সিনেমার অন্ধকারে বসে অন্য মনস্ক ভাবে বিমলেন্দু আমার বাঁ-দিকের বুকে চাপ দেয়। আমিও মাঝে মাঝে ওর হাত ধরে খেলা করি। এক-এক সময় ওর কোলের ওপর হাত রাখি। বোকা, অত্যন্ত বোকা ছেলেটা, বোকা- । আমি হাত সরিয়ে নিই না। আমার ভাল লাগে। বিমলেন্দুকে কোনও দিন চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিইনি। কখনও ইশারাও জানাইনি। দেখতে চাই, ও কী করে। কোনও দিন হঠাৎ হুড়মুড় করে আমাকে জড়িয়ে ধরে কি না। অথবা এমন হতে পারে, আমি বিমলেন্দুকে পছন্দ করি না, আসলে ওকে দু'চোখে দেখতে পারি না। ওর ওই নির্লিপ্ত, হাঁসের পালকের মতো মুখ কেন কোনও মেয়েকে দেখায়? কেন বিমলেন্দু আসে আমার কাছে, ওরকী আর কোনও মেয়ে-বন্ধু নেই,

ও আমাকে ভালবাসে? নাকিও আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করে সঙ্গ দিতে আসে? বিমলেন্দু আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত, গল্প কবিতা দুটোই ভাল লেখে, প্রবন্ধ সমালোচনার দিকেও আছে, বড় কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক। প্রবীণ লেখকরা আমাদের মধ্যে বিমলেন্দুকে দেখলেই সাগ্রহে চিনতে পারে-আমাকেও চেনে অনেকে, সেটা আমি মেয়ে বলে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আমি বোধহয় চাইনা, আমি চাই একটা ছটফটে, দুর্দান্ত, কেয়ারলেস যুবক। কার মতো? কার মতো? অবিনাশের না, অম্লানের মতো, একটু আনন্দ হলেই যে কোমর থেকে বেল্টখানা খুলে বোঁ বোঁ করে ঘোরায়।

যে-সববিকেলে বিমলেন্দুআসেনা, সাধারণত কোনও কাগজের অফিসে যাই, অথবা বাড়ি ফিরে আসি। মায়া সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকেনা, দু'জনে বসে দাবা খেলি। পিসিমা চায়ের সঙ্গে গরম গরম ফুলকপি বা ওমলেট ভাজা দেন। রাত্রে খাওয়ার পর লিখতে বসি, অনেক লেখা পছন্দ হয় না, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু প্রত্যেক দিন কিছু না-কিছু না লিখলে আমার ভাল লাগে না।

রাত্রে ঘুম আসেনা, সাধারণত ঘুমের কথা ভাবি। এক-এক রাত্রে আমার শয্যাকণ্টকী হয়, বিছানার কোনও জায়গায় শরীর ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে না, অসহ্য বমি বমি লাগে। মনে হয়, মা আমার পাশে শুয়ে আছে। মায়ের জন্য কষ্ট হয়।

এইরকম আমার জীবনের দিন কাটে। কিন্তু কীভাবে কাটাতে চাই? আমার ইচ্ছে করেনা চাকরি করতে, ইচ্ছে হয় সকাল ন' টা পর্যন্ত ঘুমোই, ইচ্ছে হয়, প্রতি কথায় গালাগালি করি, রাস্তাঘাটের বখা ছেলেরা যে-রকম মুখ-খারাপ কুৎসিত কথা বলে, আমারও ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে সেই রকম বলি, দুরশালা, দুর – ছাপার অযোগ্য, তোমার ইয়েতে ইয়ে দিই। ইচ্ছে হয় খারাপ মেয়ের মতো কোমর দুলিয়ে হাঁটি। কখনও এ-সব বলতে বা করতে পারব না, তবু ইচ্ছে হয়। আয়নার সামনে এই রকম ভঙ্গি করে দেখি। ইচ্ছে করে, সারা দিন শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে থাকি। দুটো ষণ্ডামার্কা চাকর থাকবে, হুকুম মতো তারা আমার ফুটফরমাস খাটবে, ধমকালে কুঁকড়ে যাবে, সাহস করবে না চোখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে, গোপনে তাপসের বুকে ছুরি বসিয়ে দিই। কিংবা নিজের বুকে।

এ ছাড়া, একা একা কান্না পায়। মায়া না থাকলে আমি বাড়িতে শুয়ে কাঁদি। আসলে সারা দিন আমি কী করি, তা জানি না। আমি কী করতে চাই, তা জানি না। আমি খুবই শিগগির মরে যাব, জানি। আমার কান্না পায়। মা, তোমার জন্য আমার বিষম মন কেমন করে।

৪. অনিমেষ

অনিমেষ

একটু সন্ধে হয়ে এসেছিল, তাই মাঠের মধ্য দিয়েই জিপ চালিয়ে দিয়েছিলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, রণছোড়, তোমার ফিরে যাবার তেল আছে তো? কথাটা জিজ্ঞেস করার পরই আমার লজ্জা হল। প্রায়ই আমি ভুলে যাই যে, ও বোবা। রণছোড় ওর বিশাল দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আছে। বোবা বলেই কি রণছোড়ের চোখদুটো এত বড়? ওর চোখ সব কথার উত্তর দিতে পারে, কোনও মেয়ের চোখও এত পারে না। তাছাড়া ওর চোখের ভাষাও খুব সরল, শিশুরাও বুঝতে পারে। কিন্তু মেয়েদের চোখে ভাষা পড়তে হলে আলাদা বিদ্যে লাগে, আমার তা নেই।

দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম। সব ঘরে আলো জ্বালা। গায়ত্রী সব ঘরে আলো জ্বেলে রাখতে ভালবাসে। একটা জানলায় ও বসে আছে। ও কী আমার জন্য বসে আছে, নাকি আলো জ্বালা ঘরে বসে দূরের অন্ধকার দেখতে ভাল লাগে। একটা কুকুর ডেকে উঠল প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করে। ডাকটা খুব মানিয়ে গেল। দূরে আলো জ্বালা বাড়ি, মাঠে অন্ধকার, অন্য মনস্ক নীল আকাশ-এর মধ্যে একটা কুকুরের ডাকনা থাকলে মানাচ্ছিল না।

আজ সকালে অবিনাশ একটা চিঠি লিখেছে। কতবার বলেছি, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিতে, বাড়িতে নয়, ওর খেয়াল থাকেনা। গায়ত্রীর একটা খারাপ স্বভাব আছে, চিঠি খুলে পড়া। কলকাতার মেয়েরা এসব করেনা, স্বামীর চিঠিও খোলে না। কাশীর মেয়েদের ও-শিক্ষা নেই। আমার বন্ধুবান্ধবদের চিঠি গায়ত্রীর পক্ষে হজম করা একটু শক্ত। গায়ত্রী বলেছিল, কী অসভ্য আর কাঠখোট্টা তোমার বন্ধুগুলো লিখেছে, মল্লিকাটা মারা গেছে। একটা মেয়ে, তা-ও মারা গেছে, তার সম্বন্ধে 'মল্লিকাটা' কী? কী ভাগ্য আমার, মল্লিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখেনি, তাই আমি বললাম, মল্লিকা হল শেখরের ছোট বোন। খুব বাচ্চা

তো, অবিনাশ ওকে খুব ভালবাসত, ওদের বাড়ি গেলেই খেলা করত তাই। মল্লিকা মারা গেছে, সে-খবর আমাকে জানাবার দরকারই-বা কী ছিল মল্লিকার কাছে আমি কখনও যাইনি, ওদের মুখেই নাম শুনেছিলাম, তাপস খুব বলত, তাপসের বোধহয় ওই বেশ্যাটির উপর সত্যিই খুব টান ছিল। আর অবিনাশের তো সবাইকেই ভাল লাগে। মেয়েটা নাকি কোন বিখ্যাত অভিনেতার বে-আইনি মেয়ে।

অবিনাশ লিখেছে, পরীক্ষিৎ ভাল আছে। মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছে। ওঃ, সে-দিনের রাত্রের কথা ভাবলেও ভয় হয়। পরীক্ষিতের ও-রকম মদ খাওয়া নিয়ে হইচই করা আমি মোটেই পছন্দ করি না এই জন্য। আর মদ খেয়ে ব্রিজের রেলিঙে বসা কেন? অপঘাতে মৃত্যুই পরীক্ষিতের নিয়তি। হঠাৎ একটা আর্তস্বর, তার পরেই নিচের নদীতে শব্দ। গায়ত্রী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল, ফিরে এসে ব্রিজের কোণে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি কাছে যেতেই বলল, আমার আজ কেন জানি না ভাল লাগছে না, বোধহয় শরীরটা খারাপ, না এলেই ভাল হত মনে হচ্ছে। এই সময় ওই কাণ্ড। হা-হা-হা করে চারপাশের দোকান-জঙ্গল-মন্দির থেকে নিমেষে কয়েকশো লোক ছুটে এল। আমরা দুজনে দৌড়ে এলাম। আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বললুম, কী হয়েছে? পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে হাত ছাড়ুন, ওকে খুঁজে আনি। কথাটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে, আর অবিনাশ এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য? কোনটা বেশি ভয়ঙ্কর, পরীক্ষিতের পড়ে যাওয়া, না অবিনাশের এখান থেকে লাফিয়ে ওকে খোঁজা? আমি এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না। এখান থেকে লাফালে কেউ বাঁচে? পরীক্ষিতের এতক্ষণে কী হয়েছে কে জানে। এর নাম বন্ধুত্ব, অবিনাশের মতো ও-রকম অকপট দুঃসাহসী আমি আগে কখনও দেখিনি। আমি আর গায়ত্রী দু'জনে ওর হাত চেপে ধরলাম প্রাণপণে। অবিনাশ হ্যাঁচকা টান মারতে মারতে বলল, ছাড়ুন না, আমার কিছু হবে না। দেখি ওকে বাঁচানো যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত চা-ওয়ালা বিষ্ণু ওকে জোর করে পাজাকোলা করে নামিয়ে এনে বলল, পাগল হয়েছেন আপনি মশাই, চলুন ব্রিজের নিচে যাই। আমি এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখলাম, ব্রিজের নিচে অন্ধকার, ভাঙা ভাঙা চাঁদের

আলো, আর কিছু নেই। পরীক্ষিৎকে দেখা যাচ্ছেনা। আমাদের সামনে সকলের আগে ছুটে গেল অবিনাশ, জামাকাপড় খুলে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি এ-সব উত্তেজনা সইতে পারি না, এমন ছুটোছুটি চিৎকার। পরীক্ষিৎ মরে গেছে, এ-কথা ভেবে আমার বুকের মধ্যে দ্রিম দ্রিম করে শব্দ হচ্ছিল। আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়িনি, পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তার কারণ আমি সাঁতার জানি না। ওরা কি কেউ ভাবল, আমি শীতের ভয়ে জলে নামলাম না? বা প্রাণের ভয়ে? আমি সাঁতার জানি না, এ-কথা গায়ত্রীও হয়তো জানে না। ওর সামনে কখনও নদীতে বা পুকুরে স্নান করেছি বলে মনে পড়ে না। আমি ছেলেবেলায় একবার জলে ডুবে গিয়েছিলাম, সেই স্মৃতি আমি কখনও ভুলি না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, পরীক্ষিৎ জলের নিচের নীল অন্ধকারে কী যেন খুঁজছে। বাতাস–এইমাত্র ওর বুক থেকে যে শেষ বাতাসও বার করে দিয়েছে সেটুকু আবার ফিরিয়ে আনা যায় কিনা প্রাণপণে খুঁজছে। ওর জন্য বুকভর্তি বাতাস নিয়ে অবিনাশ গেছে, পরীক্ষিতের মুখের মধ্যে ফুঁ দিয়ে অবিনাশ বাতাস ঢুকিয়ে দেবে। আমিও বুক ভর্তি বাতাস নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমি জলে নেমে পড়ার সাহস পেলাম না।

পরীক্ষিৎ মরার ছেলে নয়, এক সময় ও দেশবন্ধু পাকে ছেলেদের সাঁতার শেখাত। যখন খুব পয়সার দরকার, পরীক্ষিৎ তখন দেশবন্ধু পার্কের পুকুরের ছোট দ্বীপটায় মাথায় একটা তোয়ালে বেঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচাত কে কে সাঁতার শিখবে, দু'আনা, দু'আনা, ছুটে এসে ছেলেরা, দু'আনা দু' আনা। সাত দিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু'আনা, সাতদিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু'আনা, দু'আনা। তখন পুকুরটা এ-রকম বাঁধানো ছিল না, ভাঙাচোরা। গরমের দিনে ছেলেরা বিকেলে এসে দাপাদাপি করত, মন্দ আয় হত না পরীক্ষিতের। দিনে বারো-চোদ্দো আনা। মাঝে মাঝে এক ডুবে পুকুরের মধ্য থেকে মাটি ভোলার খেলা দেখাত। সুতরাং, জলে ডুবে মরা পরীক্ষিতের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আচমকা অত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া, তাছাড়া এসব পাহাড়ি নদীতে আগাগোড়া পাথর ছড়ানো, মাথায় আঘাত লাগলেই আর বাঁচবার আশা নেই।

অবিনাশ জলে ঝাঁপিয়ে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করতেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, ওই যে, ওই যে। ব্রিজের একটা থাম ধরে পরীক্ষিৎ জলে ভেসে ছিল, অন্ধকার মুখে একটাও শব্দ নেই। চা-ওয়ালা বিষ্ণু আর অবিনাশ ওকে ধরে নিয়ে এল পাড়ে। রক্তে জল ভেসে যাচ্ছে, পরীক্ষিতের তখনও জ্ঞান ছিল, বলল, আর বেশিক্ষণ থাকতে পারতুম না, মাথায় খুব লেগেছে। হাসপাতালে পৌঁছুবার আগেই ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল, ভয়ঙ্করভাবেওর মাথা ফেটে গেছে। অবিনাশ ওর মাথাটা চেপে ধরে আছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে তবু পড়ছে রক্ত। ডাক্তারের সামনে গিয়ে যখন অবিনাশ হাতটা তুলল, ওর দুই হাতের পাঞ্জা টকটকে লাল। আঙুল বিস্ফারিত করে অবিনাশওর ডান হাতের লাল পাঞ্জা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল। মুখে কোনও বিকার নেই। আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল।

খাওয়া শেষ করে একটা পাইপ ধরিয়ে জানলার পাশে বসলাম। পাইপ খাওয়া নতুন শিখেছি, বেশ চমৎকার লাগে একা একা। গায়ত্রী টুকিটাকি কাজ শেষ করছে। অনেক দিন কিছু লিখিনি। লেখার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে কী-রকম যেন একটা শব্দ হয়। সিনেমার থিম মিউজিকের মতো। বেশ তো ঘুরছি ফিরছি, গায়ত্রীকে আদর করছি, বন্ধু-বান্ধবের কথা ভাবছি, নদী দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছি–তবু মনে হয় কত দিন একটা কবিতা লিখিনি, অমনি বুকের মধ্যে ওই থিম মিউজিকটা ফিরে আসে। সুরটা দুঃখের নয়, রাগের, যে যে জিনিসকে ভাল লেগেছিল, তাদের উপর অসম্ভব রাগ হয়। মনে হয়, তোমাদের ভাল লেগেছিল? তোমাদের তবে কবিতায় আনতে পারলাম না কেন? কেন আমার ভাষা গরিবহয়ে যায়? মনে হয় হেরে গেলুম। কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে। এই গাছপালা, পাহাড়, নদী, আকাশ যে ঈশ্বরের ভাষা, তার কাছে। তখন মনে হয়, গাছের ছাল ছাড়িয়ে দেখি, ফুলের সমস্ত পাপড়ি খুলে ফেলি। গায়ত্রীর সঙ্গে রাতের কাণ্ড করি আমি আলো জ্বেলে, ওর সমস্ত কাপড় জামা খুলেও ওই স্ত্রী-শরীরের দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করে ওর ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিই, বুকটা ফাঁক করে দেখি, কেন ওই বুকে মুখ রাখতে আমার ভাল লেগেছিল।

কেন, কেন, কেন-এর উত্তর খুঁজতেই সময় কেটে যায়। কেন এটা সুন্দর, কেন ওটা কুৎসিত এ প্রশ্ন নয়, কেন এটা আমার ভাল লাগল, কেন ওটা আমার ভাল লাগেনি এই অসঙ্গত প্রশ্ন। ভাল লাগে, তবে বিশেষ কিছুই আজকাল নতুন লাগে না। সবই মনে হয় আগে দেখেছি। যে-কোনও দৃশ্য, যে-কোনও মানুষ দেখলেই মনে হয়, আগে ওদের দেখেছি। যদি কখনও বিলেত-আমেরিকায় যাই, তাহলেও আমার নিশ্চিত ধারণা, সেখানকার সব কিছু দেখেই আমার ধারণা হবে, এ-সব আমি দেখেছি অনেক আগে। বহু আগেই এসব আমার দেখা। তবে কী যারা অ্যাটম বোম বানাচ্ছে– তারা কবিদের চেয়েও বড় প্রজাতি? তারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, ওরাও সৃষ্টি করছে– ধ্বংসের দৃশ্য, দৃশ্য হিসেবে তা-ও নতুন, স্নায়ু আর মাথার ধুসর কম্পনে মানুষ অনেক ধারণা, রসের স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু অ্যাটম বোমওয়ালারা একটা নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে, সামগ্রিক মৃত্যুচিন্তা। এত দিন মানুষ শুধু নিজের মৃত্যু বা প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা ভেবেছে, সাহিত্যেও ওইসব মৃত্যুর কথা। কিন্তু একটা মহাদেশ বা সমস্ত মানুষ জাতটার জন্য মৃত্যুভয় আমি একা একা ভোগ করছি এখন। সাহিত্য এর ধাক্কা সামলাতে পারছে না। প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটার পরীক্ষার সময় ওপেনহাইমার বিড় বিড় করে ভগবদ্গীতা আউড়েছিল। আমি তো গীতা পড়ে ভাল বুঝতে পারিনি।

পরীক্ষিতের কবিতার বইটা উলটে-পালটে দেখছিলাম আর একবার। অন্ধের মতো, নির্বোধের মতো লিখেছে, তাই ওর প্রত্যেকটির লাইন এমন জোরালো, এমন বিস্ফোরণের মতো। ওর শব্দ সম্বন্ধে কোনওই জ্ঞান নেই। শব্দ নিয়ে ভাবেনা, তাই ওর প্রতিটি শব্দঅব্যর্থ। ওর চোখ ওর মাথার চারপাশে ঘোরে, যে-কোনও একটা জিনিসওকেহঠাৎ আকর্ষণ করে। আকর্ষণ? না, পরীক্ষিৎ আকর্ষণ কথাটা ব্যবহার করত না। ও বলত, ডাক দেয়। ওর ভাব খুব কম। মেয়েরাও ওকে ডাকে, ফুলও ডাকে, ভালবাসাও ডাকে। অবিনাশ লিখত, এ্যাচকা টান মেরে। ভালবাসারহ্যাচকা টানে ঢুকে গেলাম গর্তে, মৃত্যু বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পরিবর্তে, পেলাম আধঘণ্টা ক্লান্তি। অবিনাশের সেই বিখ্যাত পদ্য যা কলেজের ছেলেরা এক সময় খুব আওড়াত। পরীক্ষিৎকে চ্যালেঞ্জ করে অবিনাশ এক সময় গুটি আষ্টেক কবিতা লিখেছিল, প্রত্যেকটি বিখ্যাত হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিল। গল্পও লিখেছিল গোটা কয়েক, তা নিয়ে হই হই কাণ্ড। কী বিকট, কী অশ্লীল, সেইসব লেখা, এই রব উঠল সাহিত্যের বাজারে। অবিনাশ বলেছিল তখন, একটা উপন্যাস লিখে দেশটা কাপিয়ে দেব, বারোটা বাজিয়ে দেব সাহিত্যের। বোধহয় দুতিন পাতা লিখেছিলও, তারপরহঠাৎ একদিন সকালবেলা পরীক্ষিৎকে গিয়ে বলল, ভাই, মাফ কর, ও-সব আমার দ্বারা হবে না, বড় ঝামেলা। আমি শান্তিতে পুরোপুরি রকম বাঁচতে চাই। কদিন ধরে উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে এমন মজে গেছি যে, কাল সন্ধেবেলায় রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে আমার উত্তেজনা হল না, এ কী? নিজের জীবনটা নষ্ট করে গল্পের নায়ক-নায়িকাকে বাঁচিয়ে তোলা আমার দ্বারা হবে না। নিজের জীবনের এমন চমৎকার সময়গুলো নষ্ট করে, খামোকা গল্প-উপন্যাস লিখে লাভ কী? আমি ভাই ভালভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই। সাহিত্য-ফাহিত্য করে যত বোকার দল। পরীক্ষিৎ বলেছিল, মেরে তোর দাঁত খুলে নেব। জানোয়ার নাকি তুই যে, খালি খাব আর –।

অবিনাশ জানে, নির্বোধ ছাড়া কেউ অমরত্বের কথা ভাবেনা। যত দিন বাঁচা সম্ভব, যে-রকম ইচ্ছে বাঁচব, লিখে বা না লিখে। পরীক্ষিৎকে চিনতে ভুল হয় না ওই রকম মদ খাওয়া, পাগলামি, হই হই- পৃথিবীর বহু কবির জীবনীতে এ-সব দেখা গেছে। পরীক্ষিৎকে দেখলেই মনে পড়ে আমার হফম্যানের সেই গল্পের নায়কের কথা, যে নিজের ছায়াটাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পরীক্ষিৎ সাহিত্য করার জন্য ওর ছায়াটা বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু অবিনাশকে চেনা যায় না। তবে আত্মাটা বিশাল অবিনাশের, বিমলেন্দু ছাড়া ও-রকম ক্ষমতাবান লেখক আমাদের মধ্যে কেউ নেই, আমার মনে হয়। বিমলেন্দু না তাপস? পরীক্ষিত্রা বলে, তাপসই সত্যিকারের জাত লেখক, বিমলটা কমার্শিয়াল। আমার তাপসের লেখা ভাল লাগে না। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু কিন্তু ওর ওই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা, কবিত্বহীনতা আমার সহ্য হয় না। তাপসকে আমি বিশ্বাস করি, ও লেখে, না কলম দিয়ে থুতু ছেটায়, আমি বুঝতে পারি না। মানুষ হিসেবেও তাপস অবিশ্বাসযোগ্য।

বিমলেন্দুকে ওরা পছন্দ করে না, কারণ ও ছন্নছাড়া, ওর মুখ দিয়ে শিল্প সম্বন্ধে কোনও কথা বেরোয় না। আসলে বিমলেন্দু সব চেয়ে নতুন কথা লেখে। একথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে ওসব মদ খাওয়া কিংবা হই-হুল্লোড়ের কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষের মধ্যেও যেমন একদল মদ খায় না, একদল খেতে ভালবাসে, লেখকদের মধ্যেও তাই। আলাদা আর কোনও জাত-বিচার নেই। আমিও তো মদ-টদ খেতে ভালবাসি না, বিমলেন্দু তো একেবারেই খায় না। ওর সঙ্গে আমার আলাপ অদ্ভুত ভাবে। ও তখন অরুণোদয় কাগজেসহ সম্পাদকের চাকরি করে। হস্টেলে থাকি, আমি তখন কবিতা লিখতাম না। ওর কাগজে একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম, গল্পটা এক জন মুমূর্ষ কবিকে নিয়ে। সেই গল্পের মধ্যে সেই কবির রচনা হিসেবে কয়েক লাইন কবিতাও ছিল। হঠাৎ এক দিন বিমলেন্দু দেখা করতে এল হস্টেলে, জিজ্ঞেস করল, অনিমেষ মিত্র কার নাম? আমরা তখন কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলছিলাম। পরীক্ষিৎ বলল ফিসফিস করে, ওই ভদ্রলোক বিমলেন্দু মুখার্জি। পরীক্ষিৎ তখন বিমলেন্দুকে খুব ঈর্ষা করে।

কবি বিমলেন্দু মুখার্জি আমাকে খুঁজছেন? আমি প্রায় শিউরে উঠেছিলাম। বিমলেন্দু তখন থেকেই বেশ নাম করা। তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম। ধুতির সঙ্গে ফুলশার্ট পরা, ফর্সা, শান্ত ধরনের চেহারা, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয়, খুব আত্মবিশ্বাস আছে। বিমলেন্দুকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভাল লেগেছিল। ও মেয়ে হলে বলা যেত, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। পরীক্ষিতের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল বিমলেন্দু। বেশি ভূমিকা করল না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে টানতে টানতে বলল, আপনি অরুণোদয়ে যে-গল্পটা পাঠিয়েছেন, সেটা ভাল হয়নি।

আমি অবাক। গল্প ভাল হলেও পাত্তা পাওয়া যায় না, আর খারাপ গল্পের জন্য সম্পাদক বাড়ি বয়ে এসেছে সমালোচনা করতে? আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। পরীক্ষিৎ এক কোণে দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াবার ভান করছিল। হঠাৎ বলল, আমি পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি বলছি, গল্পটা ভালই, আমি ওটা পড়েছি।

মোটেই না, ওটা যাচ্ছেতাই হয়েছে, বিমলেন্দু বলল, ওটা গল্পই হয়নি, গল্প।

পরীক্ষিৎ প্রায় মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল।

তবে, ওর মধ্যে যে ছোট্ট কবিতাটা আছে, সেটা আমি আলাদা কবিতা হিসাবে ছাপাতে চাই। বিমলেন্দু বলল, কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, এত ভাল কবিতা পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি ছাড়া অন্য কারুর লেখা ইদানীং পড়িনি।

বুঝলাম, আসলে পরীক্ষিতের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এসেছিল বিমলেন্দু। আমাকে ছেড়ে ও তখন পরীক্ষিতেরসঙ্গেই কথা বলতে লাগল। তবুবিমলেন্দুকে সেই প্রথম দিনই আমার ভাল লেগেছিল।

শনিবার। আজ হাটে হরিণের মাংস উঠেছিল হঠাৎ, রণছোড়কে দিয়ে খানিকটা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাজারের সব দোকান ঘুরে জাফরান কিনতে ইচ্ছা হল। নেই। মধ্যপ্রদেশের এই শহরগুলিতে জাফরান মেলে না। ঘি আর রসুন হাজার দিলেও জাফরান ছাড়া হরিণের মাংস জমে না। গায়ত্রী আবার হরিণের মাংস রান্না করতে জানে কিনা, কে জানে! ওর বাবা ছিলেন কাশীর সংস্কৃত অধ্যাপক। কী জানি, হরিণের মাংস খেতেন কি না। আমার বাবা রাকা মাইনসে অনেক দিন ছিলেন, হরিণের মাংস খেতে বড় ভালবাসতেন। হাজারিবাগ গেলেই কিনে আনতেন। লালচে রঙের পচানো হরিণের মাংসের গরম ঝোল রাত্রে বসে খেতাম ছেলেবেলায়, স্পষ্ট মনে পড়ে।

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে –জীবনানন্দের এই লাইনটা হঠাৎ অকারণেই মনে পড়ল। হরিণের মাংস খাব ভাবতে ভাবতে এ কী একটা উলটো রকমের কবিতার লাইন মনে পড়ল। বিষম গোলমেলে এই লাইনটা তারপর আধঘণ্টা আমার মাথা জুড়ে রইল। আমি হরিণটাকে খাব, না হরিণটা আমাকে খাবে? আমি হরিণের মাংস খাব আর হরিণটা আমাকে খাবে? আমি হরিণের মাংস খাব আর হরিণটা খাবে আমার হৃদয়। কী স্পষ্ট সেই ছবি। আমি রান্নার তারিফ করতে করতে আরামে চিবিয়ে চুষেহরিণের মাংস খাচ্ছি, আরহরিণটা খুব গোপনে আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যদিও আমি শিকারী নই, তবু ভেবে আমার বুক শিউরে উঠল। অসম্ভব। দরকার নেই

আমার হরিণ। হরিণ! কথাটা ভেবে একটু হাসিও পাচ্ছে যদিও। এসব ভাবলে তো কোনও মাংসই খাওয়া যায় না। যখন মুরগির মাংস খাই, তখন মরার আগে সেই মুরগিও কী আমাদের হৃদয়ের একটা অংশ খেয়ে যায় না? এসব ভেবেকি আমি গান্ধীবাদী নিরামিষাশী হয়ে যাবনাকি? তা নয়, কবিতার মধ্যে আছে বলেই এ ব্যাপারটা এত মর্মান্তিক লাগছে। শিল্পের সত্য বড় ভয়াবহ। আজ অন্তত হরিণের মাংস খেতে পারব না। খালি একটা হরিণের জ্যান্ত চেহারা আর ছলছলে চোখের কথা মনে পড়ছে। হে ঈশ্বর, আজ যদি গায়ত্রী রাগ করে বলে, হরিণ-টরিণের মাংস আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না, তবে খুব ভাল হয়। আমিও তাহলে একটু রাগ করে রঘুনন্দনের বউকে অনায়াসে ওটা দিয়ে দিতে পারি। হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে...। রঘুনন্দনের বউয়ের হৃদয় নেই। ও যখন বাসন মাজে উঠোনে বসে, ওর সম্পূর্ণ বুক আলগা থাকে। ঘুরতে ফিরতে আমার চোখে পড়ে, ওর কোনও হুঁশ নেই। বুকের নিচে যে-স্ত্রীলোকের হৃদয় থাকে, সে কখনও অপর পুরুষের সামনে অবহেলা ভরে নিজের বুক খুলে রাখে না। স্ত্রীলোকর হৃদয় গোপন রাখার জন্যই বুক গোপন রাখতে হয়। আসলে ও নিজের বুকের ওই দুই চূড়ার মানে জানে না। ভাবে বুঝি কাচ্চা বাচ্চার জন্য দু'খানা দুধ জমাবার ঘটি। গায়ত্রীরও একটা খারাপ অভ্যেস আছে, রাত্রে শোবার আগে বডিস পরে দুই বগলে স্নো মাখে। মুখে, গালে, বুকে মাখতে পারে, কিন্তু বগলে কেন? গোড়ার দিকে খাটে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে ওগুলো দেখতে আমার খুব লোভীর মতো ভাল লাগত, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতাম। এখন চোখ জিনিসটাকে মনে হয় শরীর থেকে আলাদা। শরীর এক জিনিস চায়, চোখ তা চায় না। গায়ত্রীর শরীর আমার শরীরকে চুম্বকের মতো টানে, অথচ চোখ তখনও চায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে, অথচ –।

না, আলো নিভিও না।

হ্যাঁ, এখন ওঠো, কাল আবার ভোরে উঠতে হবে না?

না, আর একটু বসি, তুমি শোও।

কিছু তো লিখছ না, শুধু শুধু তো বসে আছ। তার চে ।

না, লেখা নয়, আমার বসে থাকতেই ভাল লাগে এ-রকম। আজ আমার খুব মন খারাপ লাগছে।

কেন?

গায়ত্রী আমার কাছে এসে দাঁড়াল। এবার ও কাঁধে হাত রাখবে আর তার পরেই কান ধরে টানতে আরম্ভ করবে। এই ওর এক অদ্ভুত আদর। কান টানা। আমি যে ওর পূজনীয় পতিদেবতা, ওর খেয়াল থাকে না। দুই কান ধরে এত জোরে টানে যে, আমার কান জ্বালা করে। আমি রাগ করে ওর নাকটা ধরে টেনে দিই। কিন্তু ওর ফর্সা মুখে নাকটা এত লাল হয়ে ওঠে যে, আমার মায়া হয়।

গায়ত্রী আমাকে একা রেখে দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেল। আজ আমার মন খারাপ লাগছে একথাটা হঠাৎ বললাম গায়ত্রীকে, কিছু না ভেবে। নিজের স্ত্রীর কাছে, আজ আমার শরীর খারাপ লাগছে, বলার চেয়ে, মন খারাপ লাগছে, একথাটা বলা অত্যন্ত নিরাপদ। শরীর খারাপ লাগছে, শুনলেই কী-রকম লাগছে, কোথায় শরীরের উপসর্গ কী কী, ওষুধ এ-রকম হাজার কথা। কিন্তু মন খারাপ লাগছে বললে অন্তত সভ্য স্ত্রীলোকেরা আর সে সম্পর্কে বেশি প্রশ্ন করে না। আসলে আমার শরীর খারাপ লাগছে না মন খারাপ লাগছে, আমি জানি না। এ সম্পর্কে তাপসের থিয়োরি ভারি চমৎকার। তাপস বলে, শরীর খারাপআর মন খারাপ, এর সীমারেখাটা কোথায় একথাকজন বোঝ? আমার তো সন্ধের দিকে যদি বিষম মন খারাপ লাগে, যদি মনে হয় হেরে গেছি, পৃথিবীতে আমি একা-তাহলেই বুঝতে পারি, দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তখন দুখানা কচুরি, খানিকটা তরকারিফাউআরচার পয়সার দই খেলেই বিষম চাঙ্গা লাগে। আবার মনে হয়, বিশ্ববিজয়ী। নিজেকে যখন ব্যর্থ প্রেমিক মনে হবে, তখন বুঝবি জুতোর পেরেক উঠেছে, হাঁটবার সময় পায়ে ফুটছে, কিন্তু টের পাচ্ছিস না। জীবনে কিছুই করা হল না এই ধরনের উটকো মন খারাপ হলে বুঝবি, নিশ্চিত হজমের গণ্ডগোল হয়েছে। তাপসের এ কথাগুলো

যে সম্পূর্ণ আজগুবিনয়, তা আমি মানি। তবু ধরনের গদ্যময় কথা পুরো মানতেও ইচ্ছে করে না। অবিনাশের কতগুলো নিজস্ব কথা আছে। অবিনাশের একটা প্রিয় কথা হল, প্রায়ই বলে রেগে গেলে, যাঃ শালা, শ্মশানের পাশে বসে ব্যবসা কর! এ-কথাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি বহু দিন। এখনও হয়তো অবিনাশকী-ভাবে বলে, আমি জানি না। তবে বছর পাঁচেক আগে আমরা দলবল মিলে শ্মশানে বেড়াতে যেতাম। পাঁচ রকম লোককে দেখতেও ভাল লাগে, তাছাড়া বড় কারণ এই, যখন মদ খাবার জন্য জায়গার অভাব হত, তখন বোতল কিনে নিয়ে শ্মশানে চলে যেতুম। ওখানে, আশ্চর্য্য, কোনও বাধানিষধে নেই। গঙ্গার পাড়ে বা শ্মশান-বন্ধুদের ঘরে বসে খেতুম, কেউ দেখলেও গ্রাহ্য করত না, এমন স্বাভাবিক।

গগনেন্দ্র, পরীক্ষিৎ, শেখর, অরুণ ওরা আবার সাধুদের দলে বসে গাঁজা খেত। বাঃ, বিনে পয়সায় কী ফাসক্লাস নেশা, এই বলে গগনেন্দ্র ট্রপিক্যালের প্যান্টপরা অবস্থাতেই ধুলোর ওপর বসে পড়ত। অয়েল পেইন্টিং? চলবে? চলুক না এক রাউন্ড। এই বলে গগনেন্দ্র তেলেভাজাওয়ালাকে ডেকে মাঠসুদ্ধ লোককে খাওয়াত। অম্লানটা ছেলেমানুষ, মাঝে মাঝে কাঁদত গোপনে। একটা মড়া পোড়ানো শেষ হয়ে গেছে, মৃতের জ্যেষ্ঠ সন্তান একটা মাটির খুরিতে করে শেষ অস্থিটুকু কাদামাটি চাপা দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছে। আমি চুপিচুপি অম্লানকে বললাম, আচ্ছা মানুষের সব পুড়ে যায়, ওটা কি পোড়ে না রে? কপাল না নাভি? ওটা কি স্টোন দিয়ে তৈরি? অম্লান বলল, শোন–। তারপর আর কিছু বলে না। আমি দেখলাম অন্নানের চোখে জল চিকচিক করছে। বলল, আমার বাবাকে পোড়াবার পর ওটা পাইনি, জানিস।

কোনটা?

ওই যে ওই অস্থি। আমি তখন অন্য পাশে বসে ছিলাম, হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ডোমটা বাঁশ দিয়ে অস্থি খোঁজাখুঁজি করছে। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছেনা। তখন রাত তিনটে চিতা প্রায় নিভে এসেছে, এখানে সেখানে একটু আগুন। ডোমটা খুঁজছে তো খুঁজছেই। বলল, অস্থি-র আগুন দেখলেই চেনা যায়, অস্থিরওপরে লাল রঙের আগুন জ্বলে, একটু ঠাহর করলেই

দেখতে পাবেন। আমার তখন, জানিস অনিমেষ, বিষম পায়খানা পেয়েছিল, থাকতে পারছিলাম না। ও-রকম মারাত্মক পায়খানা আমার সারা জীবনে পায়নি। আমি ভাবছিলাম, কোনও রকমে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে ওকাজটা সেরে নেব, কারণ ও-রকম সময়, বাবার শেষচিহ্নটা খোঁজা হচ্ছে আর আমি বলব, আমার পায়খানা পেয়েছে। ভেবে দেখ, এ অসম্ভব। কিন্তু ডোমটা বহু খুঁজেও অস্থিটা পাচ্ছে না, অথচ অস্থি পুড়ে যেতেও পারে না। আমি আর থাকতে না পেরে, এই যে পেয়েছি, বলেই একটুকরো কাঠকয়লা তুলে মাটি চাপা দিয়ে ছুটে গঙ্গায় চলে গেলাম। অনিমেষ জানিস, আমার বাবার আসল অস্থি বোধহয় শেষ পর্যন্ত কুকুর-বেড়াল খেয়েছে। এই বলে অম্লান হঠাৎ রুমাল বার করে চোখ মুছতে লাগল। ওর এই গল্পটার সঙ্গে কান্নার কী সম্পর্ক আছে ভেবে আমি তো হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলাম। হায়, হায়, আমি যে আগাগোড়াই গল্পটা হাসির গল্প ভেবে মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছিলাম। পায়খানা পাবার গল্প আবারগন্নারহয় নাকি? সেইদিনইঅবশ্য বুঝতে পেরেছি, অম্লান কমার্শিয়াল সাকসেসফুল লেখক হবে। কারণ, ও এখনও জানে যে, শ্মশানে এলে দুঃখিত হতে হয়। অম্লান ইতিমধ্যেই পাঁচখানা উপন্যাসের প্রণেতা।

অবিনাশ এক দিন একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। শ্মশানে। সেদিনও আমরা একটা গাঁজার দলে বসে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ আর শেখর হু-হু করে লম্বা টান মেরে বুকের মধ্যে ধোঁয়া আটকে রাখছে। তারপর পাঁচ মিনিট বাদে দুই নাকের ফুটো দিয়ে মোষের শিঙয়ের মতো সেই ধোঁয়া বার করেছে। আমি দু-একবার টেনেই কাশতে লাগলাম। আমি রাউন্ড থেকে সরে বসলাম। অবিনাশও এ-সবে নেশা পায় না। ও একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে আর তাপসকে ডেকে বলল, চল, একটু ঘুরে আসি। খানিকটা হেঁটে পাটগুদামের পাশ দিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, বাংলা আছে?

বাংলা পান?

না, ছিপি-আটা।

সাড়ে তিন টাকা পাঁইট লাগবে।

এক নম্বর তো? তিনটে ভাঁড় দিও।

আমি অল্প অল্প নিচ্ছিলাম, বাংলা আমার সহ্য হয় না, অবিনাশ ঢক ঢক করে খেতে লাগল, তাপস খুব গম্ভীর। তাপসের বিখ্যাত অন্য মনস্কতা। মাঝে মাঝে ওর হয়, তখন ও উৎকট রকমের চুপ করে থাকে। হিউমার শুনলে হাসে না, তখন বোধহয় কোনও লেখার কথা ভাবে। অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, তোর নভেলটা শেষ হয়েছে তাপস? তাপস ঘাড় নেড়ে জানাল, না। অবিনাশ অপর দিকে ফিরে বলল, ও-সব গাঁজা-ফাঁজা টানতে আমার ভাল লাগে না, বঝলেন? ওই পরীক্ষিা টানছে কেন জানেন? কবিতার মশলা খুঁজছে। গাঁজায় নাকি নানা রকমের ইমেজ দেখা যায়। এই ভিখিরির মতো ইমেজ খোঁজা কেন?

আপনার এ-কথা বলা মানায় না, অবিনাশ। আমি বললাম।

কেন?

আপনি তো লেখেন না। আপনার ইমেজের দরকার কী?

ওঃ! অবিনাশ একটু বিব্রত হল। অরুণও তো লেখে না। জীবনে কখনও লেখেনি। ও খায় কেন? আসলে স্বপ্ন দেখার নেশা, দুঃস্বপ্ন দেখার নেশা, স্মৃতি নিয়ে নড়াচাড়া করার নেশা থাকে অনেকের।

আপনার নেই?

না, আমি আর ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চাই না।

আমি হেসে উঠলাম। এ বাসনা আপনার কত দিনের?

আমি তো সরল জীবনই কাটাচ্ছি। কী রে তাপস?

হয়তো। তাপস বলল।

একটা লম্বা চুমুকে বাকিটা শেষ করে অবিনাশ বলল, আমি কলকাতার বাইরে একটা চাকরি খুঁজছি। তাছাড়া আমি যে লিখি না, তা নয়, আমি একটা বড় গল্প লিখেছি।

তাপস সচকিত হয়ে বলল, করে?

আজ, একটু আগে। গঙ্গার পাড়ে রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে। সম্পূর্ণ গল্প, প্রায় পঞ্চাশ পাতার হবে। আশ্চর্য হু-হু করে যেন ট্রেনের মতো গল্পটা আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। এই দেখাটাই তো যথেষ্ট। লিখে আর কী লাভ পাছে ভুলে যাই, তাই মদ খেয়ে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম।

ভাগ শালা, চালাকির আর জায়গা পাসনি!

বিশ্বাস কর, পুরো গল্পটা কয়েক নিমেষে দেখতে পেলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শ্মশানের পারে চলে এলাম। আবার সিগারেট আছে? নেই! অবিনাশ একটা দোকানে গিয়ে বলল, দেখি এক প্যাকেট সাদা বিড়ি!

লোকটা সিগারেট দিতে দিতে অকারণে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে?

কী?

আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে?

আমাদের মড়া? অবিনাশ গাঁ-গাঁ করে হেসে উঠল। আমাদের মড়া কোথায় রে, অ্যাঁ?

বুঝলাম অবিনাশের নেশা হয়েছে। অবিনাশ বলল, চল, আমাদের মড়া খুঁজে আসি।

আমরা শ্মশানের মধ্যে ঢুকলাম। চারটে চিতা জ্বলছে সমানে ধক ধক করে। অবিনাশ খুশি মনে বলল, আজ বাজার ভাল। গগন থাকলে বলত, আজ অনেক লোক পড়েছে। লোকনা টোক। জয় মা কালী বল, লোকে বলে বলবে পাগল হল।

আমরা শ্মশানবন্ধুদের জন্য পাথর বাঁধানো ঘরে ঢুকলাম। একদল লোকসদ্য পোড়ানো শেষ করে আলকাতরা দিয়ে মৃতের নাম লিখছিল দেওয়ালে –

বাবু শিবপ্রসাদ সাঁতরা
বয়স ৭২। মৃত্যু :সাতুই জানুয়ারি
রিটায়ার্ড চৌকিদার
গ্রাম : ঘোলা। পো :ইত্যাদি।

অবিনাশ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের লেখা দেখল। তারপর শেষ হলে, কাঁদো কাদো মুখে বলল, দাদা, একটু আলকাতরা দেবেন, আমাদের মড়ার নামটাও লিখব।

নিশ্চয়, নিশ্চয় লিন না। এক জন মুরুব্বি সহানুভূতির সঙ্গে দিল। অবিনাশ গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, সাদা পাথরের দেয়ালে–

বাবু অবিনাশ মিত্র। নিবাস জানা নাই।
জন্মকাল– জানা নাই। বয়স– জানা নাই
মৃত্যু তারিখ জানা নাই।

তাপস বলল, আরও লেখ, বাপের নাম জানা নাই।

আমি মুখ ফিরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অবিনাশকে এত সেন্টিমেন্টাল হতে আমি আগে দেখিনি।

.

শ্মশানের কথা মনে পড়লেই সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে।

সেই ইটালিয়ান ধরনের সুন্দরী পাগলিটার কথা। রোগা, তরুণী, রেনেসাঁস নাক, নীল চোখ। একটা হাফ শায়া আর লাল সাটিনের ব্লাউজ পরে নিবন্ত চিতার পাশে বসে আগুন পোহাত। মেয়েটা এতই রোগা যে, ওরশরীরেরস কতখানি আছে বোঝা যায় না, সেই জন্যেই বোধহয় রাতের বাঘ-ভাল্লুকেরা ওর দিকে তেমন নজর দেয়নি। কিন্তু অমন রূপসী আমি খুব কম দেখেছি অথবা শ্মশানে, নিভন্ত চিতার পাশে ছাড়া কোথাও বসতে দেখিনি। কোনও দিন শুনিনি ওর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বার করতে। গগনেন্দ্র বড় ভালবাসত মেয়েটাকে। সোয়েটারের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে গগনেন্দ্র সোজা তাকিয়ে থাকত মেয়েটার দিকে। আর বিড় বিড় করে বলত, হে শ্মশানের ঈশ্বর, ওই মেয়েটাকে অন্তত এক ঘন্টার জন্য আমাকে দাও। তাপস পাশে দাঁড়িয়ে হাসত, তখন গগনেন্দ্র বলত, যান না, দেখুন, অন্তত একবার, যত টাকা খরচ হোক।

নিভন্ত চিতার আশেপাশেও লোক থাকত। গেঁজেল, রিকশাওয়ালা, সাধু হয়ে যাওয়া সিফিলিসের রোগী, রাতকানা ভিখিরি। তাপস গিয়ে মেয়েটার পাশ ঘেঁষে বসে গাঁজারটান মারতে লাগল। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করতাম। মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নেই। দুই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মেয়েটা কাঠি দিয়ে ছাই নাড়ছে। এমন সময় হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে গেল। শীতকালের মারাত্মক অকালবৃষ্টি, আমরা তখনই ছুটে বসবার ঘরগুলোয় ঢুকে পড়লাম, সব চেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঝানু গাঁজাখোররা, যারা এক ফোঁটা জল শরীরে সহ্য করতে পারে না। মেয়েটা চুপ করে ভিজতে লাগল। কী অদ্ভুত ওর চুপ করে বসে থাকা। সেই রকম হাঁটু মুড়ে থুতনি ভর দিয়ে কাঠি দিয়ে ছাই খুঁটতে লাগল, লাল সাটিনের ব্লাউজ আর হাফ শায়া, সেই মেয়েটা, নীল ঝকঝকে চোখ, এখনও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পাই। তাপস বলল, না, পারলাম না, মাপ করুন, মেয়েটার অসম্ভব দাম্ভিকতাকে ছুঁতে পারলাম না। আমার বন্ধুদের অনেক রকম এলেম ছিল, কিন্তু একটা পাগল মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করার ভাষা কারোর জানা ছিল না। গগনেন্দ্র বলল, কে কে মল্লিকার কাছে যাবেন চলুন, আমি এই মেয়েটার মুখ মনে করে মল্লিকার কাছে যাব।

.

আমি কলকাতা ছেড়েছি চার বছর। জানি না, ওরা এখনও শ্মশানে বেড়াতে যায় কিনা। গগনেন্দ্র চাকরি করে বম্বেতে, অরুণ বিলেতে গেছে। আমি ক্লান্ত হয়ে জব্বলপুরে রাত্রে বসে আছি। আমার মন খারাপ লাগছে। মন খারাপ না শরীর খারাপ, জানি না। গায়ত্রী বোধহয় খুব সুন্দর দেখতে। অন্তত আমার তো মনে হয়। অবশ্য বউয়ের রূপ সম্বন্ধে স্বামীদের মন্তব্য গ্রাহ্য হয় না। পরীক্ষিৎ আমাকে বলেছিল, বউ বেশি সুন্দরী হওয়া ভাল নয়। পাগল পরীক্ষিৎক্টা কি আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে, যে বউয়ের রূপে ভুলে থাকব? বা কেরানিবাবুদের মতে, বউয়ের দিকে কে কুনজর দিল সেই নিয়ে। আচ্ছা, গায়ত্রী বোধহয় কখনও ভালবাসা পায়নি, তাই আমাকে এতটা অবলম্বন করতে চায়। ও আমাকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। ওর শরীরে খিদে একটু বেশি, নবীন যুবতীর কামুকতা যে এমন ভয়ঙ্কর আমার জানা ছিল না, আমার বন্ধুদের মতো মেয়েদের সম্পর্কে আমার বেশি অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু মনে হয়, গায়ত্রী বোধহয় আমাকে পেয়ে খুশিই হয়েছে। একটা মেয়েকে খুশি করা কম নয়, বহু কবিতা লেখার চেয়ে বড়।

শ্মশানের পাগলিটার চেয়েও বোধহয় গায়ত্রী রূপসী। সেই মেয়েটাকে এই বিছানায় মানাত না। গায়ত্রীকে এই খাটে কী চমৎকার মানিয়েছে, ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার বইয়ের ছবির মতো। আমি ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে গিয়েও হাত তুলে নিলাম। তুমি আর একটু ঘুমোও গায়ত্রী। আমি ইতিমধ্যে দাড়িটা কামিয়ে নিই। কাল ভোরবেলা বেরুতে হবে, তখন দাড়ি কামানো যাবে না। তাছাড়া, রাত্রে দাড়ি কামাতে ভালই লাগে। একটু গরম জল পেলে ভাল হত। যাক। আমি সেফটি রেজার, ব্রাশ, সাবান খুঁজতে লাগলাম।

এ কী গায়ত্রী, তুমি উঠে এলে কেন?

আমি তো জেগেই ছিলাম।

না, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, পরে তোমাকে জাগাব।

যাঃ, দাঁড়াও, আমি গরম জল করে আনি।

গায়ত্রী আমার গালে ওর গালটা ঘষে দিয়ে বলল, কী খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাবাঃ।

অবিনাশের চিঠিটা রাখলাম, দাড়ি কামিয়ে সাবান মুছবার জন্য। এখন রাত ঠিক বারোটা, মাইকা মাইনস-এর সাইরেন বেজে উঠল। একটা মুরগিও ডেকে উঠল প্রচণ্ড আওয়াজে। মুরগিরা কি রাত্রে ডাকে? কখনও শুনিনি বা লক্ষ্য করিনি। ভোরবেলা দেখেছি, একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সূর্যকে ডাকে। পৃথিবীর লোককে সূর্য ওঠার খবর জানাবার ভার মুরগিগুলোর ওপর কে দিয়েছে, কী জানি! যে-মুরগিটা এইমাত্র জেগে উঠল সেটা বোধহয় চাঁদের খবর জানাতে চায়। ওই মুরগিটা বোধহয় মুরগি সমাজের মধ্যে বিদ্রোহী আধুনিক, সূর্যের বদলে চাঁদ কিংবা অন্ধকার ঘোষণা করতে চায়। ভেবেই আমার হাসি পেল। ওই মুরগিটা বেছে নিয়ে কাল রোস্ট খেলে কেমন হয়?

এ কী, এর মধ্যে গরম জল হয়ে গেল?

দাঁড়াও, তুমি চুপ করে বোসো, আমি তোমার দাড়ি কামিয়ে দিই।

তা হয় না, পাগল নাকি?

বাঃ, কেন হবে না?

সেফটি রেজার দিয়ে অপরে কামাতে পারে না। পারবে না, পারবে না, আমার উঁচু-নিচু গাল কেটে যাবে। তোমাদের অমন নরম তুলতুলে গাল হলে কাটা যেত অনায়াসে। তুমি বরং গালে সাবান মাখিয়ে দাও।

রাত্তিরবেলা গরম জলে ব্রাশ ডুবিয়ে গালে সাবান মাখতে সত্যিই বেশ আরাম লাগে। গায়ত্রী আমার দুপায়ের ফাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব যত্ন করে সাবান ঘষতে লাগল। আমি

চেয়ারে বসে এক হাতে ওর কোমর ধরে। এই অসভ্যতা করবে না! বলেই গায়ত্রী আমার চোখে সাবান লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আমাকে দুহাতে চোখ ঢাকতে হল। গায়ত্রী হেসে দূরে সরে গেল। আমি ওকে উঠে ধরতে গিয়ে পারলাম না। দাড়ি কামাতে গিয়ে আমার থুতনিটা খানিকটা কেটে গেল।

অন্তত বারো বছর ধরে তো দাড়ি কামাচ্ছ, এখনও শিখলে না, আনাড়ি! গায়ত্রী হাসতে হাসতে বলল।

তোমাদের তো এটা শিখতে হয় না, জানবে কী করে কী বিরক্তিকর কাজ।

আমি সেফটি রেজার দিয়ে কাটতে জানি। তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিও, আমার একটু লাগবে।

তুমি কী করবে?

আমার দরকার আছে।

ওঃ, আচ্ছা, তোমারটা আমি কেটে দিচ্ছি।

না, আমিই পারব।

হাতের নিচের চুল কাটবে তো? বাঁ-হাতেরটা তুমি পারলেও, ডান হাতের নিচে পারবে কী করে?

খুব পারব, বাঁ-হাত দিয়ে।

না, এসো না লক্ষ্মী, দেখো আমি কী সুন্দর করে দিচ্ছি।

গায়ত্রীকে ধরে এনে দাঁড় করালাম। ও ভিনাস ডি মেলোর ভঙ্গিতে দু'হাত উঁচু করে দাঁড়াল। আমি সাবান মাখিয়ে খুব যত্ন করে সাবধানে ওকে কামিয়ে দিলাম।

লাগছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হুঁ, খুব দুষ্টুমি করে গায়ত্রী।

আমার শেখরের কথা মনে পড়ল। শেখর হস্টেলে থাকতে সাবান খেত। নতুন চকচকে সাবানের কেক দেখলে শেখর লোভীর মতো এক কামড়ে আধখানা খেয়ে ফেলত কচ কচ করে, আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। শেখরের মতো অভ্যেস যদি থাকত, তবে আমি গায়ত্রীর বগলের সাবান ধুয়ে না দিয়ে চেটে নিতাম। তার বদলে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়ে আমি ওর বুকে মুখ গুঁজলাম।

গায়ত্রী, আমার বিষম ইচ্ছে করে শিশুর মতো স্তন্যপান করতে। তোমার বুকে দুধ নেই কেন?

বাঃ, তুমি যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম বলতে, আমার বুকে অমৃত আছে। আমরা দুজনে হো-হো। করে হেসে উঠলাম।

তুমি বুঝি তখন আমার কথা বিশ্বাস করতে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তুমিই বুঝি বিশ্বাস করে বলতে? গায়ত্রী বলল, ও-সব বিয়ের পর কিছুদিন বলতে হয়, শুনতেও ভাল লাগে।

না সত্যিই, বুকের দুধ খেতে আমার বিষম ইচ্ছে করে।

আচ্ছা, আমার একটা ছেলে হোক, তখন খেও।

কবে তোমার ছেলে হবে?

বাঃ, তার আমি কী জানি! সেটা কি আমার হাত। ও-সব আজেবাজে ব্যবহার করতে কেন?

ও-সব জানি না, করে তোমার একটা ছেলে হবে বলো না?

বাঃ রে, সেটা তো তুমিই জানো।

সন্তান বুঝি বাবার, মায়ের নয়?

বাবা না দিলে মায়ের কী করে হবে?

ও-সব বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা। তোমার পেটের মধ্যে জন্মাবে, তোমার রক্ত শুষে বড় হবে, তোমার শরীর ছুঁড়ে বেরুবে, আর তার জন্য দায়ী হব আমি। সারা দিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব কি বিদেশে থাকব– ও-সব বাজে কথা, সন্তান আসলে মেয়েদেরই হয়। তুমি আমাকে একটা ছেলে দাও গায়ত্রী। গায়ত্রী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে একটা ছেলে দেব?

হ্যাঁ।

আচ্ছা দেব, আর আট মাস বাদে।

তার মানে? আমি গায়ত্রীকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

শত্তুর আমার পেটে এসে গেছে।

সত্যি, তুমি জানো?

হ্যাঁ, জানি, মেয়েদের ও-সব জানতে ভুল হয় না।

গায়ত্রী, গায়ত্রী, গায়ত্রী! আমি ওকে দু’ হাতে তুলে একটা ঘুরপাক খেলাম।

আঃ, ছাড়ো ছাড়ো–

না না না, তুমি সত্যি বলছ? বুঝতে তোমার ভুল হয়নি তো? আমাকে ঠকাচ্ছ না?

না গো, ঠকাচ্ছিনা, সত্যিই।

গায়ত্রী! উঃ, গায়ত্রী, আমার এত আনন্দ হচ্ছে– ।

ছাড়ো, লাগছে। ছেলের জন্য তোমার এত কাঙালপনা কেন?

এত দিনে আমি পূর্ণ মানুষ হলাম। আমি গৃহস্থ, আমি পদস্থ চাকুরে, আমি সন্তানের পিতা। আমি কোথা থেকে জীবন শুরু করেছিলাম তুমি জানো? না, জানো না। আমার বাবা নেই, মা নেই, একটাও আত্মীয়ের মুখ আজ মনে পড়ে না। তেরো বছর বয়স থেকেই আমি একা। বাবার এক বড়লোক বন্ধু দয়া করে আমাকে মানুষ করেছেন। কলেজে যখন থার্ড ইয়ারে পড়তাম, সেই সময় হঠাৎ তিনিও মারা গেলেন। তখন থেকে বিজ্ঞাপনের এজেন্ট সেজে, প্রুফ দেখে, তিনবেলা টুইশনি করেহস্টেলে থেকেছি। এই জন্যই তাপস পরীক্ষিৎদের মতো বাউণ্ডুলে হয়ে যাইনি। আমার ঘর-সংসার ছিল না, তাই ঘর-সংসার পাতবার বিষম লোভ ছিল আমার। করে এক দিন সুস্থ, সাধারণ, দায়িত্বশীল মানুষ হব, সেই ছিল আমার বাসনা। ভাগ্যিস আমি তোমাকে পেয়েছিলাম।

হয়েছে, হয়েছে, এখন শোবে চলো। আমার ঘুম পেয়েছে সত্যি।

চলো, এখন থেকে খুব সাবধানে থেকো কিন্তু।

যদি বাচ্চা হবার সময় আমি মরে যাই?

পাগল নাকি? তোমার বয়েস তেইশ, এই তো বাচ্চা হবার ঠিক সময়।

খুব যন্ত্রণা হবে তখন, না?

তা হবে, যত যন্ত্রণা পাবে আমার শিশুর প্রতি তত ভালবাসা হবে।

সন্তান কিন্তু সম্পূর্ণ আমার, তুমি বলেছ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার। আমার সব কিছুই তো তোমার।

আবার পাগলামি করছ? তুমি না আধুনিক লেখক। আধুনিকরা এ-সব বলে নাকি?

ওঃ, হো-হো, তুমিও এ-সব জেনে গেছ!

চলো, শুয়ে পড়ি, আর না। দাঁড়াও, জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

কেন, জানলা খোলা থাক না! ঠাণ্ডা লাগবে?

ঠাণ্ডা না। চাঁদের আলো আমার চোখে পড়লে ঘুম আসে না।

ওঃ, আচ্ছা অন্ধকার করে দাও।

গায়ত্রী সব অন্ধকার করে দিল। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, আমার কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। এবং হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে –এই লাইনটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল। মাথা ধরার সঙ্গে এই লাইনটির কোনও যোগ আছে কিনা জানি না। অথবা এই দুটোই আলাদা ভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে এই আনন্দের সময়ে। আঃ, গায়ত্রী, তোমাকে আমি বিষম ভালবাসি।

তা বুঝি আমি জানি না? গায়ত্রী হাসির শব্দ করল।

অন্ধকারে ওর হাসি দেখা গেল না।

৫. তাপস

তাপস

সকালটা শুরু করলাম একটা মারাত্মক ভুল দিয়ে। রোদ্দুরকে পাশে রেখে শুয়েছিলাম, যতক্ষণ শুয়ে থাকা চলে। ক্রমশ রোদ্দুরগুলি.খুব স্বাধীন হয়ে সারা বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। তখন পায়ের ধাক্কায় অতি কষ্টে জানালাটা বন্ধ করতেই রামসদয়বাবু সহৃদয় গলায় আপত্তি জানালেন, সকালবেলা যতক্ষণ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় শুয়ে থাকুন তাপসবাবু, কিন্তু সকালের রোদ ও হাওয়া লাগানো উচিত। এর উত্তরে আমি বললাম, আপনার কাছে একটা খুচরো টাকা হবে? কাল সন্ধে থেকে আমি দশ টাকার নোটটা ভাঙাতে পারছি না।

রামসদয় কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন ও আসন্ন বাথরুমের প্রস্তুতির জন্য পেটে থাপ্পড় মারছিলেন। পরের আওয়াজটা কেমন হয়, সেই অনুযায়ী তার মেজাজ নির্ভর করে। মনে হচ্ছে, আজ মেজাজটা ভাল আছে। অত্যন্ত বিব্রত মুখে জানালেন, ইস তাই তো, আমার কাছেও যে দশ টাকার নোট সব। চাকরটাকে দিন না, ভাঙিয়ে দেবে। আমি জানি রামসদয় মিথ্যে বলে না, ওর কাছে সত্যিই দশ টাকার নোট। হয়তো অনেকগুলোই দশ টাকার নোট থাকা সম্ভব। কেন চালাকি করতে গেলাম, পুরো একটা দশ টাকার নোট চাইলেই চমৎকার হত। আর কি শুধরে নেবার সময় আছে? এখন কি ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলব, বুঝতেই তো পারছেন দাদা কথার কথা, পুরো দশটাই দিন। রামসদয় বাথরুমে ঢুকে পড়লেন, ওঁর প্রসন্ন মুখ দেখে বুঝলাম বেগ এসে গেছে। আজ রামসদয়ের মন ভাল ছিল, আজ দশ টাকা না চাওয়াটা চূড়ান্ত বোকামি হয়ে গেল। লোক ভাল রামসদয়, একমাত্র টাক ঢাকবার জন্য চুলগুলো সামনের দিকে টেনে আঁচড়ায়, এ ছাড়া ওর কোনও দোষ নেই। নিশ্চিত দিত। তার ওপর যদি বলতে পারতাম, কাল মায়ের চিঠি পেয়েছি (দীর্ঘশ্বাস) কিংবা বন্ধুর অসুখ, কুড়ি কী তিরিশ হয়ে যেতে পারত। ওঃ! সকালেই মোটা হরি শুনিয়ে গেছে, ঠাকুরের অসুখ, আজ সবাইকেইবাইরে খেতে হবে। তার মানে সারা

দিন আজ কুহেলিকা। দুপুরবেলাটা শুয়ে শুয়ে কাটাব ভেবেছিলাম। ইচ্ছে হল, মোটা হরির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।

স্ট্রিম লন্ড্রিতে কাচানো এক পেয়ার শার্ট-প্যান্ট ছিল, এইটুকুই যা সৌভাগ্য। পকেটের মধ্যে পয়সা থাকলে জামা কাপড় নোংরা থাকা মানায় না। তাহলে সত্যিই ভিখিরি মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সকাল ন'টা। সকালের চা-ও দেয়নি, এমন রাগ হচ্ছে যে, ইচ্ছে করছে, নাঃ, সকালবেলাতেই মুখ খারাপ করবনা। মুখে এখনও টুথপেস্টের বিচ্ছিরি স্বাদ লেগে আছে। পকেটে একটা নিঃসঙ্গ দশ নয়া পয়সা। এই দশ নয়া পয়সা নিয়ে পড়েছি মহা মুশকিল। কাল সন্ধে থেকে ভাবছি। এটাকে কোনও বাজেটে ফেলা যায় না। চায়ের কাপ দু'আনা। কলুটোলার মোড়ে ছ'পয়সায় পাওয়া যায়। কিন্তু এতদূর হেঁটে গিয়ে চা খেলে, সঙ্গে একটা টোস্ট না হলে –। সিগারেট কেনা যায়, কিন্তু সকালেই চা ছাড়া শুধু সিগারেট! চমৎকার হত, যদি এই দশ নয়া পয়সায় একটা পোচ, দুটো টোস্ট, এক কাপ ভাল চা ও সঙ্গে দুটো সিগারেট পাওয়া যেত। এইগুলো আমার বিষম দরকার এখন। এর একটাও হবে না। ইচ্ছে হল, পয়সাটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলি। কিংবা কোনও ভিখিরিকে দিয়ে দিই। হঠাৎ একটা মুচিকে দেখে জুতো পালিশ করিয়ে নিলাম দশ নয়াটা দিয়ে। ময়লা জুতোটা মানাচ্ছিল না। এবার শরীর ও মন বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। এখন অনায়াসে বিমলেন্দুর কাছে যাওয়া যায়। বিমলেন্দু সকালে কমার্স কলেজে পড়াচ্ছে। আর বিমলেন্দুর কাছেই যখন যাব, তখন ট্রামে যাওয়া যাক।

ট্রামটায় ভিড় ছিল না, জানলার কাছে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। কন্ডাকটরকে দেখে মাঝ পথে নেমে পড়া আমি মোটেই পছন্দ করি না। বসবার জায়গা পেয়ে বসে পড়া উচিত। সম্ভব হলে একটা বই খুলে পড়া। আমার কাছে বই ছিল না। কন্ডাকটবকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। খুব পছন্দসই লোকটি, বেশ অলস স্বভাবের, কারণ প্যান্টের সব ক'টা বোতাম আটকায়নি। নিশ্চয়ই কানে কম শোনে, কারণ লোকটার মুখে চোখে একটা এলোমেলো বোকামি আছে। অনেকটা ভবকেষ্টর মতো। ভবকেষ্টর মুখে অমন নিষ্পাপ বোকামির ছায়া কেন, তত দিনেও বুঝতে পারিনি, যত দিন না জানতে

পেরেছি ও বদ্ধ কালা। ভবকেষ্টর বউ মালতী ওর ইয়ার ব্যান্ডের কাজ করে, সেই জন্য মালতীর মুখেও বোকামির স্বর্গীয় আলোছায়া খেলে। অনেকক্ষণ পর কন্ডাকটর আমার কাছে এল। আমি বাঁ-দিকের ঘাড়টা আলতো ভাবে বেঁকিয়ে অন্য মনস্ক ভাবে নরম গলায় বললাম, দি মানচ্ছি। লোকটা চলে গেল। যাক, একবারেই সাকসেসফুল! এই অর্ধসত্যগুলোতে আমি খুব উপকার পাই। ঘাড় হেলানো দেখে লোকটা নিশ্চিত হয়েছিল, আমার উচ্চারণ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চলে গেল। দিচ্ছি ও মান্থলি এই দুটি শব্দের সন্ধি করে আমি এই শব্দটি সৃষ্টি করেছি। এবং বার বার উচ্চারণ করে রপ্ত করেছি ধাঁধখানি। দিচ্ছি ও মান্থলি, দিমানচ্ছি। কোনও ত্রুটি নেই। সেই সঙ্গে আছে ঘাড় হেলানো। লোকটার কান যদি ভাল হত তাহলে ও মুশকিলে পড়ত। বুঝতেই পারত না আমার কাছে কী আছে–মান্থলি, না টিকিট কাটব। ও কী জিজ্ঞেস করত, দেখান? নাদিন? দেখান বললে, ধমকে উঠতাম, দেখাব কী, দিচ্ছি বললাম তো! যদি লোকটা লজ্জার মাথা খেয়ে বলত, দিন। তাহলে বলতাম, দশ টাকার খুচরো আছে ভাই? তখন যদি বলত, না, দশ টাকার খুচরো নেই, আমি আর বাক্যব্যয় না করে চুপ করে বসে থাকতাম। যদি মরীয়া হয়ে লোকটা দৈবাৎ বলেই ফেলত, হ্যাঁ দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি, তবে ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করতাম, এই ট্রাম বেলগাছিয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই? না, গ্যালিফ? ওঃ গ্যালিফ, তাই বলল –এইটুকুই জানিয়ে লাফিয়ে উঠে ব্যস্তভাবে নেমে যেতাম। আমি টিকিট ফাঁকি দিচ্ছি না এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা করার মতো মুখ! বাপ-মা আমার জন্য টাকা-পয়সা, ভাড়াবাড়ি কিছুই রেখে যায়নি, শুধু দিয়ে গেছে ভদ্রলোকের মতো সুন্দর মুখখানি। এটাও মন্দ ক্যাপিটাল নয়, এতেও খুব অনেকটা কাজ হয়।

বিমলেন্দু ক্লাসে পড়াচ্ছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। তারপর কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে ডবল টোস্ট, পোচ আর চায়ের অর্ডার করে বসলাম। চা শেষ হবার পর বিমলেন্দু এল হন্তদন্ত হয়ে, হাতে কয়েকখানা বই, টাইপ করা নোট। কী রে কী ব্যাপার, আমার যে আজ বিষম চাপ, পর পর তিনটে ক্লাস।

গুলি মেরে দে।

না ভাই, আজ পারব না, আজ ছেড়ে দে।

দ্যাখ বিমল, আমি না হয় বিএ পাশ! আমার কাছে প্রফেসারি দেখাসনি।

আস্তে বল, ছেলেরা শুনতে পাবে।

ক্লাসের পর কী করবি?

ড. মহালনবিশের বাড়ি যেতে হবে একবার।

কেন, তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে?

ধ্যাৎ, ড. মহালনবিশ আমার রিসার্চ গাইড। আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাছাড়া ওর কোনও মেয়ে নেই। বিয়েই করেননি।

আজ সব ছেড়ে দে। আজ সারা দিন আমার কিছুই করার নেই। চল দুজনে মিলে একটা পার্টি অগানাইজ করি। অনেক দিন এক সঙ্গে বসা হয়নি।

আজ হবে না রে। আমার আজ উপায় নেই। তোরাই বেশ আছিস তাপস। চাকরি-বাকরি করতে হয় না, ইচ্ছেমতো দিন কাটাতে পারিস। আমাকে সব মিলে পাঁচটা চাকরি করতে হয়। আমার গলায় দড়ি বাঁধা, দড়ির বাইরে যেতে পারি না।

আচ্ছা, পাঁচটা টাকা ধার দে।

নেই। খুচরো পয়সা সম্বল।

পাঁচটা চাকরি করছিস, আর পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারবিনা? একমুঠো খোল মানিক।

সত্যি পারি না।

কত আছে?

বিমলেন্দু পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে গুনল। চোদ্দো আনা। আমি ওর থেকে সাত আনা নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোর ধারের সিগারেটের দোকান আছে?

আছে। চল।

আমাকে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে দে। আজ মেস বন্ধ। দুপুরে কোথায় খাব ঠিক নেই।

তুই আমার বাড়িতে আয়। দুপুরে আমার সঙ্গে খাবি।

দেখি।

ঘণ্টা পড়তে বিমলেন্দুকে ছেড়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ আবার ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই রিসার্চ করছিস, আগে তো শুনিনি। ডক্টরেট হয়ে তোর কি মুকুট হবে? ছি ছি।

ডক্টরেট হলে মুকুট হবে না, কিন্তু মাইনে বাড়বে। বিমলেন্দু শুকনো মুখে জানাল। আমি ওর মুখের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম, সত্যি সত্যি ওর গলায় দড়ির দাগ দেখা যায় কিনা!

শীত নেই, বেশ ঝরঝরে রোদ, ভিড় শুরু হয়েছে। রাস্তার দুই বিপরীত মুখেই জনস্রোত, দু'দিকেই কেন লোক ছুটে যায় বুঝতে পারি না। চার দিকেই পরের বাড়ি জলের রেটে নিলাম হচ্ছে, কী করে ওরা টের পায় কে জানে। আমি কোনও দিন টের পেলাম না। পেলেই-বা কী। পকেটে নেই কানাকড়ি, দরজা খোলো বিদ্যেধরী। কোথায় যাই এখন? আশ্চর্য, কোনও জায়গা মনে পড়ে না। বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ করা যেতে পারে। কী বিষম যাচ্ছেতাই জীবন। এক-এক সময় আমার মনে হয়, প্রতি দিন একই বন্ধু-বান্ধবের মুখ। আর কী সব মুখ, আহা! হাওড়া স্টেশনে যে-সব নিরুদ্দিষ্ট আসামির ছবি আছে, সবকটা এসে এখানে জুটেছে। হয় এর সঙ্গে দেখা, নয় ওর সঙ্গে আড্ডা, হই-হল্লা উত্তেজনা, ভাল লাগে না, সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগে। প্রতি দিন একই রকম কাটছে, এ-কথা ভাবলে বেঁচে থাকার আর কোনও পয়েন্ট থাকে না। মনে হল, বিমলেন্দু বোধহয় একা একা জীবন

কাটাচ্ছে। আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ওকে প্রায় দেখাই যায় না, চারটে চাকরি, রিসার্চ, খবরের কাগজে লেখা, সেই সঙ্গে কবিতা– যেন এসবের মধ্যে ও কী এক গভীর ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সব সময় অনুত্তেজিত ওর মুখ, কিছুটা বিমর্ষ। কী জানি আমাকে দেখে ও খুশি হয়েছিল, না বিরক্ত। মনে হয়, কিছুদিন পর হেমকান্তির সঙ্গে বিমলেন্দুর কোনও তফাৎ খুঁজে পাব না।

মায়ের মৃত্যুর পর এক মাস অশৌচ করল হেমকান্তি, নেড়া মাথায় রোজ হবিষ্যি খেত। তারপর থেকে এখনও প্রায় মাথা কামাচ্ছে, মাছ-মাংস ছেড়েছে। এই রকমই না কি সারা জীবন চালাবে। ওই রকম ফর্সা, লম্বা চেহারা, মুণ্ডিত মাথা, হেমকান্তি যখন আমাদের মধ্যে এসে বসে, মনে হয় যেন অতীতের কোনও মর্মর মূর্তি। ও বোধহয় জানে না যে, মাথা কামিয়ে ফেলার পর ওকে বিষম অহঙ্কারী দেখাচ্ছে। সে-দিন যখন মায়ার দিকে হাত তুলে চায়ের কাপটা সরিয়ে দিল, অস্ফুট গলায় বলল, আমি চা খাই না আর –মায়া চকিতে কাপটা নিয়ে সরে গেল। আমার মনে হল, এ দৃশ্যটা আমি এর আগে কোথাও দেখেছি। কোনও ফিল্মে বা রূপকথায় বা উপন্যাসে, বা স্বপ্নে, যেন কোনও অহঙ্কারী রাজপুত্র, বা নবীন সন্ন্যাসী, ফিরিয়ে দিচ্ছে কোনও উপচিকাকে। যদিও জানি, হেমকান্তির ও-রকম কোনও সাহসই নেই, আর মায়াও হেমকান্তিকে মোটেই পছন্দ করে না। মায়াকে আমারও যেন কেমন লাগে, ওই কচি মেয়েটাকে আমি বড় ভয় করি। নইলে আমার সময় কাটাবার সমস্যা? অনায়াসেই মায়ার কাছে গিয়ে চমৎকার বসতে পারতাম, বলতাম, মায়ার তোমার হাত দেখি। ওর করতল দু'হাতে ধরে গন্ধ শুকতাম, সমস্ত শরীরে চাপ দিতাম, ওর শরীর উষ্ণ হলে অনায়াসে জানানো যেত, মায়া তোমার জন্য আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। আমি ওর সঙ্গী বিছানায় শুতাম না, ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম কিংবা কানে কানে কথা বলতাম কিংবা চোখের দুটো পাতা আঙুলে তুলে ফুঁ দিতাম, আমি ওর কৈশোরের রহস্য নিয়ে খেলা করতাম। কিন্তু মায়া আমাকে তা দেবে না, আমি গেলে চা দেবে, ইয়ার্কি করবে, তারপর এক সময় বলবে, দিদিকে ডেকে দিচ্ছি, গল্প করুন। দিদি যদিনা থাকে বাড়িতে, তাহলে বলবে, আসুন দাবা খেলি। খানিকটা বাদে নিশ্চিত জানিয়ে দেবে, এবার বাড়ি যান। বাঃ। আমি যদি ওর হাত চেপে ধরি, অন্য রকম ভাবেও হেসে

উঠবে খিল খিল করে। যদি বালি, মায়া আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই, তাহলে ও হাসবে, বলবে, থাকুন না। যদি জোর করে চুমু খেতে যাই, ও হেসে মুখ সরিয়ে নেবে কিন্তু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না। ওর সঙ্গে জোর করা যাবে না। মায়ার সমস্ত হাসিই অভিমানের, আমার মনে হয়। বরং ছায়া ভাল, ছায়া দুঃখিত কিন্তু বোকা। লোভী কিন্তু ঘুমন্ত। ছায়াকে হয়তো আমি খানিকটা পছন্দ করি ঠিকই, কী জানি। অবিনাশের মত হাড়হারামজাদা ছেলেই মায়াকে ট্যাকল করতে পারে।

এখন আমি কোথায় যাই! কোনও মেয়ের সঙ্গেই প্রেম-টেমের সম্পর্ক নেই যে, হঠাৎ যেতে পারি। প্রথম কলেজ-জীবনে ও-সব চুকে গেছে। বাসন্তীর সঙ্গে কী গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, আর একটু হলেই ওকে বিয়ে করে ফেলতাম আর কী! সে-দিন বাসন্তীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল, নতুন বরের সঙ্গে চলেছে, খুশিতে মোটা হয়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু আশ্চর্য, আমার মধ্যে কোনও রকমঈর্ষা কিংবা দুঃখ নেই, কিংবা উদাসীনতাও জাগল না। খুবই সাধারণ ভাবে মাথা কঁকালাম, কী খবর, কেমন, ভাল, এই সব অনায়াসে বলাবলি করে চলে গেলাম। বাসন্তীও আমাকে মনে রাখেনি। মেয়েরা কেউ আমাকে মনে রাখে না। যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পরই তার চোখে তাকিয়েছি, বলেছি, চলো, রেস্টুরেন্টের কেবিনে বা হোটেল রুমে। চলো, ট্রেনের নিরালা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। ব্লাউজে সেফটিপিন গেঁথো না, আমার আঙুলে ফুটে যায়, আর আঙুল বিষম স্পর্শকাতর এবংদামি, সেফটিপিন ফোঁটাবার জন্য নয়। কেউ বেশি দিন টেকেনি। দু-একজন শেষ পর্যন্ত এগিয়েছে, অনেকে গোড়া থেকেই কেটেছে। কেউ কেউ, বিয়ে করো বলে এমন বায়নাক্কা তুলেছে, ওফ! এক এক জনকে সামলাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়েছে আমার! কত চোখের জল– টেলিফোনে চোখের জল, চিঠিতে চোখের জল। অথচ কেউই আমাকে কোনও অভিজ্ঞতা দেয়নি। উপন্যাসটা লিখলাম, সবাই বলল, খুব কর্কশ এবং নিষ্ঠুর হয়েছে। ভেবেছিলাম উনিশশো ষাট থেকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত নিজে যা যা করেছি, সেই সবই লিখব। তাই লিখেছি অনেস্টলি, যা যা মনে পড়েছে। কোনও নরম মুখ মনে পড়েনি, চোখের জল মনে পড়েনি, ভালবাসা শব্দটাই মনে পড়েনি। জীবনে কখনও আমি ভালবাসা পাইনি বোধহয়। অথচ ভালবাসার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম।

স্ত্রীলোকদের কাছে তো কম অভিযান করিনি, কিছুই পাইনি, লোভ ছাড়া, অথবা হয়তো আমার বোধশক্তি নেই, যা পেয়েছি এখনও তা উপলব্ধি করতে পারছি না। পরীক্ষিৎ তা পেরেছে, মেয়েদের সামান্য স্পর্শও ওকে কবিতায় ভরিয়ে তোলে, ওর কবিতা ভালবাসার কথায় মুখর। আমি কিছুই পাইনি, লোভ ছাড়া। লোভ আমাকে বহু দূর নিয়ে গেছে, ভালবাসার চেয়েও বড় আসনে, ইচ্ছে করছে এখনই কোনও স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে শুই। এই লোভ আমার মধ্যে এনেছে অ্যাকশন, আমাকে তাড়িয়ে চলেছে। এই জন্য আমার শরীরে অসুখ নেই, আমার প্রত্যেকটি স্নায়ু সতেজ, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। আমি শিশিরের পতন শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই।

ট্রামলাইনের পাশে বহুক্ষণ কাটল। রোদ্র বেশ চড় করছে। কোন দিকে যাব, এখনও দিকঠিক করতে পারিনি। মেসে ফিরে গিয়ে শুয়ে থাকা যেত। কিন্তু দুপুরে একটা খাওয়ার ব্যাপার আছে। কিন্তু না খেয়ে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ দেখা কবিত্বময় না। আমার ঠিক পোয় না। যত রাজ্যের কুচিন্তা আসে মাথায়, ইচ্ছে হয়, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করি, অথবা পিছন দিকের জানালার খড়খড়ি তুলে পাশের বাড়ির বাথরুমে উঁকি মারি। এ বয়সে আর ও-সব চলে না। আশ্চর্য, সকলেই দিব্যি চাকরি বাকরি করছে-আমি ছাড়া। এমনকী পরীক্ষিৎও খবরের কাগজের প্রুফ দেখে! স্কুলের মাস্টারিটা না ছাড়লেই হত, আরও কিছু দিন দাঁত কামড়ে লেগে থাকা উচিত ছিল। আসলে ওই স্কুলের হেডমাস্টারটার কান মুলে দেবার আন্তরিক ইচ্ছেটা আমি কিছুতেই চাপতে পারিনি। একেবারে জোচ্চরের ঘুঘু লোকটা। ও শালার উচিত, শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা করা।

অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর খেয়াল হল, কেন দাঁড়িয়ে আছি। যদি ট্রামে বা বাসে যেতে যেতে কেউ আমাকে দেখে নেমে পড়ে, বস্তুত আমি সেই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি কারুর কাছে যাবার বদলে যদি কেউ আমার কাছে আসে। কেউ আসে না। মেয়ে কলেজ ছুটি হবার পর এই যে অসংখ্য লাল-নীল-হলুদেরা, এরা কেউ আমাকে চেনে না। কেউ আমার কাছে এসে বলবে না, আপনি কি তাপসবাবু? নিশ্চয়ই আপনি! আপনার ঊনত্রিশ দাঁতের লোকটা উপন্যাস তো আমাদের ক্লাসের সব মেয়েরা পড়েছে। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে

আপনার ছবি দেখেছি। এসব ভাবতে বেড়ে লাগে। কত লোকের উপন্যাস আরম্ভ হয় এ-রকম ভাবে! আমার বেলা শালা কিছু হল না! কোনও মেয়েই আমার বই পড়েনি। কোথাও কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর যদি শোনে, আমি এক জন লেখক, তখন সেই সব মেয়েরা আমসিপানা মুখ করে জিজ্ঞেস করে, আপনি লেখেন? তাই তো, আমি কী লিখি। কচুপোড়া লিখি, তাছাড়া আর কী!

কোথায় যাব? অম্লান! দো-তলার ছোট গুমোট ঘর, পাশের হোটেলের অ্যাকাউন্টে খাওয়া, হো হো করে হাসবে অম্লান, নার্ভাস গলায় নিজের কবিতা মুখস্থ বলবে, আর চুটিয়ে পরনিন্দা-পরচর্চা করে যাব। এখন বাড়িতে থাকলে হয়। হে ঈশ্বর, অম্লানের যেন টাইফয়েড কিংবা পক্স, অন্তত মামস হয়ে থাকে। যাতে বিছানায় শুয়ে থাকরে। নইলে ওকে বাড়িতে পাওয়া এ সময়, ঈশ্বর, তোমারও অসাধ্য। অম্লানের ঘরে বহু রাত কাটিয়েছি। যে-কোনও প্রোগ্রামে বেশি রাত হয়ে গেলেই অম্লানের বাড়িতে বারোটার পর-পরীক্ষিতের আবার বাস বন্ধ হয়ে যায়, দু'জনে কতবার এসেছি এখানে। ওর বাড়ির দরজার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খিল খোলা যায়। ঢুকে গেছি ভিতরে। ঘুম থেকে উঠে এসে অম্লান একটুও না চমকে আমাদের ঘরে ডেকেছে, হাসি-হাসি মুখ করে বলেছে, রাত্তিরে তো ঘুমোত দেবে না জানি, বেলেল্লা করবে, সকালবেলা চা, ডবল ওমলেট সাঁটাবে, সিগারেট ধ্বংস করবে, তারপর গাড়িভাড়াও চাইবে নিশ্চয়ই। ওঃ, পদ্য লেখা শুরু করে কি অন্যায়ই করেছি। তোদের মতো বন্ধু জুটিয়েছি, ভিখিরিরও অধম। তা জগাই, মাধাই, আর একটি কোথায়—কাঙাল হরিদাস?

পরীক্ষিৎ হাসতে হাসতে বলেছে, সে আবার কে রে?

কেন, শেখর? তিন জন না হলে তো তোমাদের চলে না। অবিনাশ তো শুনেছি কেটে গেছে, সে নাকি আজকাল ভাল ছেলে! হ্যাঁ রে, তোদের যে প্রতিভা আছে, ঠিক জানিস তো? নাকি এ-রকম বাওয়া হয়ে শিল্পী সেজে (অম্লান উচ্চারণ করে '□□□পি') জীবনটা নষ্ট করবি। শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না? আমি কিন্তু তোদের প্রতিভার এখনও কিছু টের পাইনি।

সারা ঘরে ছড়ানো বই ও পুরনো তিন বছরের খবরের কাগজ, মাটির খুরিতে চুরুটের ছাই, জীবনে একবারও না কাঁচা বেড শিট, খাটের শিয়রের বই-এর র‍্যাক থেকে শবের গন্ধ আসে। অম্লান আমাদের ঠাট্টা করে। অম্লানের ঠাট্টা শুনে পরীক্ষিৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আমি হাসতে হাসতে বলি, অম্লান, আমি শিল্পীও সাজিনি, জীবনটাও নষ্ট করছি না। শিল্পীরা কী-রকম সাজে, কীভাবে জীবন নষ্ট করে কে জানে।

অম্লান বাড়িতে নেই।

তিন জায়গায় ব্যর্থ হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এলাম। অম্লানের ঘরে তালা বন্ধ। অবিনাশের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম অনিমেষ আর গায়ত্রী কলকাতায় এসেছে, আছে ছায়াদের বাড়িতে, অবিনাশ সেখানে। গগনকেও যদি অন্তত পাওয়া যেত। গগনকে পেলেই সব চেয়ে ভাল হত, ও নিশ্চিত আমার কথায় অফিস কাটতে রাজি হত। ওর কাছে সব সময় টাকা থাকে, ওর মতো ডেসপ্যারেট কেউ নেই, একটা কিছু ঘটে যেত। গগনকে গিয়ে ডাকলে বাড়ির দরজায় নেমে আসে গগন, কপালে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে আমার বিনীত প্রস্তাব শোনে। কিছুক্ষণ কী ভাবে, তখন ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বোঝাই যায় না, ও আমার কথা শুনছে, না অন্য কথা ভাবছে। রাজি হবে কি না সন্দেহ, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গগন বলে, চুপ, একমিনিট দাঁড়া, আসছি। ঠিক এক মিনিট বাদে গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে আসেগগন, বাড়ি থেকে কুড়ি পা পর্যন্ত গম্ভীর মুখে আসে, তারপর এক টানে মুখোশটা খুলে বলে, মাইরি, চমৎকার দিনটা আজ, চুটিয়ে ফুর্তি করার মতো। চল, কোথায় যাবি বল।

গগন অফিসের কাজে এলাহাবাদে গেছে। খুব বেঁচে গেছি। মায়ার সঙ্গে প্রেম করার অছিলায় ওদের বাড়ি আজ যাইনি, ওখানে অত লোক দেখলে খুব খারাপ লাগত। তিনটে মেয়ে এক বাড়িতে– ছায়া, মায়া, গায়ত্রী। অনিমেষের মাসতুতো বোন গীতাও কি আর আসেনি! ওখানে গেলেই ভজরঙ গজরঙ করে সময় কাটাতে হত। এক সঙ্গে অত মেয়ে

আমার সহ্য হয় না, বড্ড বাজে রসিকতা শুনে হাসতে হয়। আজ আমার সে-রকম মেজাজই নেই। অবিনাশটা ওখানে কী করছে, কে জানে!

অনেক দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসিনি। সুন্দর নরম ঘাসে ভরে আছে এই দুপুরবেলা। ঘাস দেখে গোরুর মতো আনন্দ হচ্ছে আমার। কৃষ্ণচূড়া ফুল খসে খসে পড়েছে। ১৫ এপ্রিল সব গাছগুলো সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়, বহু বছর লক্ষ্য করেছি। ও-পাশের ওই হলদে ফুলগুলি নাকি রাধাচূড়া, একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল। একসময় এই ঘাসের উপর বহুক্ষণ শুয়ে কাটাতাম। ছায়া আসত, ছায়াকে টোপ ফেলে অন্য দু-এক্টা মেয়েকেও টেনে আনা যেত। এক দিন মনে আছে, পুরাদুঘণ্টা ভিজেছিলাম এখানে বসে, ছায়ার সঙ্গে বাসন্তী আর নীলা বলে দুটি মেয়ে এসেছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি, সবাই দৌড়ে দৌড়ে পালাল, আমরা বৃষ্টির মধ্যেই বসে রইলাম। দূরের বারান্দা থেকে সবাই আমাদের দেখতে লাগল। কেয়ারটেকার এসে বলল, আপনারা করছেন কী, নিউমোনিয়ায় মরবেন যে! আমরা অগ্রাহ্য করে তবু বসেছিলাম। মেয়ে দুটো হাসছিল খিল খিল করে। ভিজে ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার ছুঁড়ে বুকের গোল স্পট হয়ে উঠল ওদের, আমি ওদের অশ্লীল গল্প শোনাতে লাগলাম। ক্রমশ আধোশায়া প্রত্যেকটি মেয়ের বুকে ও পিছনে চারটি বাটির মতো গোল দেখে উত্তেজিত হয়ে আমি নীলা বলে মেয়েটির পিছনে আস্তে আস্তে পা দিয়ে টোকা মেরেছিলাম, তারপর, বৃষ্টি শেষে নীলা কী-রকম চমৎকার আমার সঙ্গে একা বাড়ি ফিরতে রাজি হয়ে গেল। সেই নীলা এখন সর্বেশ্বরকে বিয়ে করে মেয়ে কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছে। এক দিন দেখা হবার পর বলল, লেক টাউনে জমি কিনেছে, শিগগিরই বাড়ি তুলবে। একটিমাত্র ছেলে হয়েছে, তার কী নাম রাখবে– সেজন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিল। বেশ সুখে আছে নীলা, এই তো জীবন, এই তো সুখ, সেই বৃষ্টি ভেজা মাঠে আবার কেউ ফিরে আসে না। আজকাল আর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমাদের কেউ আসে না। সবাই পুরো সাহিত্যিক বা অধ্যাপক বা চাকরিতে ঢুকেছে। আমিই শুধু বোকা রয়ে গেলাম।

খুব খিদে পেয়েছে আমার। সত্যিকারের খিদে, বিমলেন্দুর সাত-আনা গাড়িভাড়াতেই হাওয়া। সিগারেটও ফুরিয়ে এল। দুপুরে যে-কোনও ভাবেই হোক, পুরো পেট খেতেই হবে, কোনও চালাকি নয়। না খেয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। আমার সুখের শরীর, খিদে একেবারে সহ্য হয় না। তাছাড়া দুপুরে আর সবাই খাবে, আমি একা কেন না খেয়ে থাকব? ইয়ার্কি নাকি? আজ বড় ইচ্ছে করছে মাংসের ঝোল দিয়ে লুচি খেতে। লুচির বদলে ভাত হলেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু মাংস আমার চাই-ই।

লাইব্রেরির দরজায় কার্ড চায়। কোথায় পাব? বহু দিন ও-সব চুকে গেছে। অনেক রকম বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ঘাড় মোটা নেপালি হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটার হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, দে ভাই, একটু ঢুকতে দে, বড় খিদে পেয়েছে। তবুও লোকটা শোনে না। তখন আমি বললাম, লাইবিরিমে হামারা লিখা একটা কেতাব হ্যায়, জানতা? হামসে কার্ড চাও, মাৎ, দু'দশ বরষ বাদ দিয়া পর হামারা ফটো ঝুলেগা, সমঝা? লোকটা বলল, নেই সাব, কার্ড দেখাইয়ে। তখন আমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হল। এই সব সরকারি বোকামির প্রতিষেধক আমি জানি। গেট থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এলাম, বারান্দায়, যেখানে দু'পাশে ফুলের টব। এ-দিক ওদিক তাকালাম, আকাশের দিকে, নেপালিটা আমাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ আমি গণ্ডারের মতো খানিকটা মোশান নিয়ে প্রবল বেগে দৌড়ে নেপালিটাকে ভেদ করে গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। লোকটা আরে আরে বলে পেছনে পেছনে ছুটল। আমি তিন জনকে ধাক্কা মেরে, একটা মেয়েকে ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে পিছলে পড়তে অন্য একটা মেয়ের হাত থেকে সাতখানা বই ফেলে দিয়ে ক্যাটালগ কেবিনখানাকে বোঁ বোঁ করে তিনটে পাক দিয়ে –যতক্ষণে নেপালিটা আমাকে ছুঁয়ে ফেলল, ততক্ষণে আমি লেন্ডিং সেকশানের কাউন্টারে একটা লোকের হাত চেপে ধরেছি ও বলেছি, অশোক, অশোক, দেখ, এ কী উৎপাত। তার সঙ্গে দেখা করতে আসব, তবুকার্ড চাইছে! গোলমালে অনেক লোক পড়া থামিয়েছে ও মজাখোর লোকেরা ভিড় জমিয়েছে আমার চারপাশে, নেপালিটা হাত ধরে টানবার চেষ্টা ছাড়েনি। দীর্ঘ সবল কালো অশোক শান্ত চোখ তুলে বলল, কী, কার্ড আনেননি? ছেড়ে দেও দারোয়ান, হামারা চেনা আদমি হ্যায়। আমি অশোকের ব্যবহারে থমকে গেলাম। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ বড় বড়

করে তাকালাম অশোকের দিকে। আপনি’ বলে কথা বলছে আমার সঙ্গে, মাস দু’তিন আগেও তো ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অশোক বলল, কোনও বই দরকার থাকে যদি, একটু ঘুরে-টুরে দেখুন, আমি একটু ব্যস্ত এখন।

আমি তবু রাগ করলাম না, গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে, অশোক। এক মিনিট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের দরজা খুলে বলল, ভেতরে আসুন।

অশোকের কাছে খেতে চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু ওবঅস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ব্যবহারে কী রকমভ্যাবাচাকা মেরে গেলাম। কী ব্যাপার, অশোক আমার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাইছে? আমি বললাম, তোর কী ব্যাপার, তুই কেমন আছিস? আমি ওর কাঁধে চাপড় মারলাম।

ভালই! বিশেষ কিছু বলবেন? সেই রকম ঠাণ্ডা গলা অশোকের।

না বিশেষ কিছু না। এমনিই- ।

তাহলে- । এই বলে অশোক এমন ভাবে থেমে গেল যে, এখন যাও বলতে হল না। আমি আচ্ছা চলি বলে পিছন ফিরলাম। অশোক আমার কাছে এসে গলার আওয়াজ নিচু করে বলল, ওঃ, আপনাদের জানানো হয়নি, মাস খানেক আগে আমি বিয়ে করেছি। আচ্ছা পরে দেখা হবে। আমি স্তম্ভিত ভাবে অশোকের দিকে ফিরে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে করেছিস মানে? আমাদের খবর দিলি না? কী ব্যাপার তোর? অশোক আলগা ভাবে বলল, খুব ব্যস্ত ছিলাম, বেশি লোককে বলা হয়নি। বেশি লোক আর আমি? অশোক আর একটিও কথা না বলে কাজে মন দিয়েছে। আমি বেরিয়ে এলাম। এ-রকম আশ্চর্য আমি বহু দিন হইনি। এ কী রহস্য! খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে, অশোকের সঙ্গে জীবনে কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি। টাকা ধার নিয়ে মেরে দিইনি। বেশ চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল এক সময়। এক মেসে এক সঙ্গে দু’বছর কাটিয়েছি। হঠাৎ অশোক আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় অস্বীকার করতে চাইছে। কেন? কী জানি। বিয়ে করেছে, নেমন্তন্ন করেনি। এর কোনও

রকম কারণই মনে পড়ে না। খানিকটা গিয়ে অশোকের দিকে ফিরে তাকালাম। মহাত্মা গান্ধীর ছবির নিচে অশোক মুখ নিচু করে কাজ করছে, এ-দিকে চেয়েও দেখছে না, সারা দিনে এই প্রথমআমার বিষম মন খারাপ লাগল। খালি পেট ও মন খারাপ এই দুটো এক সঙ্গে থাকা খুব বিচ্ছিরি। অশোকের কাছে খেতে চাইব ভেবেছিলাম, তা-ও হল না, অথচ অশোক আমার মন খারাপ করে দিল। মানুষ এত নিষ্ঠুর।

হলঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলাম আস্তে আস্তে। নিওন আলোর নিচে ঝুঁকেপড়া মুখগুলি ভাল করে খুঁজে খুঁজে দেখলাম। না, আমার কেউ চেনা নেই। আমাকেও কেউ চেনে না। এক সময় প্রায় আদ্দেক লোক চেনা থাকত। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে টেবিলে, দু’পাশের বুকে-পড়া পড়ুয়াদের দেখে হঠাৎ যেন মনে হল, লঙ্গরখানায় ভিখিরিরা খেতে বসেছে। লাইব্রেরি কোনও দিন আমার এত খারাপ লাগেনি। মহাপুরুষের উক্তি চারদিকে কোলাহল করে। অসহ্য কোলাহল।

উর্দু অ্যালকভে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিরঞ্জীব রায়চৌধুরী বসে আছেন। বুঝলাম, আর একখানা থান-ইট বাজারে ছাড়বার মতলব। আজকাল আবার নভেলের মধ্যে দু’খানা ইংরেজি কোটেশান ফোটেশান থাকলে লোকে খুব আধুনিক মনে করে, চিবঞ্জীব রায়চৌধুরীরাও এ-সব জেনে গেছেন। তাই বুঝি নাাশনাল লাইব্রেরিতে? তাছাড়া বিনা পয়সায় পাখার হাওয়া। আমি চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর কাছে গিয়ে বললাম, কেমন আছেন! নতুন উপন্যাস বুঝি?

এই যে, কেমন আছ তপেশ? তারপর –(হাত দিয়ে যে-বইটা থেকে টুকছিলেন তার নাম আড়াল করে) হা, হা, তোমার বইটা পড়েছি, সবটা পড়েছি, বুঝলে, বেশ ভালই হয়েছে। প্রথম তো, খুবই ভাল হয়েছে। তোমার হাত আছে তপেশ, লিখে যাও, বুঝলে।

আমি গোল গোল চোখে মোলায়েম গলায় বললাম, আপনি কষ্ট করে সবটা পড়লেন?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো কী, তরুণ লেখকদের লেখা না পড়লে কি আর সাহিত্যের পালস বোঝা যায়? ভদ্রলোক হাঃ হাঃ করে হাসলেন। এই নিয়ে সাতাশ বার এই অশ্লীলকে আমি

বলেছি যে, আমার নাম তপেশ নয়, তাপস। নামটাই উচ্চারণ করতে শেখেনি, ও আমার বই পড়েছে? আমার বই পড়লে ও এইরকম নিশ্চিন্তে বসে লিখতে পারত কিংবা বোকার মতো হাসত? তাহলে এত দিনে ওর অম্বলেব অসুখ হত না? বস্তুত লোকটার ব্যবহারে আমি এমন অসম্ভব চটে গেলাম যে, ওকে কী শাস্তি দেব মনে মনে ভাবতে লাগলাম। এই মুহূর্তে ওর নাক মুলে দেবনা পকেট মারব এই নিয়ে দ্বিধা করলাম খানিকক্ষণ। পকেটে একটা পাঁচ পয়সা নিয়ে হেড-টেল করতে লাগলাম। হেড নাক মলা, টেল পকেটমারা। ওর সঙ্গে অন্যান্য কথা বলতে বলতে পয়সাটা বার করে দেখলাম। টেল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এবার কী নিয়ে লিখছেন, স্যার? এক সময় উনি আমার অধ্যাপক ছিলেন।

এবার খুব বড় থিম ধরেছি ভাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ –সব মিলিয়ে বিরাট প্ল্যান। এব মধ্যে একটি নায়ক আর তিনটি নায়িকার জীবন-দর্শন। হাজার পাতার বই হবে অন্তত, স্মল পাইকা।

নায়ক কীসে মরছে এবার? ট্রেনের নিচে সুইসাইড?

না, হে, প্রত্যেক বার এক রকম হয় না। বন্যায় ভেসে যাবে।

ও, আমি অভিভূত গলায় বললাম, কতটা লিখলেন?

সাত দিনে প্রায় ওয়ান-ফিফথ লিখে ফেলেছি। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে মুসোলিনির একটা স্পিচ ঢোকাব।

আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। চলুন, চা খেয়ে আসি।

চলো যাই, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে আছি। খাটতে হয় হে, ফঁকি দিয়ে সাহিত্য হয় না। বিনা পরিশ্রমে ইতিহাসে আসন পাওয়া যায় না।

আপনার আগের বইটা কত এডিশন হল, তেরো না চোদ্দ?

একুশ চলছে। বম্বে থেকে কিনেছে শোনোনি? তেলেগু ভাষায় অনুবাদ বেরুচ্ছে এ মাসে।

ক্যান্টিনে খুব ভিড় ছিল, আমি ওঁকে চিড়িয়াখানার ভেতরের দোকানে নিয়ে এলাম। ঢুকেই আমি পাঁচ-সাত রকমের ঢালা অর্ডার দিয়ে দিলাম। কী, ও কী, ভদ্রলোক হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন, অত খাবার কে খাবে? তুমি খেয়ে আসোনি নাকি?

আমি বিগলিত ভাবে বললাম, আপত্তি করবেন না আজ, অনেকদিন বাদে আপনাকে পেয়েছি। আজ আমি আপনাকে খাওয়াব। আপনি আমার বইটা পড়েছেন কষ্ট করে–

না, না, তা কী হয়, কী খাবে খাও না, পয়সার জন্য কী! আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তুমি পয়সা দেবে কেন? আমার আবার অম্বলের খানিকক্ষণ চুপচাপ প্লেট সাবাড় করার পর বললাম, আপনি তবুআমার বইটা পড়েছেন, ওমুক-ওমুক বিখ্যাত লেখকেরা তত উলটেও দেখেননি। সবশালা বিখ্যাত সাহিত্যিক।

প্রসন্ন মুখে চিরঞ্জীববাবু বললেন, তোমার আবার রাগলে ভাষাজ্ঞান থাকে না। বুঝলে, অনেকে বোঝেন না যে ইয়ং ব্লাডই হল সাহিত্যের-হঠাৎ চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর মুখের রেখা কোমল হয়ে এল। একটু আলতো ভাবে বললেন, পয়সার লোভটা বড় সাংঘাতিক, সবাই লোভ সামলাতে পারে না। আমিও যে ঠিক পেরেছি, তা বলতে পারি না। টাকার লোভে অনেক সময় হেলাফেলা করে বাজে লেখা লিখেছি। কিন্তু কি জানো, এখনও আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে তোমাদের বয়সটা, যখন সাহিত্যই ছিল ধ্যান-জ্ঞান, সাহিত্যের জন্য সাধনা করেছি। বুঝলে টাকা-পয়সা কিছুনা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কী, টাকা-পয়সা কিছু না তো আপনি লেখেন কেন? আমি তোদু চারটে টাকা পাবার আশাতেই লিখি। নইলে আর লেখার কী দরকার?

যাঃ এটা তোমার বানানো কথা। তোমাদের এই বয়সে টাকা-পয়সা কিছুনা, সাহিত্যই হচ্ছে–

চিকেন-স্টু-টা কিন্তু চমৎকার করেছে, একটু খেয়ে দেখুন। আমি বললাম হাত মুছে কফিতে চুমুক দিতে দিতে। তিনি বললেন, সিগারেট আছে তোমার কাছে? ছিল। কী যেন ভেবে তবু বললাম, না তো। তিনি পকেট থেকে লাল দুটাকার নোট বার করে বেয়ারাকে ডাকতে যেতেই আমি বললাম, দিন, আমি নিয়ে আসছি। কী সিগারেট?

গোল্ডফ্লেক।

বসুন, এসে আপনার উপন্যাসের প্লটটা শুনব।

দোকান থেকে বেরিয়েই একটি অত্যন্ত সুন্দরী কিশোরী মেয়েকে দেখতে পেলাম। সাদা ফ্রক-পরা, রাজহংসীর মতো। মেয়েটার পেছন পেছন খানিকটা গেলাম। তিন-চার জন মহিলা, দু'টি বাচ্চা, দু'জন পুরুষের একটি দলের মধ্যে ওই মেয়েটি। মেয়েটি কী কারণে যেন অভিমান করেছে, মুখখানি তাই ঈষৎ থমথমে। ওই অভিমানের জন্যই ওর মুখখানা কী অপরূপ হয়ে উঠেছে। মেয়েটিকে মনে হয় ওই দলটা থেকে একেবারে আলাদা। বস্তুত সারা পৃথিবীর থেকেই ওকে আলাদা মনে হয়। মেয়েটি চুম্বকের মতো আমায় টানল। মেয়েটা গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আমিও বাইরে এলাম। বেরিয়েই দেখলাম, একটা বিরাট স্টেশন ওয়াগন, মেয়েটি দলবলের সঙ্গে সেটাতে উঠছে। মেয়েটির সঙ্গে একবারও আমার চোখাচোখি হয়নি। ও আমাকে দেখেনি। আমিও ইহজীবনে ওকে আর দেখব না। গাড়িটা চলে যেতেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর চোখে পড়ল সামনেই একটা থ্রি বি বাস। এই বাস এমনই দুর্লভ যে, দেখামাত্র আর অন্য কোনও কথা আমার মনে হল না। বাসটা স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে উঠে পড়লাম। এবার দু'টাকার নোটটা ভাঙিয়ে টিকিট কাটতে কোনও অসুবিধে হয় না, ফেরত খুচরোটা পকেটে রাখবার পর নিজেকে বেশ ধনী মনে হয়। একটা পাঁচ নয়া ছুঁড়ে সার্কুলার রোডের বুড়ি পাগলিটাকে দিলাম।

এবার? রোদ্দুর ও ছায়ার মধ্যে দিয়ে বাস ছুটে যায়। লোকজন ওঠে ও নামে। আমি কোথায় নামব জানি না। এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত টিকিট কেটেছি। এবার কোথায় যাব? এখনও

দীর্ঘ সময় পড়ে আছে। আবার কি গোড়া থেকে খোঁজা শুরু করব? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেই তো বিকেলটা কাটাতে পারতাম। কোনও রকমে ইংরেজিটা পড়তে পারি, অনিমেষ বা বিমলেন্দুর মতো না হলেও এক কালে তো কিছু ইংরেজি বইও পড়েছি। সিলিনের বইটা আকে পড়েছিলাম পাঁচ মাস আগে, সেটা শেষ করা যেত। কিংবা রিকুইজিশান স্লিপের গোছার উলটো পিঠে একটা ছোট গল্পও মশ করতে পারতাম, লিখলে দু-চারটে টাকাও কি আর পাওয়া যেত না, টাকার জন্য এরকম উঞ্ছবৃত্তি না করে। কিন্তু পড়তে বা লিখতে কিছুই ভাল লাগে না। যেন একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দি আছি, দাঁত দিয়ে কেটে খাঁচা ভেঙে সহজেই বেরুতে পারি, বেরুতে ইচ্ছে করছে না বলেই আটকা রয়েছি। হঠাৎ একথাটা কেন মনে হল? খাঁচা-ফাঁচা আসলে বাজে হ্যাক। কিন্তু এ তো মহা মুশকিল, এখন কোথায় যাই? মহাশূন্যে রকেটে যারা যায়, পৌঁছুতে পারুক বানাই পারুক, তারাও জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানিনি। মৃত্যুর পর শরীরের পঞ্চভূত জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানি না। খুনি আসামিও জানে সে কোথায় যাবে, আমি নাঃ, এরকম ভাবে দিন কাটে না। এবার যার কাছে যাব, দেখা না পেলে আমি ভয়ঙ্কর চটে যাব তার ওপর, প্রতিশোধ নেব, দরকার হলে তার নামে থানায় ডায়েরি করে আসব। বাকি আছে শেখর। দেখি শেখরকে। কিছু পয়সাকড়ি পেলে পুরী কিংবা কাশীতে ঘুরে এলে বোধহয় ভাল লাগত। চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে পরে যখন আবার দেখা হবে, প্রথমেই পায়ের ধুলো নিয়ে এমন ভুলিয়ে দেব।

শেখর বাড়িতেই। কারণ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বিনা শব্দে দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে শেখর, একটা ধুতি জড়িয়ে পরা, আমার দিকে ভুরু তুলে বলল, কী ব্যাপার, তুই?

একটু থতমত খেয়ে বললাম, এমনি এলাম।

হঠাৎ এ সময়?

আমি কি ভুল শুনছি, আমি বুঝতে পারলাম না। নাকি কোনও বিদেশে এসেছি, যেখানে কারুকে চিনি না? নাকি রিপ ভ্যানের মতো দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে উঠে দেখছি হঠাৎ সব বদলে গেছে? নচেৎ, শেখর! শেখর বলছে, হঠাৎ এ সময়? যেন আমাকে চেনেই না, সেই শেখর, যে আমাকে আমি যাকে- যে আমাদের, আমরা যাকে । সেই শেখর যে সিনেমা দেখতে গিয়ে অবধারিত গণ্ডগোল বাধাবে, ও দাদা টাক চুলকুনো থামান, ও ডান দিকের মশাই, প্রেমালাপটা একটু আস্তে, কিংবা এই যে সিনেমাটা পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে- এইসব দিয়ে প্রত্যেক দিন ঝগড়া বাধাবে আর আমরা ওকে বাঁচাব, আর যে-শেখর মদ খেয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়লে আমরা ওকে লরিচাপা থেকে বাঁচাতে যাই, যে-শেখর কবিতার জন্য বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারে, ছ' বছর ধরে যে কবিতার পত্রিকা বার করে বাপের টাকা ওড়াচ্ছে, পরশু দিনও যে-শেখরের সঙ্গে আমি তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। হঠাৎ কেন জানি না, আমার চোখে জল এসে গেল। সত্যিকারের কান্নার চোখ, আমি চোখ নিচু করলাম। অশোক প্রথম আঘাত দিয়েছিল, তারপর শেখর।

শেখরমুখ কালো করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, দাঁড়া, আমি আসছি, সিগারেট কিনতে বেরুব। শেখর আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে গেল! আমাকে ভেতরে যেতে বলল না। না বলুক, কিন্তু দরজাটা ভেজানো, আমি কি চলে যাব? কেন এবং কোথায় যাব? আমি শেখরের ওপর যথেষ্ট রেগে যেতেও পারছি না, তার বদলে আমার মন ভেঙে আসছে। শেখর চটি গলিয়ে চট করে ফিরে এল। কোনও কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। তারপর সদর পেরিয়ে আসার পর ও বোমার মতে ফেটে পড়ল :ইডিয়েট, রাস্কেল, অশ্লীল অশ্লীল, তোকে না অত করে বললাম সে-দিন দুপুরবেলা ভেতরে থেকে দরজা বন্ধ দেখলে খবরদার আমাকে ডাকবিনা।

কেন রে? আমি সম্পূর্ণ আকাশ থেকে নরকে পড়লাম।

ফের –মি, করছিস?

সত্যি, আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস করব, আমাকে ডোবাবার মতলব!

না না, সত্যি শেখর, বিশ্বাস কর, আমার কিছুই মনে নেই। শেখর বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমার গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

সে-দিন বলিনি তোকে যে দুপুরবেলা একটা বিরাট বড়লোকের মেয়েকে প্রাইভেট পড়াচ্ছি? মাসে আড়াইশো দেবে, তাছাড়া গেঁথে ফেলতে পারলে –।

একদম মনে ছিল না, সত্যিই।

মনে ছিল না? কেন ছিল না? যদি দেখে কতগুলো লোফার ছাবড়া সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব –শেখর এই কথাটা হেসে বলেছিল। আমি শেখরকে মোটে ঈর্ষা করলাম না। বরং খানিকটা যেন করুণা হল, বললাম, যাঃ, আমাকে মোটেই লোফার কিংবা ছ্যাবড়া সাহিত্যিকের মতো দেখতে নয়। প্রায় তোর মতোই ভাল চেহারা আমার।

এখন কেটে পড় ভাই। আমাকে চান্স দে।

আমি অন্য দিকে মুখটা ফিরিয়ে চোখ মুছে নিলাম। শেখরকে ছাড়তে কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। শেখর আমার শেষ আশ্রয়। একটা মেয়ের জন্য শেখর এমন চমৎকার দুপুরটা নষ্ট করছে। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? আমি বললাম, শেখর। শেখর মুখ তুলে বলল, কী? আমি পুনরায় বললাম, শেখর–। শেখর বলল, কী ন্যাকামি করছিস! আমি বললাম, শেখর, সকালে থেকে খুব খারাপ লাগছে, মানে বিচ্ছিরি লাগছে, আর কী! খুব কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে, তাই তোর কাছে এলাম।

শেখর এতেও গলল না। বলল, কবিতা পড়ার ইচ্ছে? এই দুপুরবেলা? ন্যাকামির একটা সীমা আছে। তা তোর ইচ্ছে হয়েছে, তুই গঙ্গাব পাড়ে বসে দখিন হাওয়া খেতে খেতে কবিতা পড় গিয়ে। আমার এখন সময় নেই, তাই।

বিশ্বাস কর, আজ হঠাৎ খুব বিলকের কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে। তোর রিলকের কালেকশানটা দে। পার্কে বসে পড়ব।

কবিতা পড়বি, তা-ও আবার বিলকের কবিতা? শখ কম নয় তো!

তুই তো জানিস, আমি রিলকের কবিতা কত ভালবাসি। আমি রিলকের মূল্য বুঝি।

তুই কবিতা কিছুই বুঝিস না। বরং জা জেনের 'আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স' পড়, তোর কাজে লাগবে।

না, আমি রিলকে চাই।

শেখর দাঁড়িয়ে রইল খানিকটা চুপ করে। সিগারেট টানল। বলল, আচ্ছা দাঁড়া, এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধের পর দেখা করব। আমি বললাম, কাপড়টা ফেরত দিয়ে পরে নে শেখর। জমিদারের মেয়ের সামনে অমন ভাবে বসতে নেই।

চামড়ায় বাঁধনো রিলকের কালেকশানটা পেয়ে আমি বুকে চেপে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। যেন মহামূল্যবান সম্পদ আমার বুকে। এতক্ষণে আমার অনিশ্চিত নিঃসঙ্গতার বোঝা কাটবে নিশ্চিত। আ, বিলকে, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। সারা পৃথিবীর লোক তোমার ভক্ত, এখনও তরুণরা তোমার লেখা কিনে পড়ে। কত সাধনায় তোমাকে পেয়েছি, অথচ এক মিনিটে।

আমি জানি, তুমি কত বড় কবি, যদিও জীবনে এক লাইনও পড়িনি। পৃথিবীময় তোমার ভক্ত, তাই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এত প্রগাঢ়। তুমি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়, কারণ শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের সুলভ গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে, কিন্তু তোমার কোনও পেপারব্যাক এডিশন নেই, তুমি কি বাংলাদেশের কথা জানতে? বাংলাদেশেও এখন তোমার প্রতি ভক্তির ঢেউ বইছে। তোমার গোলাপের কাঁটায় বেঁধা বুকের রক্তের কবিতা। বইটার একটা পাতা ওলটাতেও আমার ভয় করল, যেন আমার চোখ আটকে যাবে। আমি

সোজা বাসে চেপে এলাম কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাতের পুরনোবইয়ের দোকানে। এসে বললাম, এই নাও, ভাল মাল এনেছি।

লোকটা লুঙ্গি তুলে ঊরু চুলকোচ্ছিল। বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে, আজকাল তেমন চলে না এ বই।

ও-সব ফিকির ছাড়ো মিঞা, রিলকে চলে না তুমি আমাকে বোঝাবে?

না, একটু মারকেট পড়ে গেছে। সেদিন যে মারি স্টোপস এনেছিলেন–

ভাগ! সোনালি চশমা পরা মেয়েরা, লম্বাচুল বাবুরা কিংবা হাওয়াই কোর্তা-পরা ছোকরারা এই লুফে নেবে।

না, সত্যি বলছি, আজকাল– ।

যাঃ যাঃ, কালও আমি এখানে দাঁড়িয়ে শুনে গেছি একজোড়া ছোকরা-ছুকরি খোঁজ করে গেল। ব্রান্ড নিউ মাল, দেখো।

লোকটা একটু হেসে বলল, লেকিন নাম লেখা আছে, তুলতে হবে।

ও তো একটু ক্লোরিন ঘষার মামলা। ঝুট ঝামেলা করো না, কত দেবে বলে?

অনেক দরকষাকষির পর আট টাকা পাওয়া গেল। সারা দিনে এইটাই সব চেয়ে বড় সাকসেস। আর কিছু চাইনা। পরও পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। এখন একটু কফি খাওয়া যেতে পারে। এখন কারুর দেখা না পেলেও আমার আর একা লাগবে না। পকেটে আট টাকা আছে সঙ্গী! চিরঞ্জীবের টাকাটা দিয়েই কফি-টফি খাওয়া যাবে। ওই টাকায় এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনলাম, কেন না উনি গোল্ডফ্লেক কিনতে বলেছিলেন। প্রায় বছর পাঁচেক বাদে আমি নিজের হাতে নিজের টাকায় গোল্ডফ্লেক কিনলাম। এত দাম বেড়ে গেছে জানতাম না। কারা খায় এ-সব!

কফি হাউসের জানালার পাশের টেবিলে একা পরীক্ষিৎ বসে ছিল। বিশাল লম্বা শরীরটা নিয়ে ঝুঁকে আছে পরীক্ষিৎ। একটা দু-বুক পকেটওয়ালা খাঁকির জামা পরেছে। পরীক্ষিৎ আমার চেয়ে প্রায় আধফুট লম্বা, স্পষ্ট, সত্যজিৎ রায়ের মতো চোয়াল, ওর শরীরটা আমি ঈর্ষা করি। আমি পাশে দাঁড়াতেই ও মুখ তুলল। পরীক্ষিতের চোখ দুটো অসম্ভব লাল। বলল, সারা দিন কোথায় ছিলি? তোর মেসে গিয়েছিলাম দুপুরে।

আমি যে সারা দিন যে-কোনও বন্ধুকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি সে-কথা ওকে জানালাম না। বললাম, অনিমেষ আর গায়ত্রী এসেছে, শুনেছিস?

শুনেছি।

দেখা হয়নি তোর সঙ্গে?

হু! ওরা ফিল্ম দেখতে গেল।

অবিনাশও?

না, অবিনাশ ওখানে নেই। ছিল, ছায়ার সঙ্গে কী যেন ঝগড়া করে চলে গেছে।

কীসের ঝগড়া?

কে জানে। ওর মতলব বোঝা আমার কম্ম নয়।

তোকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

কাল জ্বর হয়েছিল রাত্রে। কুচ্ছিৎ স্বপ্ন দেখেছি। মাথার ঠিক মাঝখানে খুব ব্যথা হচ্ছে আজ। তোর কাছে টাকাকড়ি আছে কিছু?

কেন, ওষুধ কিনবি?

হ্যাঁ! অনেক দিন, দিন সাতেক খাইনি। একটা পয়সা নেই হাতে। দিন সাতেক অফিস-টফিস যাচ্ছি- ।

চল যাই। বাংলা-টাংলা হতে পারে, অল্প আছে। কিংবা কলাবাগানেও যেতে পারি। আমারও খুব ইচ্ছে করছে সারা দিন।

পরীক্ষিৎ হাত দিয়ে কপালটা টিপছিল। সত্যি খুব ব্যথা হচ্ছে বুঝতে পারলাম। ব্যথাটা কী রকম রে? ডাক্তার দেখাবি নাকি?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জানিস তাপস। বছর খানেক আগে যে-অনিমেষের ওখানে ব্রিজ থেকে পড়ে মাথা ফেটেছিল, এত দিন পর আবার ঠিক সেইখানে ব্যথা হচ্ছে।

সেলাই গণ্ডগোল হয়েছিল নাকি? অনেক সময় ও-থেকে বিচ্ছিরি জিনিস হয়।

পরীক্ষিৎ আমার দিকে রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকিয়ে অসহায় গলায় বলল, আমি অবিনাশকে খুঁজছি। ওর কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস না করলে, আমার ব্যথা কমবে না, আমি জানি।

অবিনাশ কী করবে?

এত দিন পর, জানিস, আমার মনে হচ্ছে, আমি কি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, না অবিনাশ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

যাস শালা, তোর কি মাথা খারাপ! তুই এক-একবার এক-এক রকম বলিস।

কিন্তু অ্যাদ্দিন বাদে, এ-কথাটা আমার মনেই বা হল কেন? আর, মনে হওয়ার পর থেকেই মাথার যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে।

কিন্তু অবিনাশ যদি তোকে ফেলে দিয়ে থাকে, তবেঅবিনাশই আবার বাঁচিয়েছে - একথাটাও জেনে রাখিস। আমি ছিলাম সেখানে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? অবিনাশ আমাকে কী-রকম এড়িয়ে এড়িয়ে পালাচ্ছে? বহু দিন ওর সঙ্গে ভাল করে কথাই হল না। দেখা হলেও ভিড়ের মধ্যে চালাকি করে অন্য কথায় চলে যায়।

অবিনাশ তো বলছে, ও সরল, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে চায়। লেখা-ফেখার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করে দীর্ঘ সুখী জীবন কাটাবে।

কিন্তু যে-রকমভাবে দিন কাটাচ্ছে, সেটা কী?

ওটা একেবারে দাগি আসামি। সরলতা মানে যে ওর কাছে কী, তা বোঝা অসাধ্য। মায়াকে নিয়ে কী কাণ্ড করেছে, কে জানে!

মায়াকে নিয়ে।

তুই জানিস না, মায়াকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবে ঠিক করেছিল। মায়া হঠাৎ হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে। তার পরেও অবশ্য মায়া ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়াকে নিয়ে সম্ভবত ও একটা গভীর গণ্ডগোল পাকাবে। (এ গল্পটা সম্পূর্ণ বানিয়ে বললাম পরীক্ষিতের কাছে। কেন বানালাম, কী জানি। সম্পূর্ণ অজান্তে অবিনাশ ও মায়া সম্বন্ধে এই কাহিনি আমার মুখ থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে এল।)।

না, গণ্ডগোল মায়াকে নিয়ে না, অন্য এক জনের সঙ্গে। পরীক্ষিৎ বলল।

কে?

তোকে বলে লাভ নেই, তুই কোনও জিনিস ভাল করে ভেবে দেখতে চাস না। তোর কাছে জীবন মানে এই মুহূর্তে বসে থাকা, কাল কিংবা ভবিষ্যতে কী করবি, তোর কোনও ধারণাই নেই।

চল, উঠি।

অবিনাশকে তুই-ই বেশি পাত্তা দিয়েছিলি। ওকে হিরো বানিয়েছিস। ওর মধ্যে কী আছে? শুধুই স্টান্টবাজি। ওর সঙ্গে আমার আলাদা বোঝাঁপড়া আছে। কেন আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, জানতে হবে।

জানতে হবে –এই কথাটা পরীক্ষিৎ সন্ত-পুরুষের মতো শান্ত গলায় বলল, যেন ওর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের তৃষ্ণা। আমি বললাম, চল, কোনও ডাক্তারের কাছেই যাই। আমার কাছে গোটা আষ্টেক টাকা আছে।

থাক, কাল কি পরশু যাব। আজ চল কিছু খাই। ভাল লাগছে না। তবে ওই আট টাকাহ রচ করতে পারবি তো? আমার কাছে কিছু নেই কিন্তু।

চল, অন্য কেউ আসবার আগেই উঠে পড়ি।

পরীক্ষিৎ ক্ষেপে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানেকেরমধ্যেই সব টাকা চেটেপুটে শেষ করে দিল। খালাসিটোলা বন্ধ হয়ে যেতে পরীক্ষিৎ বলল, চল, টালিগঞ্জে শশাঙ্কর কাছে যাই।

বেরিয়ে পরীক্ষিৎ তীরের মতো ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল, আবার লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে বলল, আমার শরীর জ্বলছে, তাপস।

পরীক্ষিতের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে, চোখ দুটি ছল ছল, সারা মুখে শুধু প্রহরীর তলোয়ারের মতো নাকটা জেগে আছে। বুঝলাম, ওকে শয়তান ভর করেছে। বললাম, শশাঙ্কর কাছে কেন?

শশাঙ্কর এক বন্ধুর দোকান আছে। মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করে খাওযায়। চল না, আঃ, চল না, কেন দেরি করছিস?

শশাঙ্ক নিরীহ চেহারার একটি বদমাইসির ডিপো৷ কাতর মুখভঙ্গি করে দুনিয়ার যত খারাপ খারাপ কথা বলে। ভালই লেখে, কিন্তু ওর নভেল আজ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতে পাবিনি।

পরীক্ষিৎ বিকট মোটা গলায় শশাঙ্ককে ডেকে নামাল। স্পষ্ট বোঝা গেল, শশাঙ্ক লিখছিল। কারণ, ওর বিব্রত ও বোকামিভরা মুখখানা দেখেই মনে হল ওর সমস্ত বুদ্ধি এই মুহূর্তে ও ওর গল্পের নায়ককে ধার দিয়েছে।

অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে শশাঙ্ককে জড়িয়ে ধরে পরীক্ষিৎ বলল, তুই কেমন আছিস, শশাঙ্ক, কত দিন তোকে দেখিনি, হঠাৎ বড় দেখতে ইচ্ছে করল তোকে। এবং এই কথা বলার পর হুড় হুড় করে বমি করে দিল ওর গায়ে। পরীক্ষিৎকে শশাঙ্কর হাতে সঁপে দিয়ে আমি একা বেরিয়ে এলাম।

.

যত দূর সম্ভব মনে করে করে তেরোই এপ্রিল ১৯৬১-র কথা লিখছি। কিন্তু কী বাদ গেল? হ্যাঁ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময় আমি অশোকের দিকে বিস্মিত ভাবে আর একবার তাকিয়েছিলাম। চোখাচোখি হল, হঠাৎ মনে হল, অশোক কাঁদছে। হা ঈশ্বর, আজ পর্যন্ত অশোকের রহস্য জানা হল না। তারপর থেকে অশোকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত আর দেখা হয়নি। অশোক যে-মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, তাকে আমি কস্মিনকালেও চিনতাম না। সুতরাং সে-দিক থেকেও কোনও গণ্ডগোলের কারণ নেই। অশোক, তোর কাছে করে কী অপরাধ করেছি, মনে পড়ে না, তবু কোনও এক দিন আমাকে ক্ষমা করিস।

তেরোই এপ্রিলের কথাই-বা কেন নিলাম, জানি না। কোনও নতুনত্ব নেই, তবু সে-দিন বাড়ি ফেরার পথে যে অনুভব হয়েছিল, সেই জন্যই দিনটা মনে আছে। মনে আছে মন্থর পায়ে মেসে ফিরছিলাম। মেসে কেন ফিরব, এর কোনও উত্তর জানা ছিল না। যেমন মেস থেকে বেরুবার সময় কোথায় যাচ্ছি জানতাম না। যেন পাশাপাশি দুটো ট্রেন ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে চলেছে, যে-কোনও একটার জানালা থেকে সম্পূর্ণ গতিহীনতা কোটি কোটি মাইল দূরে যে-নক্ষত্রের আলো এখনও পৃথিবীতে পৌঁছায়নি, বা যে-নক্ষত্রের মৃত্যুসংবাদ এখনও পৃথিবীতে আসেনি, এখনও পরীর চোখের মতো জ্বলছে –যেন আমিও সেই রকম। আমি

যে পৃথিবীতে আছি, কেউ জানে না। আমার মৃত্যুর পর জানা যাবে, আমি পৃথিবীতে একা হেঁটে গিয়েছিলাম। আমি এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার সময় সেই গাছটাকে প্রণাম করেছিলাম। আমি একা অন্ধকারে, কেউ শ্রোতা নেই জেনেও আপন মনে একটা গান গেয়েছিলাম। আমার চটি ছিঁড়ে যেতে আমি চটিজোড়া কোলে নিয়ে খালিপায়ে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলাম, আমি জানি, সব দৃশ্যই অদৃশ্য জগতের উলটো পিঠ। মনে পড়েছিল, আমি প্রত্যেক দিন মাথার বালিশ ছাড়া বিছানায় শুই।

মেসে ফেরার কথা মনে পড়লেই রামসদয়ের কথা মনে পড়ে। আমার রুমমেট রামসদয়। বড় ভাল লোকটা, কিন্তু এমন অপমান করেছিল এক দিন। এক দিন অনেক রাত্রে ফিরেছি, রামসদয় জেগে ছিল। আমাদের ঘরের পাশেই বাথরুম। বাথরুমে মুখ ধুতে গেছি। সেদিন আমার এমন কিছু নেশা ছিল না, শরীর সুস্থ ছিল, কিন্তু বাথরুমে ঢুকে আমি চিৎকার করে ভয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে পড়ে গেলাম। আমি দেখলাম, বাথরুমে একটা মানুষের মুণ্ডু ঝোলানো রয়েছে, শরীরহীন একটা মুণ্ডু, অভিব্যক্তিহীন, ভাবলেশহীন চোখ। মুখখানা ও-রকম নিস্পৃহ বলেই বীভৎস। রামসদয় ছুটে এসে ঢোকার আগেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ভয়ে আর মুখ ফেরাইনি, জিজ্ঞেস কবলাম, ওখানে কী, কী, কীসের মুখ ওটা? আমি এত স্পষ্ট দেখেছিলাম যে, সন্দেহ করিনি।

রামসদয় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ওঃ এই, চলুন, শোবেন চলুন।

কার মুখ?

কিছু না, আমার দোষেই –।

আমি ফিরে তাকালাম, তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেমন লজ্জা হল। রামসদয় দাড়ি কামাবার জন্য বড় আয়নাটা এনে ঝুলিয়েছিল, বদমাস টেকোটা আর আয়নাটা ঘরে নেয়নি। মাঝ রাতে মাতালকে ভয় দেখাবার জন্য বাথরুমে ফাঁদ পেতেছে। রামসদয় আমার হাত ধরে নিয়ে এল ঘরে, বিছানার চাদরটা ঝেড়ে আমাকে শুইয়ে দিল। আমি সাহিত্যিক বলে লোকটা আমাকে একটু খাতির করে। আলো নিভিয়ে দিই? রামসদয়

জিজ্ঞেস করল, তারপর অল্প একটু হেসে বলল, শেষকালে নিজের মুখ দেখেই ভয় পেলেন?

শেষ কথাটাই মারাত্মক। দু'গালে পাঁচটা থাপ্পড়ের মতো। লজ্জায় কিংবা ভয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। নিজের মুখ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আমার নিজের মুখ সব চেয়ে চেনা। ঊনত্রিশ বছর ধরে যে মুখ দেখেছি। দাড়ি কামাবার সময় বা কতবার পানের দোকানের আয়নায় বা ট্যাকসির কাঁচে। গ্রুপ ফটোতে, লোকে যেমন বলে মেয়েদের চোখের মণিতে আমি এ মুখচ্ছবি আমি কতবার দেখেছি। তবু চিনতে পারলাম না। ভয় পেলাম, যদিও চোখে এমন কিছু রঙ ছিল না। এই রকম হেঁদো দার্শনিক হা হুতাশ কিছুক্ষণ করে আমার ভয় দেখানো মুখখানা বালিশে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর মাস দুয়েক কোনও স্বপ্ন দেখিনি পর্যন্ত।

নাঃ, এবার শেষ করা যাক। আর ভাল লাগছে না। তারপর কী হল সেই রাতে, পরীক্ষিৎকে ছেড়ে আসার পর? ওঃ সেই রাত, সেই –একা একা অনেকখানি হেঁটে এসেছিলাম, চৌরঙ্গীতে বড় রাস্তা ছেড়ে হেঁটে এলাম মাঠ দিয়ে। একবার পকেটে হাত দিলাম, সিগারেট নেই, কিছুই নেই, শুধু মাত্র একটি পাঁচ পয়সার ঢেলা পড়ে আছে। আবার সেই জঞ্জাল, কাল সকালে আবার ওই নিয়ে দুশ্চিন্তা। হাসি পেল, বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার ওপর পয়সাটা বসিয়ে জোরে একটা টুসকি মেরে বললাম, যাও সখা, বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে। পয়সাটা ডানা মেলে অন্ধকারে উড়ে গেল। পরক্ষণে নিজের বোকামিতে নিজের আঙুল কামড়ালাম। পাঁচটা নয় পয়সা ওড়াব, এমন অবস্থা আছে নাকি আমার? সেটাকে খুঁজতে লাগলাম। জ্বালতে জ্বালতে এগোচ্ছি, খালি পা কাদায় বসে যাচ্ছে, করে বৃষ্টি হল কী জানি!

পয়সা খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর চলে এসেছিলাম। হঠাৎ একটা পুকুর। বেশ বড় জলাশয়, চারদিকে মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া। পরিষ্কার জায়গাটা, অল্প জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে পরিষ্কার জল। এখানে এরকম পুকুর ছিল, কোনও দিন তা জানতাম না। চারদিকবাঁধানো, কোথাও এক ছিটে কাদা নেই, পুকুরের চার কোণে পাঁচটা গাছ, কোথা

থেকে হাওয়া এসে ওদের পাতা দোলাচ্ছে। আহা, এমন সুন্দর জায়গা কলকাতায় আছে। কোনও দিন জানতে পারিনি। এমন পরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী যেন বহুবার স্বপ্নে দেখেছি। হাত-পা এবং জামা-প্যান্ট, পয়সা খুঁজতে গিয়ে জল কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হল, এই পুকুরে ভাল করে ধুয়ে নিই। এমনকী, এই পুকুরে স্নান করা যেতে পারে, একা একা অন্ধকারে সাঁতার কাটতে খুব ভাল লাগবে। এগুতে গিয়ে অদৃশ্য কোনও কিছুতে জোর ধাক্কা খেলাম। বেশ শক্ত কোনও কিছুতে মাথা ঠুকে গেল। কী? তাকিয়ে দেখলাম কিছু নেই। আশ্চর্য, তবে কি হাওয়ায় ধাক্কা লাগল! ভয় হল, মানুষের মৃত্যুকালে হাওয়া পর্যন্ত কঠিন হয়ে যায় শুনেছি। আবার সামনে হাত বাড়ালাম। দুই হাত, কোনও কঠিন অদৃশ্য দেওয়ালে ধাক্কা লাগল। নেশায় কিচুর হয়ে আছিনাকি? মাথা ঠাণ্ডা করে দাঁড়ালাম। আবার হাত বাড়ালাম। সেই অদৃশ্য কঠিন বাধা। এবার বুঝতে পারলাম, কাঁচ বা মাইকা বা শক্ত প্লাস্টিক বা ট্রান্সপারেন্ট কঠিন কিছু দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। কী অসম্ভব কাণ্ড! একটু পাশে সরে যেতেই একটা নোটিশ চোখে পড়ল।

রিজার্ভড পন্ড
পোহকিন্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংরক্ষিত পুষ্করিণী

এই পুষ্করিণীর পাড়ে বা একশো গজের মধ্যে কাহারো বসা বা বিশ্রাম করা নিষেধ। বিষ প্রতিষেধক গবেষণার্থে এখানে জলজ সর্পের চাষ করা হয়। সাবধান! যদিচ এই সর্পগুলি বিষহীন, কিন্তু ইহাদের সন্ধানে দূর-দূরান্ত হইতে বিষধর সর্প আসিতে পারে। সম্ভব হইলে এই পথ পার হইবার সময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া যাইবেন। জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।
–অনুমত্যানুসারে

পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোনও মাতাল বা গেঁজেলের দলবলের কাণ্ড এসব। বাংলাদেশে কী সাপের অভাব যে চাষ করতে হবে? এই রকম এত বড় একটা পুকুর-সাইজের কাচের জার বসিয়ে রেখেছে এখানে। কলকাতা শহরে প্রত্যেক দিন কেন অসংখ্য লোক সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে, এবার বুঝলাম। খবরের কাগজে প্রত্যেক দিনই

কলকাতায় সর্পাঘাতে মৃত্যুর খবর থাকে। তার মানে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে সাপ আসে। কিংবা এমনও হতে পারে, পুরোটাই ধাপ্পা। পুকুরটাকে সুন্দর রাখবার জন্য এরকম একটা বাজে নোটিশ সটকেছে। আমি কাচের দেয়ালে দেয়ালে হাত দিয়ে পুকুরটার চারপাশে ঘুরে এলাম। কোথা দিয়েও ভেতরে যাওয়া যায় না, বেহুলার বাসরঘরের চেয়েও শক্ত। চার কোণে পাঁচটা গাছ হাওয়ায় দুলছে। সমান করে ছাঁটা বুক-সমান মেহেদির বেড়া। মার্বেল পাথরে বাঁধানো পাড়। পরিষ্কার জল। ঢেউহীন। মেঘ ভেঙে মাঝে মাঝে চাঁদের আলো। ওখানে অসংখ্য সাপ ও সাপিনি খেলা করছে। ভেতরে ঢোকার অসম্ভব ইচ্ছে হতে লাগল আমার। কাচের দেয়ালে গালটা ছোঁয়ালাম। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আমি জ্যোৎস্না ও সাপের খেলা দেখতে লাগলাম। অজান্তেই। অজান্তেই একবার যেন বিড় বিড় করে বললাম, দূর-দূরান্ত থেকে আর তো কেউ আসেনি। শুধু আমি একাই এসেছি। কাল অন্য সবাইকে ডেকে এনে দেখতে হবে, একথাও মনে পড়ল।

৬. হেমকান্তি

হেমকান্তি

প্রিয় বিমলেন্দুবাবু,

আপনাকে এই চিঠি লিখছি অনেক ভেবে, ভাবনার পর ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত, কারণ আর হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দেরাদুনে আমার এক আত্মীয় আছেন, প্রথম কিছু দিন তার ওখানে থাকব, তারপর আরও দূরে সরে গিয়ে, ইচ্ছে আছে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। না, আমার ঈশ্বর-দর্শন হয়নি, ঈশ্বরকে জানার তৃষ্ণা জাগেনি, সাধু-সন্ন্যাসী হতে চাইনা, তবু কোথাও আত্মপরিচয়হীন হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হল। এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় নেই। চেনা লোকদের থেকে দূরে, একটা অন্য রকমের, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে থাকা যায় কিনা দেখি। আমার যদি বেশি অর্থ বা কিছু উদ্দীপনা থাকত তাহলে আমি হয়তোইতালি কিংবা কোনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে চলে যেতাম, সেখানেও হয়তো অন্য মানুষ হওয়া যেত, কিন্তু তার চেয়ে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চল সহজ মনে হল। এখানে আমার বেঁচে থাকার কোনও স্বাদ পাচ্ছিনা, আমার মৃত্যুও খুব মূল্যবান নয়।

জানি না, আপনি আমার এ চিঠি পড়ে বিরক্ত হবেন কি না, কিন্তু এ চিঠি আমাকে লিখতে হবে, কারণ, আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কতগুলি অভিযোগ এই প্রথম আমি জানাতে চাই। আমি আপনাদের মধ্যে গিয়েছিলাম বেঁচে ওঠার জন্য, আপনারা লেখক, আপনারা জীবন সৃষ্টি করছেন, আমি ভেবেছিলাম আপনারা আমার মধ্যেও জীবন এনে দিতে পারবেন। বেঁচে থাকার জন্য আমার খুব বেশি দাবি ছিল না, আমার দরকার ছিল, শুধু খানিকটা বিদ্যুতের মতো ঝলক, ঘুমন্ত মানুষের কানের কাছে ‘ডাকাত ডাকাত’ বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে যেমন আচমকা ছিটকে ওঠে, আমিও সে-রকম চেয়েছিলাম, আমি

আপনাদের মুখের কাছে কান পেতে রাখতাম, কিন্তু আমি জেগে উঠতে পারলুম না তবুও। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব কিনা জানিনা, কিন্তু আমার একটা নতুন মানুষ হওয়া খুব দরকার, খুবই দরকার ছিল, নইলে সাধারণ সুস্থ মানুষের মধ্যে আমার আর থাকা চলে না।

আমি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়েস উনিশ, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের আগে, তখন যদি মৃত্যু হত, তাহলেই বোধহয় ছিল ভাল, আমার মনে হয় তাহলে দ্বিতীয় বার বেঁচে থাকা আমার পক্ষে এতটা সমস্যা হত না। আত্মহত্যার কথা শুনলেই তার কারণটা শুনতে ইচ্ছে হয়, জানিনা আপনারও হয় কিনা, অবশ্য সেকারণ শুনলে আপনারা এখন হাসবেন, আপনারা আধুনিক লেখক। আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, মনে হত তাকে না পেলে আমি বাঁচব না। আমি রাত্রে জ্যোৎস্নায় বসে তাকে চিঠি লিখতাম। অনেক দিন, মনে আছে, মেয়েটি পাশে বসে আছে আর আমি তাকে চিঠি লিখছি। তার জন্মদিনে এক শিশি আতর কিনে দিয়েছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হত প্রত্যেক দুবেলা, যত না কথা বলতাম, তার চেয়ে চিঠি লিখতাম বেশি, চিঠি লিখে ওর ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতাম, বলতাম, তোমাকে ও চিঠি পড়তে হবে না, বুকের সঙ্গে লেগে থাক, আমার চিঠির ভাষা তাহলেই তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে। আঠারো-উনিশ বছরের কোন ছেলে না বিশ্বাস করে যে বুক মানেই হৃদয়। আর হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়া মানেই হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া। আমি কখনও মেয়েটিকে শরীর দিয়ে ছুঁতে চাইনি, আমি ভাবতাম, আঙুল ছোঁয়ালেই বুঝি ফুলের পরাগের মতো ওর গা থেকে রঙ উঠে আসবে। শুধু ক'দিন ওর দু'পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, ও কী, ও কী, ও কী, বলে বালিকাটি চেঁচিয়ে উঠলেও ছাড়িনি। ওর পায়ে আমার মুখ ঘষেছি, বার বার ইচ্ছে হয়েছে, আমার চোখে যদি অনেক জল থাকত আমি চোখের জল দিয়ে ওর পা ধুয়ে দিতাম। আপনি ভয় পাবেন না বিমলেন্দুবাবু, আপনাকে মারি করেলির লেখার মতো কোনও প্রেমের কাহিনি শোনাতে বসিনি। কারণ আজ আমি মেয়েটির নামই ভুলে গেছি, রেণু, রিনা বা রানি, যে-কোনও একটা হতে পারে। চোখ বুজলে মেয়েটির মুখও মনে পড়ে না। সে ছিল আমার সমবয়সি, হঠাৎ ওর বিয়ে ঠিক হল, মেয়েটি আপত্তি করল না। ছেলেটি ওদের বাড়ি আসত, বেশ

ভাল ছেলেটি, আমারও ওকে খুব ভাল লাগত, মেয়েটিকে খুব খুশি মনে হল। আমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিল, তুমি মন খারাপ করো না, ভাল করে পড়াশুনো করো। তুমি এখনও কত ছেলেমানুষ, আমাকে মনে রাখবে তো?

এইসব। ভেবে দেখুন, এই জন্য আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। এ তো প্রতি দিন পৃথিবীতে দু'বেলা ঘটছে। আসলে সাঁতার না জেনেও আমি বন্ধুদের সঙ্গে একবার পুরীর সমুদ্রে অনেক দূর গিয়েছিলাম। আমার আত্মহত্যার চেষ্টাও অনেকটা সেই রকম। জানি না, আপনারও ছেলেবেলায় এ-রকম কোনও অভিজ্ঞতা আছে কি না। মেয়েটার বিয়ে হবার পর কিছুদিন আমার কিছু মনে হয়নি, একটু ছোট দুঃখ ছাড়া। তারপর একট পূর্ণিমা কেটে গেল, একটা অমাবস্যা, আবার পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় চিঠি লেখার কথাও মনে পড়েনি। হঠাৎ এক দিন দুপুরবেলা আমার সারাশরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠল, যেন প্রত্যেকটি লোমকূপ দিয়ে তাপ বেরুতে লাগল, আমার স্নায়ুমণ্ডলী ও শিরাগুলি দপ দপ করতে লাগল অসম্ভব অভিমানে। জীবনে সেই প্রথম ও মাত্র একবার বুঝতে পারলাম, কাকে বলে প্যাশান। ইচ্ছে হল, একটা ছুরি হাতে নিয়ে খোলা রাস্তা দিয়ে তক্ষুনি ছুটে যাই। প্রেমে ব্যর্থতা মানুষকে বড় অহঙ্কারী করে, তখন কেউ কেউ বিরাট শিল্প সৃষ্টি করতে পারে বা শিল্পকে ভাঙতে, অর্থাৎ মানুষ খুন, বা নিজেকে ভাঙে। আমি শেষেরটা বেছে নিলাম। দুপুরবেলা বাড়িতে শুধু মা আর আমি, আমার দিদি তখন হাসপাতালে। ছাদে ঘরে পা-জামাটার নিচের দিকটা কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটা শুকনো গাছের মতো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাব। কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা তেমন সহজ নয়। সেই থেকেই আমি রিয়েলিটি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

প্রথম আগুনের আঁচ গায়ে লাগতেই আমার মনে হল, না না না, অসম্ভব অসম্ভব। কিন্তু আগুন নেভানো সহজ নয়। দেশলাইয়ের কাঠির খোঁচায আগুন যে-কেউ জ্বালতে পারে আজ, প্রমিথিউসের আত্মদানে, কিন্তু নেভানো শিখতে হয়। আমি হাতচাপা দিয়ে আগুন নেভাবাব চেষ্টা করলাম, হাত ঝলসে গেল, আমি ছুটতে লাগলাম, উদভ্রান্ত, মনে হল দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমার জীবন- মৃত্যু নির্ভর করছে। কিন্তু আমার বেছে নেবার

সময় নেই, আমি ছুটে নিচে নেমে এলাম। আগুন আমাকে তাড়া করে এল, বস্তুত আগুন আমার সঙ্গেই ছিল। দোতলার বারান্দায়।

থাক, ও-সব আর লিখতে বা মনে করতে আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি লেখকও নই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে গেলাম খুবই আশ্চর্য ভাবে, সেই বেঁচে ওঠার মতো বিস্ময় আর কিছু নেই আমার কাছে। সেই বেঁচে ওঠা আমাকে চিরকালের মতো হতভম্ব করে দিল।

আকস্মিক ভাবে বেঁচে ওঠার প্রচণ্ড ধাক্কা আমাকে কিছু দিন ভাল রেখেছিল। মন দিয়েছিলাম পড়াশুনোয়। বেশ ছিলাম সাধারণ মানুষ। হাসির কথায় হাসতাম, কখনও ক্রুদ্ধ হয়েছি, কত সময় সাধারণ দুঃখ পেয়েছি। তারপর চার-পাঁচ বছর বাদে আমার প্রেত আমার কাছে ফিরে এল। এসে কৈফিয়ৎ দাবি করল। আমি বুঝতে পারলাম, এ জীবনটা আমার অতিব, এটা ঠিক আমার নয়।

মানুষ একটাই জীবন পায়, যেমন ইচ্ছে সেটাকে খরচ করে, কিন্তু আমি পেয়েছি দুটো, একটা আমি নিজের হাতে নষ্ট করতে গিয়েছিলাম, নিশ্চিত নষ্ট হয়েছিল, ও দো-তলার বারান্দা থেকে যখন আমি লাফ দিয়েছিলাম, তখন তো নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই গিয়েছিলাম। আমাকে কখনও খালি গায়ে দেখেননি। দেখলে শিউরে উঠতেন। আমার দু'পা, বুক-পিঠ জুড়ে কালো কালো দাগ। ও-রকম ভাবে পুড়লে কেউ বাঁচে না। আমি কী করে বেঁচে উঠলাম কে জানে! তাছাড়া আমার মুখে আঁচ লাগেনি বলে আমাকে দেখেও কিছু বোঝা যায় না। অর্থাৎ আমি একবার মরে গেছি। পরে যেটা পেলাম, আমার বাকি জীবন, এটার ওপর আমার আর কোনও অধিকার নেই, এমনকী আমি একে নষ্টও করতে পারি না। যেন আমাকে অন্য লোকের জীবন ধার দেওয়া হয়েছে। এই জীবন নিয়ে আমি কী করে বাঁচব যদি এর ওপর নিজের মতো করে মায়া না পড়ে, যদি পরের জামা পরার মতো সব সময় সাবধানে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার মায়া পাবার জন্য আমি চারদিকে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি রাজনীতিতে গিয়েছিলাম, ফিরে আসতে হল। রাজনৈতিক নেতাদের হওয়া উচিত কবিদের মতে, তার বদলে কবিরাই আমাদের দেশে পলিটিকস

শিখছে! আমি খেলাধূলায় গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, খেলাধূলার মধ্যে তার শরীর ছাড়া কোনও কথা নেই, ওরা অমরত্ব জানে না, ওরা জানে শুধু শারীরিক বেঁচে থাকা। আমি সাঁতার এমনকী খুঁষোঘুষি শিখতেও গিয়েছিলাম। আমার হল না, কেননা আমার শরীর কেটে রক্তপাত হলেও আমার ব্যথা লাগত না, মনে পড়ে যেত, এ শরীর নয়, আমার শরীরের সমস্ত ব্যথা আমি আগুন লাগিয়ে এক দিন ভোগ করেছি। গান-বাজনা করতে গিয়েও মন বসাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত এলাম সাহিত্যে। নিজে কিছু লিখতে শুরু করার আগেই আপনাদের মতো লেখকদের মধ্যে এসে পড়লাম। ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত বোধহয় আপনাদের মধ্যে এসে আমি বেঁচে যাব, আমার নতুন জীবনের প্রতি মমতা আসবে।

কিন্তু আপনারাও আমাকে নিরাশ করলেন বিমলেন্দুবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আপনাদের প্রত্যেকের জীবন বিষম স্বার্থপর, জীবনের যে-কোনও সুযোগ-সুবিধে সম্পর্কেই আপনারা অত্যন্ত সজাগ, কিন্তু আপনাদের রচনা মিথ্যাভাষী। আপনাদের লেখার মধ্যে ঔদাসীন্য, নির্জনতা, এ-সব ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ব্যগিত জীবনে আপনারা কেউ সে-রকম নন। আপনারা কে কতক্ষণ একা থাকেন, জানি না, সব সময় দেখি হই-হুল্লোড়, বান্ধবসভা আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কখন সময় পান? নাকি সেই জন্যই সব অনুভবের কথা বানানো?

মৃত্যু, ধ্বংস, নীতিহীনতা–এই হয়ে উঠেছে আপনাদের বিষয়। তাপসবাবুকে দেখেছি, কপালে একটা ব্রন উঠলে কত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, সাতবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যান অথচ তার উপন্যাসের নায়করা উদাসীন, ক্যানসার বা সিফিলিসের রোগী। আপনিও বিমলবাবু, আপনার কবিতায় মেয়ে পুরুষরা অত আত্মহত্যা করে কেন? অথচ আপনি জীবনে হয়তো সামান্য আত্মত্যাগও করেননি কখনও। আমি মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি, আমি জানি মৃত্যু কী-রকম, তাই আমি জীবন্ত মানুষ দেখতে চাই। আপনি মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই না জেনে মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। কবিতা হল এক ধরনের

প্রার্থনা, আপনার কবিতায় কীসের প্রার্থনা? মৃত্যুর মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই, অনেকটা একঘেয়ে।

মৃত্যু, তিন রকম, ভেবে দেখতে গেলে। আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা বা আততায়ী, অথবা বিছানায় শুয়ে নানা জনের চোখের জল, দীর্ঘশ্বাসের নিচে। যাবার সময় কেউ কেউ বলে, ‘মা চললাম। এমন নিশ্চিন্ত সেই বলা যে, শেষতম যাত্রার আগে যেন সে কিছুই নিতে ভুলে যায়নি, চন্দনের টিপ পর্যন্ত না। আবার কেউ কেউ বাকরুদ্ধ চোখে প্রবল ভাবে চেয়ে থাকে, চোখ দিয়ে দু’হাত বাড়াতে চায়, যেন তার শেষ অস্তিত্ব চিৎকার করে, যেতে দিও না, আমাকে বাঁচাও, – আমি এই মাটির ঘরে বা রাজপ্রাসাদে, করমচার ঝোপের পাশে, জ্যোৎস্নায় আরও কিছুদিন থেকে যেতে চাই, যেতে দিও না, কোথায় যাবজানিনা, এখানে চেনা জিনিসগুলো কিছুই চেনা হয়নি, যেতে দিও না। এই। কিন্তু জীবন বহু রকম, অসংখ্য, অসংখ্য, আপনি কখনও বলতে পারবেন না, মানুষ এইভাবে বাঁচে। কেননা, প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ রকম তার নিজের। মাস্তুলের মাথায় বালক ঘুমোয়, সম্রাট অনিদ্রারোগী, খনির নিচে মাটি চাপা পড়ার তেরো দিন পর বেঁচে ফিরে এল মানুষ, প্রবল পিতৃশোকের মধ্যেও সিগারেট না পেলে মন চঞ্চল হয় কারুর, জানি নামহাশূন্যের রকেটে মানুষগুলো সত্যিই কী ভাবে। আমি এসেছিলাম বাঁচতে বিমলেন্দুবাবু, আপনাদের কাছে জীবনের একটা নতুন মুখচ্ছবি পেতে, দেখলাম, আপনারাও ভ্রষ্ট এবং জীর্ণ, পোকায় ধরা মৃত্যুবিলাসী। পরীক্ষিৎ লোভী, তাপস নিজেকে ঠকায়, অবিনাশ নিজেকে চেনে না, আপনিও মিথ্যে আত্মবিশ্বাসী।

ক্রমে আমার বুকের ভিতরের মৃত্যু আবার জেগে উঠল। এইভাবে মায়া-মমতাহীন ভাবে, পরের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মতো কেউ বাঁচতে পারে? আমি আমার শরীরেমড়ার গন্ধ পেতে লাগলাম। লোকজনের মধ্যে বসতে আমার ভয়, আমি সবার আড়ালে নিজের হাতটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকি। কেউ টের পায় না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই, পচা গন্ধ, বুঝতে পারি আমার শরীর পচে যাচ্ছে। একটা আত্মাহীন, মায়াহীন, ভালবাসাহীন শরীর কখনও বেঁচে থাকতে পারে না।

কয়েক দিন আগে একটু জিনিস লক্ষ্য করে আমি শিউরে উঠলুম, সম্প্রতি আমার শরীরে কয়েকটা নতুন তিল উঠেছিল, ঠিক কালো নয়, লালচে বাদামি রঙের। জায়গাগুলো একটু একটু উসখুস করত। একটা তিল খুঁটতে গিয়ে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। তিলটা জীবন্ত। বুঝতে পারলেন, তিলটা জীবন্ত? একটু খুটতেই সরে গেল। অবাক হয়ে আর একবার আঙুল ছোঁয়াতে সেটা আর একটু সরে গেল। লক্ষ্য করলাম, ওটা তিল নয়, একটা পোকা, আমার শরীর থেকে জন্মেছে, ক্ষুদে অক্টোপাসের মতে, প্রবলভাবে চামড়া আঁকড়ে আছে–সবগুলো তিলই এই। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। বুঝতে পারলাম, আর নয়। আমার শাস্তি শেষ হয়েছে। জানি, আপনি কী বলবেন বা ডাক্তার কী বলতে পারে এ ব্যাপারটা শুনে, ও কিছু নয়, এক ধরনের চর্মরোগ, কোনও একটা পাউডার লাগালেই সেরে যাবে। জানি সেরে যায়, অন্য লোকের সারে, কিন্তু আমার নয়। আমার এগুলো, পচা মাংসে যে-পোকা পড়ে- তাই। আর এখানে নয়, আমি বুঝতে পারলাম। আমি বাঁচতে এসেছিলাম, আপনারা আমাকে দূরে ঠেলে দিলেন। জানি না আমার কোথায় স্থান হবে।

—আপনাদের হেমকান্তি

মায়া,

তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছে, জানি না এ চিঠি তোমাকে কোনও রকম আঘাত দেবে কি না, কারণ আমি এটুকু অন্তত জানি নিশ্চিত যে, আমি নিজেকে কিছুতেই সম্পূর্ণ বোঝাতে পারব না। তোমাকে কোনও আঘাত দিতে চাই না। মায়া, আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই অন্য কোনও কথা মাথায় এসে জটিল হবার আগেই তোমাকে একথা জানালাম।

তোমাদের বাড়িতে যাবার তৃতীয় দিনে তুমি আমার সামনে এসে বলেছিলে, আপনার ওটা কীসের বোতাম, চন্দনের? বলে তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে বোতাম দেখছিলে। সে প্রায় এক বছর আগে, তখনও তুমি অনেকটা শিশু ছিলে, এমন পূর্ণ যুবতী হওনি, তাই ওই অকপট হাত রেখেছিলে আমার বুকে, আমার বুকের মধ্যে যে হৃৎস্পন্দনের কোনও

শব্দ নেই, তা-ও তুমি টের পাওনি। আমি মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ছিলাম। তুমি বললে, আপনি বাইরে কার ওপর রাগ করে এসে এখানে গভীর? একটু পরে তুমি দিদিকে বলেছিলে, ওই ফর্সা লোকটা খুব অহংকারী। আসলে আমি মাথা নিচু করে তোমার পায়ের দিকে দেখছিলাম, কী সুন্দর ঝকঝকে দু'টি পা, যেন তুমি আমার স্মৃতির ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, রঙ লাগাওনি অথচ প্রত্যেকটি নখে লাল আভা, গোড়ালি একটুও ফাটা নয়, একছিটে ময়লা নেই কোথাও। কত দিন পর আমার বুকে একটি মেয়ের হাত, একথাও মনে পড়েনি। তখন কোনও কথার উত্তর দেবার আমার সময় ছিল না। সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটিকে যদি আমি ভালবাসতে পারি, তবে হয়তো আমি বেঁচে উঠতে পারি আর একবার। কিন্তু তবু যে কেন আমি শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে রইলাম জানি না। ভালবাসার অনিচ্ছা, না বেঁচে থাকার অনিচ্ছা, কী জানি।

একদিন হঠাৎ তোমাদের ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম, অবিনাশ তোমার হাত ধরে টানছেন, আর তুমি বলছ, ছাড়ুন, ছাড়ুন! আমাকে দেখেই অবিনাশবাবু হাত ছেড়ে দিয়ে যেন কী একটা হাসির কথা বললেন। তোমরা দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলে। এমন হতে পারে, তোমার হাতের মুঠোয় কোনও জিনিস লুকোনো ছিল, অবিনাশবাবু কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, বা হাত ধরে তোমাকে টেনে নিতে চাইছিলেন ওর বুকে। আমাকে দেখে থেমে গেলেন এবং একটু বিব্রত বা দুঃখিত না হয়ে পরবর্তী হাসির কথাগুলি বলেছিলেন। আসলে দুঃখিত হয়েছিলাম আমি, মৃত্যুর চেয়ে বড় দুঃখ। আমার খুব ভাল লেগেছিল, ওই রকম প্রবল ভাবে টানাটানি ও হাস্য। আমাকে দেখে থেমে যেতেই আমি বিমূঢ় ও লজ্জিত হয়েছিলাম, ফিরে যাবার জন্য এক-পা তুলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, আবার শুরু হোক, না হয় আমিই তোমার হাত ধরে টানি, প্রবল ভাবে বুকের ওপর নিয়ে আসি, তোমার হালকা শরীরটা শূন্যে তুলে লুফে নিই, তোমার ঠোঁট থেকে হাসি চলে আসুক আমার ঠোঁটে, কিংবা অবিনাশের, হাওয়ার হুড়োহুড়ির মধ্যে আমরা তিন জন– অনেকক্ষণ বাদে লক্ষ করলাম, আমি আমার হাত দুটো পকেট থেকেই বার করিনি, ঘরের মাঝখানে বিকট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আমি চুপ করে। ইচ্ছে হল, তখুনি ছুটে পালিয়ে যাই, তার বদলে তোমার দিদির হাত ধরে সরবতের গ্লাস নিলাম।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে, দোলের দিন। দল বেঁধে সবাই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল, গগনবাবুআমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে-দিনও অবিনাশবাবুকে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। সবাই ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করছে, রঙের স্রোত আর আবিরের ধুলো চারদিকে, কিন্তু আমি যোগ দিতে পারিনি, এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম অস্পৃশ্যের মতো। সবাই সেদিন আমাকে গঞ্জনা দিয়েছিল, আমাকে জোর করে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। তবু পারিনি, তবু পারিনি ওদের মতো ভোলা হতে, লাল রঙকে ব্যবহার করতে। এক ফোঁটা আবির বুঝি দিয়েছিলাম সকলকে, সেই প্রথম আমি তোমার কপাল ছুঁয়েছিলাম। কত ব্যর্থ সেই ছোঁয়া। অবিনাশবাবু তোমার সারা মুখ ভরিয়ে অবলীলায় তোমার ব্লাউজের মধ্য দিয়ে পিঠে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, সকলের সামনে তোমার জামার মধ্যে পিঠেঅবিনাশের হাত ঘুরতে লাগল, কোনও দ্বিধা নেই। আড়ষ্টতা নেই। আ, আমার এত আনন্দ হয়েছিল। মানুষকে বেপরোয়া, স্বাধীন, গ্লানিমুক্ত দেখলে আমি তার আত্মা থেকে ফুলের মতো গোপন সৌরভ পাই। আমারও ও-রকম হতে ইচ্ছে হয়, মনে মনে বলি, ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে আর একবার বাঁচার সুযোগ দাও, আমাকে ও-রকম স্বাভাবিক, জীবন্ত করো। হয় না, আমি পারি না। কেন পারি না মায়া, তা তোমাকে আর এখন বলা যাবেনা।

কিছুদিন আগে তোমাদের বাড়িতে সিনেমার টিকিট নিয়ে একটা লটারি হয়েছিল তোমার সঙ্গে কে যাবে তাই নিয়ে। আমার সে-দিন খুব মাথা ধরেছিল, খুব মন খারাপও লাগছিল, হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল আমি যাই তোমার সঙ্গে। তাহলে আমার সব রোগ সেরে যাবে, আমি অন্ধকারে তোমার পাশে বসে তোমার যোগ্য হয়ে উঠব। কে যেন একবার আমার নামও বলল, আমি ব্যগ্রভাবে মুখ তুলে তাকালাম, নিঃশব্দে যেতে চাই, যেতে চাই বললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে গেল অন্য নামে, আমার প্রার্থীপদ বাতিল হয়ে গেল। যেন আমি উপস্থিত নেই, শুধু একটা নাম মাত্র, এক জন উত্থাপন করল, অপরে বাতিল করে দিল। মায়া, সে-দিন রাত্রেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। আজও আমি জানি না, তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখে, তোমাকে আমার সব কথা বলার পর বাড়ি ফিরে

যদি দেখতাম মারা গেছেন, তাহলে সেইটাই ভাল হত কিনা। তোমার সঙ্গে যেতে না পারার দুঃখ, মায়ের মৃত্যুর আঘাতও অনেকটা ম্লান করে দিয়েছিল সেদিন রাতের জন্য। আমার মধ্যে শোক বা অনুতাপও জেগে উঠতে পারল না।

তোমাকে আজ এ চিঠি লিখছি, কারণ আজ আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনও দিন ফিরব না, এই জেনে। আমার পক্ষে আর স্বাভাবিক মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, যেন বুঝতে পারছি। এত দিনেও যখন পারলাম না। কোথাও দাঁড়াতে পারলাম না, কোথাও দাগ রইল না, ভালবাসার কথা জানাতে পারিনি, এক লাইন কবিতা লেখা হল না, কিছুই হল না। একটি ব্যর্থতা তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম এ-কথা তোমাকে আজ জানাবার মধ্যে কোনও আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে নেই। আমার জানাবার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারিনি। বড় অদ্ভুত এই ব্যর্থতা। আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি ভালবাসতে। আমারই নিজের প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল, তোমাকে ভালবাসার। ভালবাসার ইচ্ছে জেগেছিল শুধু, ভালবাসা জাগেনি। মনে মনে হাজার কথা বলেছি তোমাকে লক্ষ্য করে, এমনকী ভেবেছি, তোমাকে মুখে বলার সুযোগ না পেলেও একটা চিঠি লেখা অনায়াসেই চলত, আজ যেমন লিখছি। তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে, সেই হত আমার পরম প্রাপ্তি, সেই আঘাত যদি আমাকে কোনও উত্তেজনা দিত! কিন্তু আমি মিথ্যে কথা লিখতে পারি না, ‘তোমাকে আমি ভালবাসি’ এ-কথা লেখা অসম্ভব আমার পক্ষে, আসলে, তোমাকে আমি ভালবাসতে চেয়েছি এইটাই সত্যি এবং তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্যি, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারিনি। এ-কথা কি কাউকে জানানো যা? কিন্তু আজ লিখতে হল, কারণ আজ চলে যাচ্ছি আমি, জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না, কারুকে কারুকে কোনও কোনও কথা অপমান করে, তবে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত তোমার। তুমি আমাকে মনে বেখো বা সামান্য ভালবাসা– এ দাবি আমার নেই। তবু তোমার কাছ থেকে কিছু একটা সামান্য পেতে যেন ইচ্ছে করছে। অন্তত রাগ বা ঘৃণা।

দিদিকে আমার নমস্কার জানিও।
—হেমকান্তি রায়চৌধুরী

৭. পরীক্ষিৎ

পরীক্ষিৎ

সাত মাইল রাস্তা হেঁটে এলাম এই রাত্রে। লাস্ট বাস চলে গিয়েছিল, পকেটে পয়সা ছিল না। ফিরে এসেই লিখতে ইচ্ছে হল। একটা কথাও হারাতে ইচ্ছে করে না। এতক্ষণ যা যা মনে পড়ল, সবই টুকে রাখতে চাই। নইলে হারিয়ে যাবে। অতিকষ্টে শেখরকে কাটানো গেছে। গড়িয়াহাটার মোড়ের আগে আর কিছুতে যেতে চায় না। সাহিত্য আন্দোলন, কবিতার ফর্ম এইসব নিয়ে বকবক শুরু করেছে, রাতদুপুর..অশ্লীল…ফলানো। তারপর বলে যে আমার বাড়িতে আসবে। আমি গেলাম

ওর বাড়িতে থাকতে, তার বদলে ও চায় আমার বাড়ি। এক দিন ওর বাড়ি আমি থেকেছি, এক দিন আমার বাড়িতে ও থাকরেই। এ কি কমুনিজম নাকি? আমি ওর বাড়ি থাকব বেশ করব। আমি ওর বাড়িতে থাকি, ধন্য হয়ে যায়, পরে জীবনীতে লিখবে কিন্তু– । আমার বাড়িতে জায়গা নেই।

আজ ভবকেষ্ট মিত্তিরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম, শুনলাম আমার নাটকটা এ-মাস থেকে ধরবে না, আগে শেখরের উপন্যাস। শুনে গা জ্বলে গেল। শেখরের কি টাকার অভাব : ওর কী দরকার উপন্যাস লেখার তাছাড়া যখন শুনেছে আমি ওখানে লেখা দেব। একশোটা টাকা পেলে আমার কত কাজে লাগত। ভবকেষ্টর চ্যালা রামকেষ্ট আবার বলে, আপনি বিমলেন্দুবাবুর উপন্যাস একটা জোগাড় করে দিতে পারেন? যেন বিমলেন্দু একটা বিরাট কেষ্ট-বিষ্ছু। ট্র্যাস লেখে! রাগে আমার মুখে থুতু এসে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল থুতু লোকটার মুখে মাখিয়ে দিই। তার বদলে হাসি এনে বললাম, ঠিক আছে, আমি এনে দেব, আপনাদের আর যেতে হবে না ওর কাছে। বিমলেন্দুকে এক দিন কথায় কথায় বলে দিলেই হবে যে, ভবকেষ্ট তোর খুব নিন্দে করছিল, তোর কাছের মেঘ গল্পটা কাফকা থেকে টোকা। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চারা ফোকটে নাম কিনছে। শিল্পের জন্য

সর্বস্ব পর করলাম আমি, আর ওরা মজা লুটল। আমি দিন-রাত মানিনি, ভয়-ভাবনা মায়া-মমতা মানিনি, জীবনটাকে ছুঁড়ে দিয়েছি শূন্যে। আর ছাপার অযোগ্যরা রাত্রে বাড়ি ফেরা ঠিক রেখে, পরের দিনের গাড়িভাড়া বাঁচিয়ে, মা-বোনের কাছে মান ঠিক রেখে, থানা-পুলিশ সামলে শিল্পী সেজেছে। শালারা আমার সঙ্গে ঘুরে- ।

নাঃ, বড় বেশি রাগ এসে যাচ্ছে। আজ নেশাটা পুরো হয়নি, আর হাফ নেশা হলেই শরীরে বিষম রাগ এসে যায়, ইচ্ছে হয় সব অশ্লীলকে ডুবিয়ে ছাড়ি। ওদের নিয়ম, সাবধানের বারোটা বাজাই। সে-দিন অবিনাশ হঠাৎ ছুটে রাস্তা পার হতে গেল। দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি, প্রচণ্ড ব্রেক কষার শব্দ। আমি মনে মনে চোখ বুজে খুশি হলাম। নিশ্চয়ই ওটা গেছে। ঈশ্বর, তুমি ধন্যবাদার্হ, ওর একটা কিছু শাস্তি পাওনা ছিল, প্রাণে যেন না মরে, হাত-পা খোঁড়া হয়ে যাক। ভিড় ঠেলে গেলাম, হা হরি, একটা নিরীহ কুকুর চাপা পড়েছে, অবিনাশ অক্ষত। কুকুরটার জন্য এমন আন্তরিক দুঃখ হল আমার যে, অবিনাশকে চাপা দিতে পারেনি বলে গাড়ির ড্রাইভারের নাকে ঘুষি মারলাম। বেঁচে থাকার আশ্চর্য ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ওটা। তবে ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে দেব। বুঝিয়ে দেব শিল্পের সঙ্গে শত্রুতা কী সাংঘাতিক জিনিস। অনিমেষের সঙ্গেও। সুযোগ পাচ্ছি না।

সে-দিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাপস, শেখর, অম্লান, বিশ্বদেব, অনিমেষ, ছায়া, মায়া, কায়া সব। অবিনাশের চোখ জ্বল জ্বল করছিল। পেচ্ছাপখানার পাশে এসে ওকে বললাম, কী রে, কার মুখ দেখতে এসেছিস? জবাব দিল না। এক পাটি দাঁতের ওপর আর এক পাটি দাঁত ঘষে গেল, চোয়াল নড়া দেখে বুঝলাম। আবার বললাম, অমন ছটফট করছিস কেন? উত্তর নেই। কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, অবিনাশ – । অত্যন্ত বিনীত গলায় বলল, পরীক্ষিৎ, তুই এখন অন্য কারুর সঙ্গে কথা বল। কোনও কারণে রাগ হলে আমি চুপ করে থাকতে চাই। আমি চেয়েছিলাম ওকে রাগিয়ে দিতে। রেগে গেলেই ও দু'একটা বোকামি করে, নইলে এমনিতে ভয়ানক সাহেনশা ছেলে। মুখখানা টকটক করছে অনিমেষের। অনিমেষ এক পাশেদাঁড়িয়ে নখ খুঁটছিল, নার্স এসে বলল, কংগ্রাচুলেশন। আপনার ছেলে হয়েছে।

ছেলে। অনিমেষের চেয়ে বেশি চেঁচিয়ে উঠল শেখর আর ছায়া। যেন বাপের জন্মে কোনও ছেলে হওয়ার কথা শোনেনি। অনিমেষ সামনে এসে বলল, ওরা ভাল আছে তো? দু'জনেই –।

দুজন না, তিন জন! নার্সটা মুচকি হাসল। বেশ গোলগাল চেহারা, লেবুর মতো দুটো গাল, তবু মনে হল পেছনে প্যাড বেঁধেছে। নইলে অতটা উঁচু আর শেপলি। ইচ্ছে হল, একটা টোকা মেরে–   ।

তিন জন? তার মানে?

হ্যাঁ, তিন জন। সারা মুখে নীলকালি মাখার মতো হাসল নার্স। এবার লক্ষ্য করলাম, ওর বেশ গোঁফ আছে। একটু না, বেশনীলের চেকনাই। পা দুটো যখন অত সাদা, তখন নিশ্চয়ই পায়ের নোম কামায়, সেই সময় কি গোঁফও চেঁছে নেয় নাকি মাঝে মাঝে? অধিকাংশ মহিলা সাহিত্যিকই গোঁফ কামায় শুনেছি। নিজে যাচাই করে দেখিনি অবশ্য।

তিন জন কে? অনিমেষ কেবিনের দিকে যেতে গেল। নার্স মিষ্টি হেসে বলল, ঠিক যেন কোনও অশ্লীল কথা শেখাচ্ছে, আপনার যমজ হয়েছে। খুব ভাল ওয়েট, সাড়ে পাঁচ পাউন্ড করে, সবাই ভাল আছে। আসুন আমার সঙ্গে, বেশি কথা বলবেন না। আমাদের সব্বাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।

যমজ? শুনে আমরা সবাই সশব্দেবিস্মিত হয়ে গেলাম। সত্যিকারের যমজ? বহু দিন বাদে একটা খাঁটি আশ্চর্য ঘটনা শুনলাম। আমাদের চেনাশুনো কারুর কখনও যমজ সন্তান হয়েছে শুনিনি। স্কুলে আমাদের ক্লাসে প্রশান্ত আর সুশান্ত নামে দুই ভাই পড়ত। অনিমেষ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। মুখখানা ফ্যাকাশে। নার্সের হাতটা খপ করে চেপে ধরে বলল, আপনি ঠিক বলছেন, আমারই? কেবিন নাম্বার থ্রি? কখন?

নার্সটি যেন ভারি মজা পেয়েছে। কচি খুকির মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারই, আপনার স্ত্রী নাম গায়ত্রী তো? আপনাদের আগে বলা হয়নি, প্রথম বেবি হবার ঠিক এগারো মিনিট পরেই আরেকটি। কী ভাগ্য আপনার! দুটিই ছেলে, মেয়ে নয়।

অনিমেষ তখনও নার্সের হাত ধরে আছে, জিজ্ঞেস করল, দু'জনেই –।

হ্যাঁ, বলছি তো দুটিই ছেলে।

না, তা নয়, দু'জনেই –।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দুজনেই বেঁচে আছে। খুবনর্মাল ডেলিভারি।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, আর ছেলে দুটির মা কেমন আছে? গায়ত্রী?

খুব ভাল। জ্ঞান ফিরে এসেছে। গিয়ে দেখুন না, হাসছে! অবিনাশ অনিমেষের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কংগ্রাচুলসোন! করিডর দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, তোমরা খবর শুনেছ? যমজ হয়েছে।

শিশুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, দুটো রক্ত-মাংসের পুতুল। ওদের চোখ, নাক, কান ও লিঙ্গ আছে, হাসি ও কান্না আছে, পেশির শক্তিতে হাত ও পা ছুঁড়তে পারে। দুঃখ আছে, অর্থাৎ খিদে পেলে বা পিঁপড়েয় কামড়ালে কাঁদতে জানে। সুখবোধও আছে, অর্থাৎ মায়ের বুক পাওয়া। শুধু নেই স্বাত। ওরা আলাদা নয়। দুটোকেই আমার এ-রকম মনে হয়েছিল, হয়তো যমজ বলে ওরা এক রকম দেখতেই হবে। কিন্তু ওরা অন্য শিশুর চেয়েও আলাদা নয়, বস্তুত দুনিয়ার সমস্ত সদ্যোজাত বাচ্চাই আমার কাছে এক। ওরা একই রকম ভাবে চেয়ে থাকে। চৈতন্যের কোন প্রদেশ থেকে আসে ওরা, কী সরল ও দূরভেদ্য চেয়ে থাকা। কোথাকার এক বেঁচে থাকার প্রবল দাবি নিয়ে এসেছে, দু'জনের বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা গায়ত্রীর হাত, দুটো মায়ার পিণ্ড। ওঃ, বিপুল প্রতীক্ষা ও ধৈর্য নিয়ে আসতে হয় পৃথিবীতে। কত কী শিখতে হবে–হাঁটাচলা, শব্দব্রহ্ম থেকে বাক্যবন্ধ, খাবার

চুরি, স্বর ও ব্যঞ্জন, পোশাক পরা, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এই অভিমানী জ্ঞান, ঘুড়ি বা লাট্টু, ছোঁক হোক, ফ্রক ও হাফপ্যান্টের নিচের রহস্য, নিজেকে লুকোবার জন্য শুন্যতাবোধ, রক্তের ডাক ও কর্মবন্ধন, তারপর আরেক জনকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে এই রকম আর একটা মাংসের পুতুল তৈরি করা। পরা-বিদ্যা বুঝি বলে একেই। অথবা চক্র দিয়ে আরম্ভ কী যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক, পরে দেখে নেব। অথবা সুক্ষ্মতা বুঝি এই। নাঃ, জীবচক্র জিনিসটা আমার পছন্দ হয় না। আমার পৃথিবীতে আমি কোনও উত্তরাধিকারী রেখে যাব না।

আমি নবজাতকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গায়ত্রীর ক্লান্ত খুশি ছুঁয়ে অনিমেষকে দেখলাম। যেন ওর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, এমন মুখ। খুব ইচ্ছে হল ওকে একটা ধাক্কা দিই। ওকে বলি, অনিমেষ –। মানুষের অতটা খুশি আমার সহ্য হয় না। না হয় যমজ ছেলেইহয়েছে। এমন কী দৃশ্য আছে পৃথিবীতে যা মানুষকে সত্যিকারের খুশি করতে পারবে? চোখ না বুজলে মুখ জাগে না। আমি বলতে চাইছিলাম, অনিমেষ, চোখ বুজে নিজের মুখ দ্যাখ। ওই সন্তান তোর কেউ নয়।

বন্ধুবান্ধব-ফান্ধব আমার মোটই ভাল লাগে না। অর্থাৎ আমার কোনও বন্ধু নেই। যে আমাকে খাওয়াবে সে আমার বন্ধু। যে আমাকে রাত্রে থাকতে দেবে সে আমার বন্ধু। কোনও কাগজের জন্য যদি কেউ লেখা চেয়ে টাকা দেয়, বা যখন তখন সিগারেট পাওয়া যাবে বা ট্রামে-বাসে ভাড়া দেবে তাহলে বন্ধু বলা যায়। আর কিছু আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এক-একটা আছে, ভিখিরির মতো বসে থাকে আর সাহিত্য-ফাহিত্য নিয়ে কথা বলতে চায়। আমিও তো ভিখিরি। ভিখির সঙ্গে ভিখিরির বন্ধুত্ব করে কী লাভ! মোটেই পছন্দ করি না। অনেকে আবার বন্ধুত্ব করে ধার শোধ চায়, যেমন আজ শেখর। কিন্তু সব চেয়ে বড় বদমাশ অবিনাশ, কারণ ও আর আমার বন্ধুত্ব চায় না। ওর কথা ভাবলেই গা জ্বলে যায়।

অতক্ষণ অন্ধকার দিয়ে হেঁটে এলাম, ওঃ কী অন্ধকার, হেঁটে এলাম না সাঁতরে এলাম। শরীর ডুবে গেল, গা-হাত-পা দেখা যায় না। চোখে-নাকে-অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছিল,

খানিকটা অন্ধকার হড়াৎ করে খেয়ে ফেললাম ভুলে। কিছুক্ষণ পরে দাঁড়িয়ে এক জায়গায় বমি করার মতো অন্ধকার বার করে দিলাম পেট থেকে, নাক ঝেড়ে সিকনির মতো অন্ধকার পরিষ্কার করলাম। তা-ও শালারা যেতে চায় না। খানিকটা বাদে রাস্তা ভুল হয়ে গেল। কাদার মতো থকথকে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘেন্নায় শরীর গুলোচ্ছিল।

এক দিন কল্যাণের সঙ্গে এমন ঘোর অমাবস্যায় হেঁটেছিলাম, বহরমপুরে। কল্যাণ একটা চুরুট খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সেই চুরুটের ম্লান লাল আলো। সেদিন আর কী হয়েছিল মনে নেই, শুধু মনে পড়ে আমাদের বহুক্ষণ পাশাপাশি অন্ধকারে হাঁটা। ও, সেদিন আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আহা, এত দিন মনে পড়েনি কেন? আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার পাড়ে চলে এলাম গির্জার পাশ দিয়ে। আমরা দুজনে কোনও কথা বলিনি, এমন ভাবেহাঁটছিলাম যেন বহুক্ষণ আরও ওই রকম ভাবে হাঁটতে থাকব। কিছুক্ষণ আগে কল্যাণ গান গাইছিল চেঁচিয়ে, জোরালো ও সুরেলা গলা ওর অমন সিড়িঙ্গে চেহারায়। গান অসম্ভব ভাল লাগছিল, সেই সঙ্গে বিরক্ত হয়েছিলামও। কারণ, ও গান গাইছিল আপন মনে, আমাকে গানের সঙ্গী করেনি। তারপর হঠাৎ চুপ করে উকট ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। নদীর পাড়ে এসেও আমরা হাঁটা থামাইনি। মনে হল আমরা নদীর ওপর দিয়েও হেঁটে যাব। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের কাছে এলাম, আমার দেখতে ইচ্ছে হল কল্যাণ কী করে। ও আস্তে আস্তে জলে নেমে যাচ্ছে, আমি দেখতে লাগলাম, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলল, যখন বুক জলে, তখন ফিস ফিস করে আমি ডাকলাম, কল্যাণ! কল্যাণ পিছন ফিরে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল, এসেও কোনও কথা বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বলল, শ্যামা কথাটার মানে কী রে? কালো? তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা...কালিদাসের নায়িকা কি কালো ছিল?

আমি বললাম, না। শ্যামা মানে যে-স্ত্রীলোকের শরীর শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। হঠাৎ–।

কিছুনা, ও বলল। আবার খানিকক্ষণ চুপ। পরে বলল, ও-পারে একটা লোক দেখতে পাচ্ছিস?

না।

ওই যে দ্যাখ, লাল আলোর একটা ছিটে। হ্যারিকেন হাতে মাঠের মধ্য দিয়ে লোকটা হাঁটছে। আমার কী মনে হল জানিস, আমিই এই নদীটা পেরিয়ে গিয়ে ও-পারে মাঠে হাঁটছি। তোকে বললাম, একটু দাঁড়া। কীরকম যেন স্বপ্নের মতো এক মুহূর্তে দেখতে পেলাম।

ও-পারে তো কবরখানা, তোর ওখানে রাতে যেতে ইচ্ছে করছে?

না। শুধু নদীর ওপারে যে-কোনও জায়গায়।

হঠাৎ আমার মনে হল, কল্যাণ কি রাতদুপুরে আমাকে একা পেয়ে কবিত্বে টেক্কা দিচ্ছে? ওর কথায় খানিকটা যেন সত্যিই গভীরতর সুর। বললাম, কী করে পার হবি? আমার তো মনে হচ্ছে এটা অন্ধকার, কাদায় থিক থিকনরকের নদীর মতো বিশ্রী।

কল্যাণ আমরা দিকে গূঢ় সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, যাঃ, এ তো গঙ্গা। পুণ্যসলিলা।

কিন্তু যাই হোক, তোর কি মনে হয় না এটা একটা অদ্ভুত জীবন্ত জিনিস যা কোনও দিন পার হওয়া যাবে না? (কল্যাণ কোনও দিন পারবে এ-রকম কথা বলতে?)

আমি ঠিক পার হতে চাই না। আমি ডুবে থাকতে চাই।

কীসে ডুবে থাকতে? নদীতে?

হ্যাঁ, সব নদীতে নয়, এখন, এইমাত্র মনে হচ্ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ডুবে মরি। মরব? তুই সাক্ষী থাকবি?

থাকব। তার আগে তোর নীল স্যুটটা আমাকে দিয়ে যা। তোর ওটা আমার খুব পছন্দ মাইরি।

তুই জানিস না, পরীক্ষিৎ– কল্যাণ কোট খুলতে খুলতে বলল, শরীরে বড় মৃত্যুভয় ঢুকেছে আমার। মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। খুবই লজ্জা লাগে কিছুই হল না, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা লেখা লেখা খেলা করে কাটালাম। যখন চুল পাকরে, দ ত থাকরে না, চোখের ছানি কাটাতে হবে, তখন হয়তো লেখার জন্য কিছু টাকাকড়ি পাব, খবরের কাগজের লোকে যাকে বলে সম্মান দক্ষিণা। তোর লজ্জা করে না? এই কি জীবন নাকি? এর চেয়ে নিজের হাতে–তুই দাঁড়া, পরীক্ষিৎ আমি যাই।

কোথায়?

জলে। নদীর বিছানায় ঘুমোই। কোনও ক্ষোভ থাকবে না।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। সেই জন্যই তো আমিও গিয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে।

কবে? তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? তোর মতো–।

কেন, জব্বলপুরে? ব্রিজ থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলাম, তোর মনে নেই?

তুই লাফিয়েছিলি? তুই তো হঠাৎ পড়ে গেলি।

নাঃ। এক মুহূর্তে আমার মৃত্যু খেলে গিয়েছিল, হার্ট ক্রেনের মতো। নিচে নদীতে অন্ধকার স্রোত দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিল, যাই' বলে সাড়া দিই। স্রোত, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। মাঝখান থেকে অবিনাশ এসে– ।

দেখলাম কল্যাণ পেছন ফিরে উঠতে শুরু করেছে, আমার পুরো কথা না শুনে। সিঁড়ির ওপর গিয়ে মূর্তিটার নিচে দাঁড়াল। বিশাল মর্মর মূর্তিটা যেন মূর্তিটা, কোনও তুলনা মনে আসছেনা, শুধু মূর্তিটাই চোখে ভাসছে, বিশেষত ওই অন্ধকারে তলোয়ারের উপর হাত

রেখে ঝুঁকে দাঁড়ানো। মনে পড়ছে মূর্তিটার নিচে কল্যাণকে কী সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর লেগেছিল। ভেবেছিলাম, মানুষ কি একটা মূর্তির চেয়ে নগণ্য বা কম জীবন্ত? পরে ভাবনাটা সংশোধন করে নিয়েছি। মানুষ না, শুধু কল্যাণ। ওই বাস্টার্ড। ওকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। খালি বড় বড় কথা।

.

শনিবার, ২৯ এপ্রিল।

কাল সারা রাত মাথায় ব্যথা হয়েছে। মাথার যন্ত্রণা কিংবা মাথাধরা নয়। মাথার পিছনে চার ইঞ্চি জায়গা জুড়ে সমতল ধরনের ব্যথা। শুয়েছিলাম, হঠাৎ মাঝ রাত্রে মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে, খাট ও ঝোলানো আলোটা দুলছে। শুনতে পেলাম দূর থেকে শত শত শাঁখের আওয়াজ। প্রবল ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেঝেতে পা রাখতে পারছিলাম না, মা মা বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। মা যে বাড়িতে নেই মনে পড়েনি, শুধু মনে হয়েছে মাকে ডেকে বাইরে কোনও খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁচতে হবে। বাড়ির সামনে খোলা জায়গা নেই, পুরো গলিটা পেরিয়ে রাস্তার ওপরে ঘুঁটে দেবার মাঠ, গলিটা পেরুবকী করে? মা মা বলে ডেকে দেয়াল ধরে ধরে পাশের ঘরে এলাম। দিদি ওর বাচ্চাদের নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছ, এখনও টের পায়নি। দিদিকে ডাকতে গিয়েও মনে হল, থাক না, ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোক, দেয়াল চাপার পড়ে মরে তোমরুক, বিধবা হয়ে দিদি বেশিদিন বেঁচেকী করবে? পরক্ষণেই মনে পড়ল, একবার আমার ডান হাত ভেঙে যেতে দিদি আমাকে অনেক দিন নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ দিদিকে ডেকে বাঁচাবার কথা মনে হল। সেই সময় শিয়রের কাছে জানলাটা খোলা, ছায়া দুলছে না, আলো দুলছে না। বুঝতে পারলাম, দিদির ঘরে ভূমিকম্প নেই। থেমে গেছে, না ভূমিকম্প আরম্ভই হয়নি? আমি স্বপ্নেভয় পেয়েছিলাম? নাকি পৃথিবীতে এইমাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটা বিষম ভূমিকম্প হয়ে গেল যা শুধু একা আমার শরীর কাঁপিয়েছে! আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হল।

সেই সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, রাত দুটো কি সাড়ে তিনটে, বাবাকে দেখতে পেলাম।

কোর্ট থেকে ফেরার সময় যে-রকম পোশাক পরতেন, ঠিক সেই পোশাকে, কালো সিল্কের কোট, কালো টাই, ধবধরে সাদা স্টিকলার ও জামার হাতা। চোখে প্যাশান। জিজ্ঞেস করলাম, বাবা আপনি হঠাৎ? কী মনে করে?

তোমাদের দেখতে এলাম। তাছাড়া আমার নস্যির কৌটোটা ফেলে গিয়েছিলাম। বাবা খুব ধীর ও পরিষ্কার গলায় বললেন।

আপনাকে আবার দেখব, আশাই করিনি, আপনি তো- ।

তুমি কেমন আছ পরীক্ষিৎ, একটু রোগা হয়ে গেছ।

কিন্তু আপনার চেহারা একই রকম আছে। কী করে ফিরলেন?

আমার সোনার হাতঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছ শুনলাম।

আপনি কী করে ফিরলেন? মরে যাবার সাত বছর পরে-

ঘড়িটা আমার খুব প্রিয় ছিল, আমার বাবা ওটা দিয়েছিলেন আমাকে। তিনি বলেছিলেন, এই ঘড়ি তোমাকে দিলাম। এটা কখনও বন্ধ হয় না। এটা তুমি তোমার সন্তানকে দিও। কিন্তু সেই সময়কে তুমি রাখলে না, পরীক্ষিৎ।

মৃত্যুর পরও কি ফিরে আসা যায়? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আমার মেডেলগুলো সব অশ্বিনীর কাছে বন্ধক দিয়েছ। ওগুলো কী ছাড়াবে?

ছাড়াতাম। কিন্তু স্যাকরা বেচে দিয়েছে বলল।

মিথ্যা কথা বোলা না আর এখন। আসলে তোমার-

আপনি মৃত্যুর কথা বলুন।

ছাড়াবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুমি নিজে লেখাপড়া করলে না। এমন কিছু করতে পারবে না যাতে ও-রকম মেডেল পাবে। সেই জন্য তোমার বাবার মেডেল তোমার সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু তোমার মা ওগুলো খুব ভালবাসতেন। তাকে এখনও বলোনি–

সাত বছর আগে আপনাকে আমি পুড়িয়ে এসেছি শ্মশানে। সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল। আনাকে বয়ে নিয়ে যেতে অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু আমার এমন কাঁধে ব্যথা হয়েছিল যে এক সপ্তাহ ব্যথা ছিল। আপনি জানেন না, জেনে রাখুন, আপনার প্রিয় বন্ধু সতীশবাবু শ্মশানে যাননি। বুলিমাসির বর আপনার টাকা ফেরত দেননি। কিন্তু আপনি কী করে মৃত্যুর পর আবার ফিরলেন, সেই কথা বলুন।

আমার ফটোর কাচটা ফেটে গেছে। ওটাকে সারিয়ে অন্য কোথাও রাখাই তোমার উচিত।

মৃত্যুর দেশ থেকে যদি ফিরে আসা যায়, তবে আমি আপনার সঙ্গে যাব। ফিরে এসে আমি সেই অ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখলে পৃথিবীতে হই-হই পড়ে যাবে।

ওরকম জানলার পাশে মাথা দিয়ে শুয়ো না। ওতে বুকে সর্দি বসে যায়।

আপনি মৃত্যুর কথা বলুন! মরার পর আপনি একটুও বদলাননি তো? কেমন করে– ।

আমার বড় শীত করে রে খোকন, আমাকে একটা কম্বল দিতে পারিস?

না। আমাদের আর একটা একস্ট্রা কম্বল নেই। আপনারটা দিদির ছেলে গায়ে দিচ্ছে।

কিন্তু আমার যে বড় শীত করে। চিতায় যাবার পর আর আগুন দেখিনি। আমার প্রথম বার বাৎসরিক কাজটাও করিসনি!

তখন জামাইবাবুর অসুখ ছিল। ভেবেছিলাম, জামাইবাবুর শ্রাদ্ধ আর আপনার বাৎসরিক এক সঙ্গে করব।

মরার আগের দিন তোকে–।

আপনি মরার পরের– ।

একটা কথা– ।

কথা।

বলতে চেয়েছিলাম। তুই আসিসনি, আমার– ।

বলুন, আমি তাই শুনতে চাই।

আমার ওখানে বড় শীত করে পরীক্ষিৎ। তোর কথা ভেবেও আমার শীত করে।

৮. শেখর

শেখর

সকালবেলা সারা শরীর ব্যথা করে প্রত্যেক দিন। অধিকাংশ দিনই রাত্রে আলো নেভাতে মনে থাকে না। দিনেরবেলা আলোটা নেভাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকাই। কী করুণ মূর্তি এই আলোর। আমাদের তিন-পুরুষের বাড়িতে এখনও কিছু কিছু ঝাড়লণ্ঠন আছে, সেগুলো নষ্ট করিনি। ভেতরে বা বসিয়ে জ্বালি। রাত্তিরবেলা খুব জমজমাট দেখায়। প্রাচীন রাজপুরুষের মতো। কিন্তু দিনেরবেলা কী মলিন রুগ্ন চেহারা আলোটার। আমি দিনের বেলাতেই এটাকে দেখতে ভালবাসি। রাত্তিরের অত প্রখরতা সহ্য হয় না। সুইচ টিপে আলোটা একবার নেভাই ও জ্বালি। আলোটা নেভালেই রোদ্দুর চোখে পড়ে বিশেষ ভাবে। রোদ্দুর দেখলেই মনে হয় দূরে চলে গেছি, ধানবাদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অথবা কুচবিহারে অথবা ছেলেবেলায় খুলনায় যেমন হাঁটতাম শশাঙ্কর সঙ্গে। সকালে উঠলেই শরীর ব্যথা করে। এ বেশ মজা, রাত্তিরে কোনও দিন ঘুম আসতে চায় না, প্রতি দিন স্লিপিং পিল খেতে হয়, তবু ঘুম আসে না। দেয়ালে ছবি দেখি, ছবি তৈরি করি, ছবি নষ্ট করি। শেষরাত্রে ঘুমের মতো আচ্ছন্নতা। সকালে গা ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্য আবার ট্যাবলেট খাই। শুনেছি, বেশি ট্যাবলেট খেলে রাত্রে ঘুম হয় না। ঘুম হয় না বলে রাত্রে ট্যাবলেট খাই, সেই জন্য সকালে গা ব্যথা। আবার গা ব্যথা সারাবার জন্য ট্যাবলেট খাই, সেই জন্য আবার রাত্রে ঘুম হয় না। সকালে মার সঙ্গে দেখা হয়, আমার বিরস মুখ দেখে শারীরিক ব্যাপারে প্রশ্ন করে। আমার সেই গা ব্যথার কারণ বলি। ওই ট্যাবলেটটা খাস না কেন? খুব ভাল কাজ দেয়, শরীর একেবারে ঝরঝরে করে দেবে। এই বলে একটা ট্যাবলেটের নাম করে। রাত্রে যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথায় কথায় বলি, রাত্রে একদম ঘুম হচ্ছে না ভাই। সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ বলে, অমুক ওষুধটা খেয়ে দ্যাখ। মন্ত্রের মতো অ্যাকসান, দশটা ভেড়া গোনার আগেই ঘুমিয়ে পড়বি। প্রত্যেকেই কিছু না-

কিছু ওষুধ জানে। সবগুলিই কার্যকরী। কিন্তু সবগুলোই আংশিক। সকলেই আংশিক ওষুধ নিয়ে আছে।

তিনফর্মা প্রুফ জমে গেছে, কখন দেখব জানি না। একেবারে সময় পাই না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো সরু সরু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। সেই সব ক'টা রাস্তার ট্রাফিক আমাকে একা সামলাতে হয়। সবুজ, লাল, হলুদ আলো জ্বলে, আমি টের পাই। মাথার মধ্যে একটা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সব সময় ব্যাট হাতে রাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই আশেপাশে আর একটা রোগা উদ্রান্ত লোক, ছেঁড়া জামা, তিন দিন দাড়ি কামায়নি। সেই লোকটা বলছে, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। এই ক্ষমতাপ্রার্থী। নিবীহ লোকটি ও ক্রুদ্ধ পুলিশ অফিসার ঘুরছে আমার মাথার মধ্যে, নানা রাস্তা দিয়ে ছুটছে, কখনও হাঁটু মুড়ে বসছে, লুকোচ্ছে। এবা কী নাটক তৈবি করছে জানি না। এবা আমারই মাথার মধ্যে, তবু এদের চিনি না আমি। কখনও-বা পুলিশ অফিসারের মতো লোকটা গর্জন করে বলছে, না, ক্ষমা করব, ক্ষমা নেই। এই বলে পাছে ক্ষমা করে ফেলে এ জন্য ছুটে পালাচ্ছে, আর নিরীহ করুণ লোকটা ক্ষমা করুন, ক্ষমা করতেই হবে বলে তাড়া করছে তাকে। সেই অদ্ভুত দৌড়-প্রতিযোগিতা মাথায় নিয়ে আমি বসে থাকি টেবিলের সামনে। গায়ে ব্যথা, প্রফ যেমন তেমন পড়ে থাকে, ডানাভাঙা পাখির মতো উলটানো আদ্দেক শেষ-করা বই, ড্রয়াবে আদ্দেক শেষ করা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। ওই পাগলাটে দৌড়ের জন্য মাথায়ও ব্যথা হয়।

এ ছাড়া আছে মাধবী। সপ্তাহে তিন দিন মাধবী আসে আমার বাড়িতে দুপুরবেলা। এখন কলেজ বন্ধ বলে সন্ধেবেলাটা শুধু শুধু ছাত্রী পড়িয়ে নষ্ট করতে চাই না। তাই ওকে দুপুরেই আসতে বলেছি। শুধু দুপুরবেলাটুকু ও থাকে, কিন্তু আমাকে ব্যাপৃত রাখে সারা দিন। যদি দেখা হয়, সমস্ত দিনটা মাধবীর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। অতি কষ্টে তবু বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দুপুরবেলাটা ছিনিয়ে নিয়েছি। আমার বাড়িতে যে যখন ইচ্ছে আসে, আমি থাকি বা না থাকি আমার ঘরে এসে আড্ডা মারে। মাকে ডেকে চায়ের হুকুম করে। বন্ধুরা বসে থাকরে বলে আমাকে সব সময় তাড়াতাড়ি ফিরতে হয় বাড়িতে।

বলতে গেলে আমার স্বাধীন সময় কিছুই নেই। প্রত্যেকে আলাদা ভাবে আড্ডা মারতে আসে আমার সঙ্গে, কিন্তু আমার কোনও নির্বাচনের অধিকার নেই। কারণ আড্ডার জায়গা আমার বাড়ি। অনেকে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমার বাড়িতে। কেউ হয়তো এসে বলল, ওমুক এসেছে? বললাম, না। সে বসে রইল, বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। খানিকটা বাদে ওমুক এসে বলল, আরে তুই কতক্ষণ এসেছিস? আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। খানিকটা বাদে তারা নিজেদের কথা সেরে তারপর আমার সঙ্গে দু-একটা মুখরাখা কথা বলে আচ্ছা চলি, বিদায় নেয়। অতি কষ্টে সবাইকে নোটিশ দিয়ে বলেছি, দুপুরবেলা কেউ আসবেনা। দুপুরবেলা আমি একা থাকতে চাই। দুপুরবেলা মাধবী আসে ইতিহাস পড়তে।

টেবিলের ও-পাশে বসে যখন আমি ওকেমিউজিয়ামের পাথর বিষয়ে বই-পড়া বক্তৃতা শোনাই, তখন চুপ করে বসে থাকে মাধবী, একটাও শব্দ করে না। খানিকটা বাদে লক্ষ্য করি, ও একটাও কথা শুনছেনা আমার, শুধুই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি থেমে যাই, জিজ্ঞেস করি, কী দেখছ?

ওটা কার ছবি?

তখন বুঝতে পারি, ও আমাকে দেখছে না, দেখছে আমার পিছনের দেয়াল। বলি, সালভাদোর দালি, ছবিটার নাম জ্বলন্ত জিরাফ।

ওঃ আচ্ছা, তারপর বলুন।

কখনও কখনও শুধুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও জিজ্ঞেস করি, কী দেখছ?

আপনাকে।

এরকম পরিষ্কার ভাবে কোনও মেয়ে কথা বলে না। অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে কোনও ছাত্রী বলে না, আমি আপনাকে দেখছি। শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে যাই। কিন্তু ছাত্রীদের এসব ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে নেই। তাহলে চাকরি রাখা যাবেনা। সেই জন্য আমি খানিকটা নির্বিকার ভাবেই বলি, আমাকে কী দেখার আছে? এমন কিছু দর্শনীয় নই। নিয়নডার্থাল স্কাল আমার, লক্ষ্য করছ?

তা নয়। আপনাকেআমার একজন চেনা লোকের মতো দেখতে। খুব মিল আছে। সত্যি আপনি অনেকটা অবনীভূষণের মতো দেখতে।

এ-কথা মাধবী আরও কয়েক বার বলেছে। কে অবনীভূষণ, আমি জিজ্ঞেস করিনি কখনও। মাধবীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সে কোথায় এখন, বেঁচে আছে কিনা, কিছুই জানিনা। যেন ওর সঙ্গে আমার একটা লুকোচুরি খেলা চলছে এই নিয়ে। আমি কিছুতে জিজ্ঞেস করবনা, মাধবী জিজ্ঞেস না। করলে বলবে না। দু'জন মানুষ কখনও এক রকম দেখতে হয় না। অবনীভূষণকে আমার মতো দেখতে, অর্থাৎ তার মুখ বা চোয়াল আমার মতো, অব্বা তার চোখ, অথবা আমার মতো কোনও ভঙ্গি। কোথাও আমার মতো আর একজন লোক আছে, এই দুশ্চিন্তা আমাকে বিষম বিব্রত করে। লোকটি সম্বন্ধে খুবই কৌতূহল হয়, ঈর্ষা নয়, সে যদি মাধবীর প্রেমিকও হয়, তবুও না। আমি নিজের চিন্তা ভুলে গিয়ে আমারই মতো অন্য একটা লোক, অবনীভূষণ, তার চিন্তায় বিভোর হয়ে যাই। ক্রমশ, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, অবনীভূষণ নিশ্চিতই মাধবীর প্রেমিক, মাধবী যে-ভাবেনামটা উচ্চারণ করে। লোকটা হয় এ-দেশে নেই এখন, বা মারা গেছে। মাধবীর মতো ধনীর দুহিতার সঙ্গেযখন প্রেম তখন সে-ও নিশ্চয়ই খুবউঁচু বংশের ছেলে। মাধবীর সঙ্গে টেনিস খেলতে খেলতে কিংবা গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালাতে চালাতে কী করে আমারই মতো চেহারার এক জন লোক মাধবীকে প্রণয় জানাত। কী ভাষা ব্যবহার করত, ভাবতে ভাবতে আমিও এক দিন মাধবীর প্রেমিক হয়ে পড়ি। এর আগে, কত মেয়ের সঙ্গেই তো চেনাশুনা, জানা, আরও অনেক কিছু হল, কিন্তু কখনও কোনও মেয়ের সম্পর্কে আমি এত বেশি ভাবিনি, বিশেষত ছাত্রীদের সম্পর্কে তো নয়ই। ছাত্রীদের

ব্যাপারে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, আগে অনেক সুযোগ এসেছিল, মাধবীর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে –তবুও না। কিন্তু হঠাৎ মাধবী আমার হৃদয়ের তিন ভাগের একভাগ দখল করে ফেলেছে। সত্যি, আমি একদিনে অনেক বদলে গেছি। আমার চিন্তা ও স্বভাবের অনেক বদল হয়েছে। আর, চিন্তার দিক দিয়ে বদলে গেছি বলেই কি আমার চেহারাও বদলে গেছে? কোথাকার কোন এক অবনীভূষণের মতো দেখতে হয়েছে আমাকে? রাত্তিরবেলা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি অবনীভূষণ হয়ে যাই, হয়ে গিয়ে মাধবীর কথা ভাবি। মাধবীর জন্য বিষম মন কেমন করে, নিজেকে অবনীভূষণ ভেবে।

মাধবীর ধরন-ধারণ ঠিক ছাত্রীর মতো নয়, অনেকটা প্রভুপত্নীর মত। বড়লোকের মেয়ে বলেই বোধহয় একটু দেমাকি স্বভাব। আগে এ জন্য ওকে পছন্দ করতাম না। এখন ওর এই অভিজাত ভঙ্গি ও আমার খুব ভাল লাগে। আমার সিগারেটের ছাই ঝাড়ার ধরন দেখে এক দিন মাধবী বলল, অবনীভূষণও ঠিক এই রকম ভাবে ছাই ঝাড়ত। বস্তুত, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ আঙুলে টুসকি মেরে আমিও আগে কখনওই ছাই ঝাড়িনি, আজকেই প্রথম। কী করে এ স্বভাব আমার হল! তবে কি আমি সত্যিই ক্রমশ অবনীভূষণ হয়ে যাচ্ছি? প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য আমি বললাম, আমি এ-রকম টুসকি মারার কায়দা শিখেছি আমার বন্ধু পরীক্ষিতের কাছ থেকে। তুমি তাকে চেনো?

নাম শুনেছি। লেখেন তো? আপনার বন্ধুদের মধ্যে আমি শুধু অবিনাশ মিত্রকে চিনি, এক দিন আলাপহয়েছিল। খুব চমৎকার লোক।

অবিনাশ কী বিশ্বসুদ্ধু মেয়েকে চেনে? অবিনাশের সঙ্গে করে কোথায় আলাপ হয়েছিল জিজ্ঞেস করতেও ভয় হল। কী জানি অবিনাশ এর হৃদয়ও রক্তাক্ত করেছে কি না। না করেনি। যে-রকম আলতো ভাবে মাধবী চায়ের কাপে চামচ নাড়ছে, তাতে বুঝতে পারা যায়। এ-রকম কোমলতা কোনও আহত নারীর থাকে না। আগে মাধবীকে খুব একটা রূপসী মনে হত না, কিছুটা স্থুল, শরীর থেকে অন্তত দশ পাউন্ডওজন কমালে ফিগার সুন্দর হবে ভাবতাম, নাকটাও একটু চাপা। ক্রমশমনে। হচ্ছে ও-রকম গ্রীবার লাবণ্য আমি আগে কোনও মেয়ের দেখিনি, ও-রকম স্নিগ্ধ অথচ চুম্বকের হাসি। অর্থাৎ মাধবীর

প্রতি আমি মায়ায় আরদ্ধ হয়ে গেছি, যাকে বলে ভালবাসা। মনে হয়, মাধবীর দুই বাহু পেলে এ-জীবনে উদ্ধার পেয়ে যাব। হঠাৎ আজকাল এ-রকম উদ্ধার পাবার ইচ্ছেই-বা কেন মনে জাগছে?

এ ছাড়া আর একটাও দৃশ্য আমাকে খুব বিরক্ত করছে আজ কয়েক দিন। ঢালু অন্ধকার রাস্তা, দু'পাশে গাছের সারি, একটা মোটরগাড়ি হেডলাইট জ্বেলে স্পিডে নেমে আসছে। কোনও কিছু লিখতে গেলেই প্রথমে এ দৃশ্যটা চোখে ভাসে। অথচ এমনকী গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য এটা, কোথায় দেখেছি তা-ও মনে পড়ে না। অন্ধকার ঢালু রাস্তায় মোটরগাড়ি দু'পাশের গাছের সারির মধ্য দিয়ে তীব্র আলো জ্বেলে নেমে আসছে। কোথাকার অন্ধকার, কোন ঢালু রাস্তা, কে গাড়ির চালক, কিছুই জানি না। অথচ দৃশ্যটা তাড়িয়ে দিতেও ইচ্ছে করে না, আপনা থেকে কেন এল জানতে ইচ্ছে হয়।

সামনে এক তাড়া প্রুফ ছড়ানো। আমি মাথার মধ্যে পুলিশ ও ক্ষমাপ্রার্থী, মাধবী, অবনীভূষণ, অন্ধকার ঢালু পথে গাড়ির দৃশ্য নিয়ে চুপ করে বসে আছি। এই সময় পরীক্ষিৎ ও অনিমেষ এল। অনিমেষ কাল ফিরে যাবে এক ছেলে ও গায়ত্রীকে নিয়ে। আর একটা ছেলে বাঁচেনি। সিগারেটের ছাইয়ের সঙ্গে প্রচুর কথা উড়ে গেল। অনিমেষ শান্ত গলায় থেমে থেকে পুরনো দিনের কথা বলল। বলল, ছেলেটাকে শ্মশানে পোড়াতে গিয়ে পুরনো কথা সব মনে পড়ল আবার। বোধহয় বছর চারেক পর শ্মশানে গেলাম।

আগে তো প্রতি দিন সন্ধেবেলা ওখানেই আমাদের আড্ডা ছিল। এত দিন পর শ্মশানে গিয়ে অনিমেষের মনটা একটু ভারিহয়ে গেছে মনে হল। ছেলেমরার জন্য ওরকি খুব দুঃখ হয়েছে। ছেলে মরার পর দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যমজ এক ছেলে বেঁচে আছে, এক জন মরেছে, সুতরাং এক জনের জন্য আনন্দ, আরেক জনের জন্য দুঃখ, কিন্তু কোনটা বেশি? যাই হোক, অনিমেষকে কিছুটা অন্য কথা বলে ভোলানো দরকার। আমি বললাম, তোমার মনে পড়ে অনিমেষ, শ্মশানের পাশে আমাদের রাত্রে শুয়ে থাকা? বগলে ব্র্যান্ডির বোতল, ইট বানো ঢালু গঙ্গার পাড়ে? কে যেন গান গাইতে গাইতে পড়ে গেল– পরীক্ষিৎ না অরুণাংশু? ওঃ, গগন, মনে আছে।

কেন, সেবার সেই দুর্গাপুজোর সময়ে মনে নেই?

মনে পড়তেই হাসি পেয়ে গেল। অরুণাংশু দুটো হুইস্কির পাঁইট পকেটে নিয়ে ঘুরছে, কোথাও বসে খাবার জায়গা নেই। আমি বললাম, চল, গঙ্গার পাড়ে যাই। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন, কিন্তু গঙ্গার পাড় ভিড়ে ভর্তি। অন্ধকারে জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়ে বসে আছে। আমরা কোথাও আর জায়গা পাইনা, ওদের বিরক্ত করতেও ইচ্ছে করে না। শেষ পর্যন্ত বটগাছের নিচে এক সাধুর আশ্রমের কাছে আমরাও সাধু সেজে বসে গেলাম গোল হয়ে। দু'এক চুমুক দেবার পর মনে হল খানিকটা জল দরকার। সাধুটাকে বললাম। সে বলল, গঙ্গাজীমে ইতনা পানি হায়, পি লেও। তাই নিতাম, কিন্তু তাপসটা খানিকটা শৌখিন, ও কিছুতে গঙ্গার জল মেশাবে না। তখন অরুণাংশু একটা চাঅলাকে ডেকে চা না কিনে খালি ছটা ভাড় কিনল। শুধু ভাড দিয়ে কী করব দেখার জন্য কৌতূহলী চাঅলা খানিকটা দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ অরুণাংশু জমিদারি কায়দায় তাকে হুকুম করল, এই চাঅলা, তোমার কলসীটা রেখে এক বালতি পরিষ্কার জল নিয়ে এসো তো। লোকটা ইতস্তত করতে অরুণাংশু বিষম ধমক দিল, যা-ও! দেখছ কী হাঁ করে? পরীক্ষিৎ গাঁজার খোঁজে ঝুলিতে হাত দিয়ে –

কী রে পরীক্ষিৎ, তোর মনে পড়ে?

পরীক্ষিৎ চুপ করে বসে ছিল। শুকনো হাসি হেসে বলল, হুঁ।

আমি বললাম, কী রে, তোর শরীর খারাপ নাকি?

না, কিছুটা। ভাবছি অনিমেষের সঙ্গেই বাইরে চলে যাব। কয়েক দিন ঘুরে এলে ভাল লাগবে। তোর এখানে অবিনাশ আসে?

না, অনেকদিন আসেনি।

আমার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল, অনিমেষ বলল, কাল রাইটার্স বিল্ডিং-এ ওর অফিসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বহু দূর গিয়েছিলাম, প্রায় খিদিরপুর পর্যন্ত। অনেক কথা বলল অবিনাশ।

নিশ্চয়ই ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা? পরীক্ষিৎ বলল।

না। খুবই আন্তরিক। অনেক বদলে গেছে অবিনাশ। অনেক সরল হয়েছে।

না, সরল না, সরলতার ভান!

তাতেই-বা ক্ষতি কী? ভান করতে কেউ যদি সত্যিই সরল হয়, তা-ও কম নয়। নিষ্ঠুরতার ভান করার চেয়ে তা অনেক ভাল।

ও কি বুঝেছে যে, ও সারা জীবন যত পাপ করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে?

পাপ কথাটা অত সহজে উচ্চারণ করিস না পরীক্ষিৎ কোনও মানুষ যদি নিজেকে সত্যিকারের পাপী মনে করে, তবে তার পক্ষে আর বেঁচে থাকাই মুশকিল।

হঠাৎ অবিনাশকে নিয়ে এত কথা কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার অবিনাশকে দরকার। পরীক্ষিৎ বলল, ওর সঙ্গে আমার কয়েকটা অ্যাকাউন্ট মেটাতে হবে।

অনিমেষ পরীক্ষিতের দিকে তেরছা ভাবে তাকায়। তারপর আচমকা প্রশ্ন করে, তুই কেমন আছিস রে পরীক্ষিৎ?

পরীক্ষিৎ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না। চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করে, কেন হঠাৎ একথা?

কী-রকম যেন মনে হচ্ছে, তুই কিছু দিন ধরে মনের মধ্যে কোনও কষ্ট নিয়ে আছিস।

কষ্ট? না, মনের মধ্যে কোনও কষ্ট নেই। তবে মাথায় যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে। সেই যে তোর ওখানে মাথায় লেগেছিল।

ওঃ, সেই অ্যাকসিডেন্টের কথা ভাবলেও এখন ভয় হয়! ও-রকম ভাবে ব্রিজ থেকে পড়ে গেলে কেউ –।

ও মোটেই অ্যাকসিডেন্ট নয়। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।

আত্মহত্যা? যাঃ! বেশ তো রেলিং-এর ওপর বসে বসে গান গাইছিলি। যাঃ ও ভাবে কেউ আত্মহত্যা করে? কেন, আত্মহত্যা করবি কেন?

এখন তো করতে চাইনা। সেদিন চেয়েছিলাম।

কেন?

আজ আর কারণটা মনে নেই। তবে সে-দিন মনে হয়েছিল, আর এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাই ।

আমি চুপ করে অনিমেষ আর পরীক্ষিতের কথা শুনছিলাম। পরীক্ষিতের কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললাম, তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? কিন্তু অবিনাশ যে অন্য কথা বলে।

কী বলে অবিনাশ?

অবিনাশ তো বলে, ও-ই নাকি হঠাৎ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তোকে?

অনিমেষ চমকে উঠে বলল, অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেবে? হাঃ, আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া অবিনাশ তো তখন কাছাকাছি ছিলই না। ও তো সিগারেট কিনতে গিয়েছিল।

তোমার মনে নেই। সিগারেট তো কিনতে গিয়েছিল তাপস। অবিনাশ নাকি।

পরীক্ষিৎ গম্ভীর ভাবে বলল, অবিনাশ বলে নাকি এই কথা? অবিনাশ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল? কেন? সে এ-কথা বলেছে?

জানি না। তোর আর অবিনাশের মধ্যে কী যে ব্যাপার আছে! যাক গে, তোর মাথায় এখন ব্যথা করে, তুই ডাক্তারের কাছে যা না।

যাব। কিছু টাকা ধার দিবি?

ওই তো! কিছু একটা ভাল কথা বললেই অমনি টাকা। দরকার নেই তোর ডাক্তারের কাছে যাবার।

দেনা। ক'টা টাকা ধার দেনা। বড়লোকের মেয়েকে পড়াচ্ছিস, তোর অনেক টাকা।

ধার বলিস কেন? কোনও দিন টাকা ফেরত দিয়েছিস? ভিক্ষে চাইতে পারিস না?

ঠিক এই সময় অবিনাশ ঢুকল আমার ঘরে। শান্ত মুখমণ্ডল। অবিনাশকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, ওর কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে। ও যখন মাধবীকে চেনে তখন হয়তো অবনীভূষণকেও।

অবিনাশকে দেখেই পরীক্ষিৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তোকে আমি এক মাস ধরে খুঁজছি।

অবিনাশ ওর বিশাল চেহারাটা নিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। পরিষ্কার দাড়ি কামানো, ওর কপালের কাছে কাটা দাগটা জ্বল জ্বল করছে। অবিনাশকে আমি পছন্দ করি ওর স্পষ্ট চোখ দুটোর জন্য। কত রকম বদমাইশিকরে অবিনাশ, কিন্তু ওর চোখে কোনও গ্লানি থাকেনা। চৌরঙ্গীতে চারটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের সঙ্গে যখন মারামারি করেছিল, তখনও ওর চোখ যে-রকম। কোনও মেয়ের সঙ্গে যখন সর্বনাশের ভূমিকা করে তখনও চোখ এক রকম।

পরীক্ষিৎ ও অবিনাশ দরজার আড়ালে গিয়ে কিছু বলাবলি করতে লাগল। আমি ও অনিমেষ চুপ। পরীক্ষিং আস্তে আস্তে কী বলল, শোনা গেল না। অবিনাশ শান্তভাবে বলল, না! পরীক্ষিৎ আবার অস্ফুট গলায় কিছু বলল, অবিনাশ পুনরায় শান্ত গলায়, না। পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে বলল, আমি তোর সর্বনাশ করে দেব। অবিনাশ বলল, আমি তো সর্বস্বান্ত, আমার আবার সর্বনাশ কী হবে?

অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি করে আমি বললাম, ও দুটো কী করছে? অনিমেষ উত্তর না দিয়ে শুধুহাসল। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য লাগছে। মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে হেমকান্তির অসুখ দেখতে গিয়েছিলাম। হেমকান্তিহয়তো বাঁচবেনা। সেদিনও, ঘরের মধ্যে গায়ত্রী হঠাৎ অবিনাশকে দেখে থমকে গেল। কঠিন গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। অবিনাশ আলতো ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, বলল, কিন্তু যত ভয়ঙ্কর কথাই হোক, রাগ করে বলতে পারবে না, হাসতে হাসতে বলল। গায়ত্রী আমার দিকে তাকাল। কী অস্বাভাবিক জ্বল জ্বলে তখন গায়ত্রীর চোখ। কোনও কারণে ও খুবই রেগে আছে। অবিনাশ আমাকে বলেছিল, তুই একটু বাইরে যা।

ওদের কী এমন কথা ছিল, যা আমার সামনে বলা যায় না? বন্ধুরা সবাই ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। এখন সবারই আপন কথা বাড়ছে।

খানিকটা বাদে অনিমেষ উঠে গেল ওদের কাছে। একটু পরে তিন জনেই ফিরে এল ঘরে। অবিনাশের চোখ আগের মতোই অবিচলিত, পরীক্ষিতেরমুখ ও চোখ লাল, অনিমেষের চোখ হলুদ। হলুদ চোখ–একথার কী মানে হয় জানি না, কিন্তু পরীক্ষিতের চোখ লাল দেখার পর অনিমেষের চোখ স্বাভাবিক ভাবেই হলুদ মনে হল। দুর্বোধ্যতার রঙ হলুদ। ফুলের মধ্যে যেগুলির রঙ হলুদ, সেগুলোই অপদার্থ। দুর্বোধ্যতা ফুলের মানায় না।

অবিনাশ ঠাণ্ডভাবে পরীক্ষিতের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল, পরীক্ষিৎ –সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চটাং করে এক থাপ্পড় কষাল অবিনাশের গালে (অনিমেষ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, আমি হাততালি দেবার জন্য তৈরি হলাম। দুজনেই বেশ তেজি, মারামারি হলে

জমবে ভাল। থাপ্পড় খেয়ে অবিনাশের মুখ নীল হয়ে গেল। তারপর অবিনাশ একটু হাসল। বলল, এটা হয়তো আমার পাওনা ছিল। কিন্তু তোর জন্য আমার দুঃখ হয় পরীক্ষিৎ।

বা-তোর শাস্তি, ইত্যাদি কিছু বলে পরীক্ষিৎ আর একটা থাপ্পড় মারার জন্য রেডি হতেই আমি ওকে ধরলাম। কী পাগলামি করছিস? তোদের ব্যাপারটা কী?

কিছুনা। তুই এর মধ্যে থাকিস না শেখর।

কেন আমি থাকবনা?

বলছি, তুই এর মধ্যে থাকিস না। তুই সব ব্যাপার জানিস না।

আচ্ছা থাকবনা, কিন্তু উলটে অবিনাশ একখানা ঝাড়লে তোর দাঁত ক'খানা আস্ত থাকরে?

ওকে ছেড়ে দে, শেখর, অবিনাশ বলল। যদি মারতে চায় মারুক। সব আঘাতেরই যে প্রতি আঘাত দিতে নেই, আমি এখন এই কথা শিখছি। রাগ আর ঈষাই হল পরীক্ষিতের ধর্ম। রাগ আর ঈর্ষা থেকেই পরীক্ষিৎ ওর বিখ্যাত লেখাগুলো লেখে। তাছাড়া ও বাঁচতে পারে না। ওকে থামিয়ে লাভ কী?

পরীক্ষিৎকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। রেগে গেলেই পরীক্ষিৎকে সুন্দর দেখায়, তখন ওকে মনে হয় অসহায়। ওর দর্পও অহঙ্কার কোথায় লুকোয়, করুণ মুখখানি ফুটে ওঠে। কী নিয়ে রাগারাগি তা আমি বুঝতে না পারলেও পরীক্ষিতের জন্য আমার দুঃখ হয়। যে-পরীক্ষিৎ সব সময় বন্ধুত্ব কিংবা সঙঘবদ্ধতার কথা বলে, হঠাৎ অবিনাশের ওপর ওর এত ক্রোধ কেন, কী জানি।

কাল তোর সঙ্গে যখন আবার দেখা হবে পরীক্ষিৎ, আমি সব ভুলে যাব। অবিনাশ আবার বলল, তুই সব কাজ করিস অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে। কিন্তু আমার সব ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন, সেই জন্যেই অনুতাপহীন।

এই ভাবেই জীবনটা চালাবি?

জীবন মানে তো পঞ্চাশ কি ষাট-সত্তর বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া? যার যে-রকম ইচ্ছে, সে সেই রকম কাটিয়ে যাবে। যতই চেষ্টা করিস-সত্তর, আশি, বড়জোর একশো বছর বাদে চলে যেতেই হবে, আর ফেরা হবে না। পাপপূণ্য যাই হোক, চামড়া শিথিল হবেই, চোখে ছানি পড়বেই, যৌনশক্তিও হরণ করে নেবে সময়। সুতরাং এই কটা বছর আমি প্রতি মুহূর্তের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে চাই। কেউ জুয়া খেলে সময় কাটায়, কেউ কবিতা লিখে- কোনটা ভাল বা বড় কেউ জানে না, যার যেটাতে নিশ্বাস নেওয়ার সুবিধে। কিন্তু সাহিত্য কিংবা শিল্পের জন্য আত্মত্যাগ কিংবা নিজেকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ বোকাদের কাণ্ড। জীবনটা নষ্ট করে অমরত্বের লোভ মাইরি, ভাবলে হাসি চাপতে পারি না। তিরিশ বছর কেটে গেছে, আরও তিরিশ কী চল্লিশ বছরের ভিসা আছে এখানে থাকায়। তারপর চলে যেতেই হবে, আর ফেরা যাবে না। মৃত্যুর পর তোর বইয়ের আর ক'টা এডিশান হল, কিংবা ইউনিভার্সিটিতে থিসিস লেখা হল –আর ফিরে এসে দেখতে পারবি না। একটাই জীবন, সেটাতে আমি প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে চাই।

পরীক্ষিৎ স্তম্ভিত ভাবে তাকিয়ে ছিল অবিনাশের দিকে। এই দীর্ঘ বক্তৃতা ও এতক্ষণ ধরে কী করে শুনল, কে জানে! অবিনাশও এ-রকম ঠাণ্ডাভাবে তো কোনও কথা বলে না। ওদের কিছু হয়েছে বোধহয়। অনিমেষ খুব আস্তে আস্তে বলল, কথাটা আপনি এমন ভাবে বললেন যেন খুবইনতুন এবং নিজস্ব। তা কিন্তু নয়।

কিন্তু আমার জীবনটা আমার নিজস্ব। সেটা আমার মত অনুযায়ীই চলবে আশা করি। অবশ্য, যদি হঠাৎ জেলে আটকে রাখে। আমি স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই।

অনিমেষ একটু হাসল। তারপর বলল, জেলে আটকে রাখবে কেন? অবিনাশবাবু, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি যদি আপনার মতো হতে পারতাম।

আমার মতো মানে? আমার মতো কী? আমি তো কিছুই হয়নি। লেখা-ফেখা ছেড়ে দিয়েছি। বিশেষ কোনও কাজকন্মও করি না। আমার মতো আবার হবার কী আছে?

তবু আপনার এই যে হালকা ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা, আমার বড় ভাল লাগে। যখন যা ইচ্ছে তাই করা, জীবন সম্পর্কে আপনার কোনও ভয় নেই, ভয় নেই বলেই আপনার মুখখানা খুব সুন্দর। যখন যে-কোনও মেয়েকে দেখলেই আপনার ছুঁতে ইচ্ছে করে, ভোগ করতে ইচ্ছে করে, আপনি চেষ্টাও করেন তৎক্ষণাৎ কিছু না ভেবে। জানেন, আমি এগুলো একদম পারি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমারও এ-রকম ইচ্ছে। কিন্তু পারি না।

অবিনাশ হাসতে হাসতে বলল, আসুন, আপনার সঙ্গে আমার জীবনটা বদলাবদলি করি।

অনিমেষ ব্যগ্রভাবে বলল, করবেন? সত্যি যদি করা যেত। আমি হঠাৎ বিয়ে করে জড়িয়ে গেলাম। মফঃস্বলে চাকরি। একদম ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে কলকাতায় থেকে আপনার কাছে ট্রেনিং নিই।

পরীক্ষিৎ বলল, মেয়ে পটানো ছাড়াও আর কী বিষয়ে ট্রেনিং দিতে পারবে?

অনিমেষ বলল, সেটাই-বা মন্দ কী। একটা কিছু পাবার চেষ্টা তো বটে। আচ্ছা অবিনাশবাবু, কোনও মেয়েকে পাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে কেমন লাগে? আমার এ অভিজ্ঞতাও নেই। আমার প্রথম যে-মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়, তাকেই বিয়ে করেছি। ও ব্যাপারটা বুঝতেই পারলাম না।

কিছু একটা যেন বলা দরকার, এই জন্যই আমি বললাম, এখনও সময় যায়নি। আফশোসের কিছু নেই। কথাটা বলার পরই আমি অন্য মনস্ক হয়ে পড়লাম আবার।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কীসের সময় যায়নি?

আমি অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও কী প্রশ্ন করছে বুঝতে পারলাম না।

অনিমেষ রোগা তীক্ষ্ণ মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের চাহনিতে প্রশ্ন। কীসের সময় যায়নি? আমিও ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কীসের সময় যায়নি?

বাঃ, তুমিই তো আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করলে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সময় গেছে কী যায়নি? তোমাকে? কেন? কী মুশকিল।

অবিনাশ হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, কী রে শেখর, তুই ঘুমোচ্ছিস নাকি?

কেন, ঘুমোব কেন?

তুই আগের কথা কিছু শুনিসনি বুঝি?

আগের কথা তো তোরা কিছুই বলিসনি আমাকে। যেটুকু বলেছিস, সেটুকু শুনব না কেন? কিন্তু ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন, কীসের সময় যায়নি? সময় আবার কীসের কী? সময় কি তোর কিংবা আমার, আলু-পটলের কিংবা মানুষের? এ-রকম হয় নাকি? আমি বলেছি, এখনও সময় যায়নি, তার আবার কীসের কী? সময় যায়নি, সময় যায়নি, ব্যাস ফুরিয়ে গেল! আমার কি চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে? সুতরাং সময় যায়নি

অবিনাশ উদাস ভাবে বলল, শেখরের মেজাজটা আজ খারাপ হয়েছে। চল কেটে পড়ি।

সত্যিই হয়তো আমি ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না। চোখের সামনে প্রুফ, মাথার মধ্যে ক্ষমাপ্রার্থী আর পুলিশের লুকোচুরি, ঘরের মধ্যে তিন বন্ধুর বকবকানি এ-সব কিছুতেই আমার মন লাগছে না, এক একবার বিদ্যুতের মতো মনে ছায়া ফেলে যাচ্ছি। এক মাথা কোঁকড়া চুলসুদ্ধ মাধবীর মুখ, সেই মুখও বেশিক্ষণ থাকছে না। তার পরই মনে হচ্ছে, আমি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কী সুন্দর ভাবে আমার চুল আঁচড়নো, বোধহয় ক্রিম মেখেছি। আমার মুখের চামড়া এমন চকচকে, আমার গায়ে একটা হালকা সিল্কের শার্ট, আমি জামার হাতায় বোম পাচ্ছি। এ কে? আমি না অবনীভূষণ? আপনাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে? ওঃ! ড্যাম ইট! হু দা হেল ওয়াজ অবনীভূষণ? আমি কেন অবনীভূষণের মতো দেখতে হব? অথবা, আমাকে দেখে কেন অবনীভূষণের কথা মনে পড়বে? আমার নিজেরই বার বার মনে পড়ছে অবনীভূষণের কথা। নিজের কথা ভাবতে

পারছি না, অবনীভূষণের কথা মনে পড়ছে আমার। ড্যাম ইট! আমাকে ভুলতে হবে এ সব। আমার রাত্রে ঘুম চাই। আমাকে ভুলতে হবেই এ সব কথা, অর্থাৎ আমার নিজের মুখও আমাকে ভুলতে হবে। মাধবী-ফাধবী সকলের কথা আমায় ভুলতে হবে। গগনেন্দ্র একটা নেশার কথা বলেছিল, কালো রঙের সন্দেশ, সন্দেশের মধ্যে কী যেন মেশানো থাকে, দুটো সন্দেশ খেলেই পাঁচ ছঘন্টার মতো আর কিছু মনে থাকে না। গগন খেয়ে দেখেছে, একবার গেলে হয় গগনের কাছে। পরীক্ষিৎ অবিনাশরা এখন বিদায় হলেই বাঁচি।

ওরা এখনও সেই প্রেম-ফ্রেম নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে। এখনও বড় ছেলেমানুষ রয়ে গেল! যার যা ইচ্ছে কর না গিয়ে, তাই নিয়ে অত আলোচনা করার কী আছে? অনিমেষটা মহা ন্যাকার মতো তখনও অবিনাশকে জিজ্ঞেস করছে, বলুন না, কোনও মেয়ে প্রত্যাখ্যান করলে বুকের মধ্যে কীরকম লাগে?

পরীক্ষিৎ বলল, অবিনাশ এ পর্যন্ত কোনও মেয়ের কাছে হার মানেনি। একবার যার ওপর চোখ ফেলেছে, তার আর নিস্তার নেই, শালা এমন শয়তান।

অনিমেষ বলল, যাঃ, তা কখনও হতে পারে না। এত মেয়ের সঙ্গে রোজ কাণ্ড কারখানা চললে একবার না একবার আঘাত পেতেই হবে। সব মেয়েই কি অমনি রাজি হয়ে যায়?

পরীক্ষিৎ বলল, তুই অবিনাশকে চিনিস না। ওকে কোনও ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকতেই দেওয়া উচিত নয়। ও যে-বাড়িতেই যাবে, সে-বাড়িতে যে-কোনও মেয়ে থাকলেই সম্পর্ক যাই হোক না।

অনিমেষ মাথায় চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে চিরুনির মতো চালিয়ে বলল, আমি কিন্তু জানি, অন্তত একটি জায়গায় অবিনাশ হেরে গিয়েছিল। একটি মেয়ে অবিনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি।

অবিনাশ চুপ করে সিগারেট টানছিল, এর মুখ তুলে তাকাল। আমার অধৈর্য লাগছিল, এরা গেলে বাঁচি! তবু আমি অনিমেষকে বললাম, অবিনাশ কোথায় ব্যর্থ হয়েছে, তা তুমি জানলে কী করে?

অনিমেষ বলল, হ্যাঁ জানি। অন্তত একটি মেয়ের কাছেও যে অবিনাশ ব্যর্থ হয়েছে, আমি সেকথা জানি।

অবিনাশ এবার বলল, এ-সব কী হচ্ছে কী? একটা কেন, আমি বহু মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। বলতে গেলে আমি সব মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। কারুর কাছেই আমি কিছু পাইনি। মেয়েদের দেবার কিছু নেই। সব গুজব।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অবিনাশ, তুই মেয়েদের কাছে কী চেয়েছিস রে, যে ব্যর্থ হয়েছিস?

অবিনাশ বলল, কী চেয়েছি, তা জানি না। তবে প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে, চেয়েছিলাম নাক, পেলাম তার বদলে নরুণ।

তার মানে? ঠিক ঠিক মেয়ের সঙ্গে তোর এখনও দেখা হয়নি।

তুই যদি তেমন মেয়ের দেখা পেয়ে থাকিস, তাহলেই ভাল। যাকগে ও-সব কথা, অনিমেষবাবু, আপনি যা জানতে চাইছিলেন, তার উত্তরে শুনে রাখুন, অনেক মেয়ের কাছেই নেহাৎ শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে গিয়েই আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরীক্ষিৎ যা বলছে তা বাজে কথা, আসলে বেশির ভাগ মেয়েই আমাকে পছন্দ করে না। কেউ কেউ একবারের বেশি দু’বার পছন্দ করে না।

পরীক্ষিৎ উঠে দাঁড়াল, সোজা এগিয়ে এল অবিনাশের সামনে, তারপর রুক্ষ গলায় বলল, হারামজাদা। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ অবিনাশের ঠিক মুখের ওপর একটা প্রবল ঘুষি চালাল,

অবিনাশের নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে এল রক্ত। অবিনাশ উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি আর অনিমেষ ওদের মাঝখানে দাঁড়ালাম।

অবিনাশ রুমাল দিয়ে মুখ মুছল, আমাকে বলল, আমার হাত ছেড়ে দে। আমি পরীক্ষিৎকে কিছু বলবনা। ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না। রাস্তার একটা লোকও এ-রকম করলে এতক্ষণে তার মাথা ফাটিয়ে দিতাম, কিন্তু পরীক্ষিৎটা নেহাত বোকা বলেই ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না।

পরীক্ষিৎ তখনও গজরাচ্ছিল, আমার খুবই অস্বাভাবিক লাগছিল পরীক্ষিতের ব্যবহার। এ-রকম শিশুরমতো রাগ দেখাচ্ছে কেন? কী করেছে ওর অবিনাশ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, পরীক্ষিৎ, তুই এমন পাগলের মতো রাগ করছিস কেন?

পরীক্ষিৎ গর্জন করে উঠল, জোচ্চোর মিথ্যুকটাকে একদিন আমি শেষ করে দেব বলে দিচ্ছি।

কী মিথ্যে কথা বলেছে অবিনাশ?

ও কেন বলেছে, ও আমাকে ব্রিজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। কী ওর মতলব?

সত্যি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলেনি? কী রে অবিনাশ?

অবিনাশ তখনও মুখ মুছছিল, কোনও উত্তর না দিয়ে হাসল। পরীক্ষিৎ বলল, মোটেই ও ধাক্কা দেয়নি, ও আমার কাছেই ছিল না। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।

অনিমেষ বলল, আত্মহত্যার ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক, না? আমার কিন্তু স্পষ্ট ধারণা ওটা একটা দুর্ঘটনা।

আমি অবাক ও বিরক্ত হয়ে বললাম, এ-সব কী হচ্ছে কী গাড়লের কাণ্ড? আত্মহত্যা, ঠেলে ফেলা, দুর্ঘটনা– যাই হোক না, ব্যাপারটা তো হয়ে গেছে এক বছর আগে। তাই

নিয়ে এখন মারামারি করার কী আছে? পরীক্ষিৎ, তোকে যখন অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেয়নি জানিস, তবু তুই কেন অবিনাশের ওপর রাগ করছিস? তাহলে তো ওর কোনও দোষই নেই।

ও বলছে কেন, ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ও মিথ্যে কথা বলছে কেন? ওর কিছু একটা মতলব আছে এ ব্যাপারে। আমি সেটা জানতে চাই।

অনিমেষ বলল, দু'একটা মিথ্যে কথা বলার অধিকার সবারই আছে। অবিনাশই-বা কেন মাঝে মাঝে দু'একটা মিথ্যে কথা বলবেনা? এতে রাগের কী আছে?

অবিনাশ আবার হাসল। এবার সরাসরি পরীক্ষিৎকে বলল, পরীক্ষিৎ, আমি কি দুটো-একটা মিথ্যে কথাও বলতে পারব না এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নাকি তোরকাছে? তুই মাঝে মাঝে দু'একটা মাত্র সত্যি কথা বলতে পারিস, আমিই-বা তাহলে ঠেলে ফেলার মিথ্যে কথাটা বলতে পারব না কেন? মুশকিল হচ্ছে, তোর সত্যি কথাও সবাই মিথ্যে বলে মনে করে। আসলে তুই কী বলতে চাইছিস, আমি জানি। বলেই ফেল না! তুই তো বলতে চাইছিস, অনিমেষের ওখানে গিয়ে আমি ওর বউ গায়ত্রীর সঙ্গেও কিছু একটা করেছি।

আমি চমকে উঠলাম। অবিনাশের মুখ ভাবলেশহীন। এই কথাটা আমি অন্য কোথাও শুনলে হেসে উঠতাম কিংবা একটা অশ্লীল ইয়ার্কি করতাম। কিন্তু যেহেতু নিজের বাড়িতে বসে আছি এবং নিজের বাড়িতে সকলেই কিছুনা-কিছু সংরক্ষণশীল, তাই আমি বললাম, ছি ছি, এ-সব কী বলছিস অবিনাশ? তোর মুখে কিছুই আটকায় না?

অবিনাশ অবিচলিত ভাবে বলল, কেন, এতে দোষের কী আছে? মুখের কথা তো। গায়ত্রী তো আরশুনছেনা?

অনিমেষও বিচলিত হয়নি। সে বলল, আপনি কী করে জানলেন, পরীক্ষিৎ এ-কথাটাই বলতে চাইছে?

অবিনাশ বলল, পরীক্ষিতের ব্যবহারেইস্পষ্ট বোঝায়। অনেক দিন থেকেই ও এ-রকম একটা কথা বলতে চাইছে।

অনিমেষ বেশ সহাস্য মুখে বলল, এ-সব কথা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবরা আলোচনা করে নাকি? মনে করুন, যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়, তাহলেইবা পরীক্ষিৎ সেটা বলার জন্য ব্যাকুল হবে কেন? আমি বুঝতে পারছি না, আপনারই-বা এত মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কেন, আর পরীক্ষিতেরই-বা সত্য প্রকাশ করার এত ব্যাকুলতা কীসের?

অবিনাশ বলল, সেইটাই তো আমিও বুঝতে পারছি না। আমি মিথ্যে কথা বলি এমনিই, শখ করে, কিন্তু পরীক্ষিতের তো সত্য কথা বলার সখ কোনও দিন ছিল না।

পরীক্ষিৎ এবার গম্ভীর ভাবে বলল, না, ও-কথা আমি বলতে চাইনি মোটেই। ও-সব কথা আমি কখনও ভাবিইনি। এইটাও অবিনাশের আর একটা ধাপ্পা। হঠাৎ কেন একথা বলল, কে জানে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, গেট আউট, সব্বাই এক্ষুনি গেট আউট। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার মাথা ধরেছে তখন থেকে, আর তোরা এখানে বসে ইয়ার্কি মারছিস। বিদায় হএখন, ওফ।

অবিনাশ বলল, দাঁড়া না, পরীক্ষিতের সমস্যাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক। পরীক্ষিৎ কী চায় সেটা দেখাই যাক না। আমি যতই সরল ভাবে বাঁচতে চাইছি, পরীক্ষিৎ ততই আমাকে জড়াতে চাইছে কেন, কে জানে।

আমি বললাম, মীমাংসা করতে হয়, ময়দানে যাও। আমার ঘরে বসেও-সব ধাঁধা-মার্কা কথাবার্তা চলবেন। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের কথা ভুলে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল মাধবী এবং অবনীভূষণের ব্যাপার। এগুলোও ভুলতে হবে। আমি উঠে জামাটা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গগনেন্দ্র খোঁজ করতে।

সে-দিন সন্ধেবেলা খুব বৃষ্টি, অনেক দিন পর বৃষ্টিতে ভিজে বেশ ভাল লাগছে, মাথার মধ্যেটা পরিষ্কার, মনে হচ্ছে মাথা ধরাটাও সেরে গেছে। আর, এমন ঝরঝরে লাগছেশরীর। এই শরীর নিয়ে সন্ধেবেলা আমি কী করব? একটা কিছু করার দরকার। আর যাই করি, কোনও বন্ধু-বান্ধবের ছায়াও মাড়াতে চাই না আজ। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ দু'এক দিন ধরে অসহ্য লাগছে। ছায়াদির বাড়িতেও যাওয়া যাবে না, ওখানে গেলেও কারুর না-কারুর সঙ্গে তো দেখা হবেই। বারীনদার ওখানে গিয়ে তাস খেলারও সেই অসুবিধে, ওখানে তো অবিনাশ থাকরেই।

শরীরটা ছটফট করছে। কিছুক্ষণ বৃষ্টির মধ্যেই ছপ ছপকরেহেটলাম। চৌরঙ্গির রাস্তাটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘণ্টা খানেক ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই পথে একজনও পথচারী নেই। আমি ছাড়া গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে শুধু, আর কালো পিচঢালা রাস্তা। এই রাস্তায় আমি একা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে, আমি চুপচাপ করে হাঁটছি। আঃ, এত ভাল লাগছে, একাকিত্ব এত সুন্দর, এমন উপভোগ্য আগে কখনও ভাবিনি। মিথ্যে মিথ্যে কী বিশ্রী হুল্লোড়ে সময় কাটিয়েছি। এক একটা রাত অবিনাশ, তাপস, গগনেন্দ্র, পরীক্ষিতের সঙ্গে মল্লিকা কিংবা রমলার ঘরে, ও-সবকথা আর ভাবতেও ভাল লাগে না।

মাধবীকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে না? মাধবীকে কোনও দিন টেলিফোন করিনি, সন্ধেবেলায় মাধবীকে কেমন দেখতে লাগে তা-ও তো দেখিনি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুধু দুপুরবেলা। মাধবীর সঙ্গে অরুণা আর চিত্রলেখা নামে আরও দুটি মেয়ে পড়তে আসত আমার কাছে। যত দিন ওরা তিন জন ছিল তত দিন ওরা শুধু ছাত্রীই ছিল, কোনও দিন ওদের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখিনি, এমনকী কোনও মাসে টাকা দিতে দেরি করলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছি পর্যন্ত। তারপর চিত্রলেখার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, অরুণার বাবা বদলি হলেন দিল্লিতে, তখন মাধবী একা, সেই একা মাধবীর

দিকেই আমি প্রথম চোখ তুলে তাকালাম। মাধবী একা একা আমার কাছে আসেই বা কেন? অমন বড়লোকের মেয়ে, ইচ্ছে করলে বাড়িতেই তিনটে প্রফেসার রাখতে পারে, তবু দুপুরবেলা একা, আমার মতো ছোকরা মাস্টারের কাছে আসে কেন? তার কারণ কী, আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, সেই জন্য?

আঃ, আবার অবনীভূষণ! না, আমি অবনীভূষণের কথা কিছুতেই ভাবতে চাই না।

পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে সোজাকাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, একটা টেলিফোন করতে দেবে?

ম্যানেজারটা চিৎকার করে বলল, করছেন কী, করছেন কী! সারা গা দিয়ে জল পড়ছে, আমার কার্পেটটা ভিজিয়ে দিলেন যে।

দোকানে বেশি ভিড় নেই, সত্যি কার্পেটটা অনেকখানি ভিজে গেছে। আমি একটু অপ্রতিভ ভাবে বললাম, হ্যাঁ, খুব ভিজে গেছি। একটা জরুরি টেলিফোন– ।

টেলিফোন পরে করবেন। আগে গা মুছে ফেলুন। বেয়ারা, সাবকো একটা টাওয়েল দো।

বেয়ারা একটা ধপধপেটাওয়লে নিয়ে এল। আমি কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাংলা কথা বলবে তাই-ই আশা করিনি, তার ওপর এমন সহৃদয়তা। অনায়াসে আমাকে বার করে দিতে পারত। কিছু দিন আগে এই দোকানেই তো অবিনাশ এক দিন মাড়োয়াড়ি দলের সঙ্গে হাতাহাতি করেছিল। আমিও দলে ছিলাম। ম্যানেজার আমাকে চিনতে পারেনি। আমি ওকে প্রকৃত ধন্যবাদ জানিয়ে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে টেলিফোন ডিরেকটারিটা নিলাম। যাঃ চলে, মাধবীর তো বাবা মারা গেছেন জানি, তাহলে টেলিফোনটা কার নামে? মাধবীর নামে নিশ্চয়ই নয়। ওর মা কিংবা বাবার নামে যদি হয় –জানার উপায় নেই। তবে ওদের বাড়ির ঠিকানা জানি। ইনফরমেশনের ডায়াল ঘুরিয়ে মাধবীদের বাড়ির ঠিকানা বলে টেলিফোন নম্বর জানতে খুব অসুবিধে হল না।

মাধবীদের নম্বর ঘোরালাম। ও-দিকে এক জন পুরুষ কণ্ঠ। বলুন?

আমি কোনও দ্বিধা না করে বললাম, মাধবীকে ডেকে দিন।

লোকটি যদি জানতে চাইত কে টেলিফোন করছে, তাহলে কী বলব আমি ভেবেই রেখেছিলাম। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করল না, বলল, ধরুন। তারপর ধরেই রইলাম। বহুক্ষণ, কেউ আর আসে না। কোনও সাড়া শব্দ নেই। ছেড়ে দেব কিনা ভাবছিলাম, তখন মাধবীর গলা পেলাম, হ্যালো? কে?

মাধবী, আমি মাস্টারমশাই কথা বলছি।

মাধবী একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করল, কোন মাস্টারমশাই?

তোমার ক'জন মাস্টারমশাই আছেন?

উপস্থিত তিন জন, ছেলেবেলা থেকে হিসেব করলে দশ-বারো জন হবেন নিশ্চয়ই।

তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

উঁহু।

আমি তো গলার আওয়াজ শুনেই তোমাকে চিনতে পেরেছি।

কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমি কখনও টেলিফোনে কথা বলিনি, তাই চিনতে পারছি না।

মাধবী, তুমি কী করছিলে?

সাজগোজ করছিলাম। এক্ষুনি সিনেমা দেখতে বেরুব।

কার সঙ্গে?

তা আপনাকে বলব কেন?

ও

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আর কোনও কথা কি বলার আছে? মাধবীই প্রশ্ন করল, কোনও দরকারি কাজের কথা ছিল?

হ্যাঁ। মাধবী, অবনীভূষণ কে?

এই জন্য আপনি ফোন করছেন? আচ্ছা পাগল তো!

মাধবী হাসল। জলের মধ্যে কুলকুচা করার মতো টেলিফোনে সেই হাসির আওয়াজ। আমি তবু বললাম, হ্যাঁ, একথাটা জানা আমার খুবই দরকার। অবনীভূষণকে আমি একবার চোখে দেখতে চাই। সে কোথায় আছে?

এক্ষুনি তা শুনতে হবে? কেন? কাল দুপুরে যাব, তখন বলব। এখন ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যাঁ?

কেন, ছেড়ে দেবে কেন? আরও কথা আছে।

টেলিফোনে আপনি মেটেই কথা বলতে পারেন না ভাল করে। আপনার গলা কীরকম যেন অন্য রকম শোনাচ্ছে। বরং আপনি যখন চুপকরে চেয়ে বসে থাকেন, তখন –।

তখন কী?

কিছুনা।

মাধবী লাইন কেটে দিল। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল না, আঘাত পেলাম না কোনও। খানিকটা অবাক লাগল। আমি যখন চুপ করে বসে থাকি, তখন কী হয়? তখন কী আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখায়? সেই জন্যই কি আমার চুপ করে বসে থাকতেই আজকাল

বেশি ভাল লাগে? আঃ, অবিনাশের কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করা হল না আজও।

কফিটা খেয়ে বেরুলাম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ি বারান্দার নিচে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা চোখের পাতায় বোধহয় সবুজ রঙ মেখেছে। তাই ওর চোখের দিকে আমি দু'বার তাকালাম। মেয়েটিও আমার চোখের দিকে সোজা তাকাল। আমি তো আর চোখে রঙ মাখিনি, তবে আমার দিকে ও তাকাচ্ছে কেন? সেইটাই জানার জন্য আমি ওর দিকে আবার তাকালাম। মেয়েটি এবার আমার দিকে একটু এগিয়ে এল, একটা ঝলমলে সোনালি রঙের গাউন পরেছে। চুলের রঙও কিছুটা সোনালি ওর, কিন্তু চেহারা রোগাটে। মেয়েটি বলল, হ্যালো মিস্টার!

আমি বললাম, কী?

স্যাডার স্ট্রিটটা কোন দিকে বলতে পারো?

আমি একটু হাসলাম। উত্তর দিলাম, এই বৃষ্টিতে পার্ক স্ট্রিটে এসে একা দাঁড়িয়ে আছ, আর স্যাডার স্ট্রিট চেনো না?

মেয়েটি আমার সঙ্গে হাঁটছিল, সে-ও হেসে বলল, আমি চিনি। দেখছিলাম তুমি চেনো কি না।

স্যাডার স্ট্রিটে তোমার ঘর আছে?

না, হোটেল রুম, দশ টাকা প্রতি ঘণ্টা।

আর তোমার?

তিরিশ টাকা, যদি এক ঘণ্টা থাকো।

তিরিশ আর দশ চল্লিশ, এক ঘণ্টা তোমার সাহচর্যের জন্য? বড় বেশি নয় কি?

ডোন্ট বি মিন।

তোমার শরীরের জন্য চল্লিশ টাকা, আর আমারও তো শরীর আছে, তার কোনও দাম নেই? তার জন্য তোমারও কিছু দেওয়া উচিত। তুমি আমাকে কত দেবে বলো?

আই উইস, আই কুড। কিন্তু তুমি তো জানো–

শুধু শুধু সময় নষ্ট করলে। আমার কাছে তোমার কোনও সুবিধে হবে না।

কেন? তোমার কাছে টাকা কম আছে? কত আছে?

টাকার জন্য নয়। আমার ভাল লাগে না।

ইয়ং ম্যান, আজ এই রকম লাভলি ওয়েদার, ডোণ্ঢাযু নিড আ কমপ্যানিয়ন?

কিন্তু তোমার কমপ্যানি আমার ভাল লাগবেনা।

কেন, আমি কি দেখতে খারাপ?

না, তা নয়। তোমাদের আর আমার ভাল লাগে না। আই অ্যাম ইন লাভ।

ইন লাভ? উইথ আ বেঙ্গলি গার্ল? ডাজ সি লাভ যু টু?

ঠিক জানি না। আচ্ছা, আমার কী করা উচিত বলে তো? আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে কি না জানি না। এখন আমি কী করব?

মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে আমার সঙ্গে চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত এসেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খুবই চিন্তিত ভঙ্গি করে বলল, দেয়ার আর সেভরাল ওয়েজ। আচ্ছা, মেয়েটি তোমাকে চেনে তো? তার বাড়ি কি খুবকনজারভেটিভ?

না। মেয়েটি আমাকে চেনে।

মেয়েটি খুব সুন্দর দেখতে? সুইটলুকিং?

প্রায়।

আচ্ছা, ওকে এক দিন আলাদা তোমার সঙ্গে ডিনারে নেমন্তন্ন করো না।

আমি হঠাৎ হাসতে লাগলাম। বেশ জোরে হাসি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি একটু আহত ভাবে বলল, হোয়াটস ফানি ইন ইট?

তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার কথা আলোচনা করছি। এটা ফানি নয়?

কেন, আমরা স্ট্রিট গার্ল বলে কি ভালবাসা সম্পর্কে কিছু জানি না? জানো, আমিও—।

প্লিজ, আমাকে ও-সব গল্প শুনিও না। আমি ওগুলো সব জানি।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না? আমিও–।

বিশ্বাস করছি, কিন্তু গল্পটা শুনতে চাইনা। ওসব গল্প এক রকম।

মেয়েটি আহত, অপমানিত মুখে চুপ করে যায়। আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজে ওর মুখের চেহারা আরও করুণ হয়ে এসেছে। তখন আর কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই। মেয়েটি শেষ চেষ্টা হিসেবে বলে, চলোনা, কাছেই তো আমার হোটেল, একটুক্ষণ গিয়ে বসবে। আর কিছু না, জাস্ট লাইক ফ্রেন্ডস। সেখানে আমরা তোমার প্রব্লেম নিয়ে আলোচনা করব? প্লিজ।

আমার কোনও প্রব্লেম নেই। তোমাকে মিথ্যে কথা বলছিলাম। আসলে আমি জানি, আমি যে-মেয়েটিকে ভালবাসি, সে অন্য একটি ছেলেকে ভালবাসে।

স্যাড। কিন্তু এ নিয়ে তোমার বেশি দিন দুঃখ করার কোনও মানে হয় না।

নাঃ বেশি দিন করবনা।

তোমার নাম জানতে পারি? আমার নাম মার্থা হে, এম সি হোটেলে থাকি।

আমার নাম অনীভূষণ রায়। আমার দুঃখ কেটে গেলে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করব।

.

পরদিন দুপুরে মাধবী এল না, এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে আর এল না, কোনও খবরও পাঠাল । মাধবীনা আসায় একহিসেবে আমি খুশিই হয়েছি। হঠাৎ বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম কাল সন্ধে থেকে, মাধবীর সামনেও হয়তো উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলতাম। হয়তো মাধবীকে বলে ফেলতাম, তোমাকে আমি ভালবাসি। ওকথা বললে খুবই খারাপ হত, ও কথা বলা যায় না, মাধবীকে এখনও বলা যায় না। আসলে মাধবকে আমি ভালবাসি কি না সত্যিই তো জানি না। মাধবীর সামনে শুধু একা বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। এর নাম কি ভালবাসা? না, এখনই ভালবাসার কথা বলা যায় না। তার আগে, অবনীভূষণের সমস্যা আমাকে দুর করতে হবে।

মাধবী আসেনি, কিন্তু আমি জানি মাধবীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবেই। আমি যা চাই, তা চিরকালই পেয়ে থাকি। যা পাবনা কখনও, তা আমি আগে থেকেই জানতে পারি। তা পেতেও চাই না আমি। চেয়ে ব্যর্থ হওয়া আমার স্বভাবনয়। সূর্যকে যে আমার ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখিনি, তার কারণ, আমি কখনও তা চাইনি বলে। যেদিন আমি চাইব, সে-দিন শালা সূর্যকেও আমার ঘরে আসতে হবে। আপাতত, আমি মাধবীকে চাই কিনা ভাবিনি, ওর ভালবাসা চাই কিনা ভাবিনি, আমি ওকে দেখতে চাই। জানি ওর সঙ্গে দেখা হবেই। অবনীভূষণকেও ঠিক আমি দেখতে চাই কিনা জানি না, হঠাৎ অবনীভূষণকে দেখলে আমার কী অবস্থা হবে তা-ও বুঝতে পারছি না। আমার মুখোমুখি যদি আমারই মতো দেখতে আরেক জন মানুষ দাঁড়ায়, তবে সে-দৃশ্য তো ভয়াবহ। হয়তো ওকে আমার মতো দেখতে নয়, কোনও একটা ভঙ্গি বা মুখের রেখা, কিংবা অভ্যেসের মিল আছে,

আর কিছুনা। অবনীভূষণ বেঁচে আছে কিনা, তা-ও জানতে হবে। অবিনাশের কাছে কিছুই জানা গেল না। এর মধ্যে অবিনাশের সঙ্গে এক দিন দেখা হল। কী ভয়ঙ্কর চেহারা সে-দিন অবিনাশের। কোথাকার কোন পার্টি থেকে ফিরছিল, সঙ্গে দু'জন অচেনা লোক ওর দু'হাত ধরে আছে, ধর্মতলায় অবিনাশের সঙ্গে আমার রাত সাড়ে দশটায় দেখা। অবিনাশ তখনও বদ্ধ মাতাল। চোখ দুটো টকটকে লাল, মাথার চুল হাতের মুঠোয়, অসম্ভব করুণ মুখখানা। যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। অবিনাশ আঃ আঃ করে আওয়াজ করছিল আর্তনাদের মতো, অথচ তখন ওর বেশ জ্ঞান আছে। আমাকে দেখে অবিনাশ জড়িয়ে ধরল, বলল, শেখর, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেশি খেয়ে ফেলেছিস?

ও বলল, না না, বেশি খাইনি। আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।

কীসের কষ্ট?

তা জানি না। আঃ, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে যে। বেশি মদ খেয়েছি তো, তাই কষ্টের কথা বলতে পারছি, অন্য সময় তো বলতে পারি না!

কেন, কষ্ট হচ্ছে কেন?

তাই তো জানি না। দ্যাখ শেখর, আমি বার বার জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। সেই জন্যই কি আমার কষ্ট হচ্ছে? কী জানি! চল, তুই একটু খাবি!

না।

তুই আজকাল আর খেতে চাস না কেন রে?

আমার আর ভাল লাগে না।

তোর তো কোনও কষ্ট নেই, তুই আর খাবি না কেন?

তুই কি কষ্টের জন্য মদ খাস নাকি? দেবদাস হচ্ছিস?

উহুঁ, ও-সব মেয়েছেলের জন্য কষ্ট নয়, অন্য রকম, ওঃ!

অবিনাশকে এ-রকম কাতর কখনও দেখিনি। অবিনাশ আরও মদ খাবার জন্য পেড়াপিড়ি করে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যাব ঠিক করেই, হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়। জিজ্ঞেস করলাম, তুই মাধবী সান্যালকে চিনিস?

অবিনাশ বলল, কে মাধবী? তোর কাছে যে-মেয়েটা পড়তে আসে। হ্যাঁ, খুব ফাইন মেয়ে, একটু মোটার ধাঁচ, কিন্তু বুক দুটো কী চমৎকার।

ওসব বাজে কথা রাখ। তুই ওর বন্ধু অবনীভূষণ বলে কারুকে চিনিস?

অবনীভূষণ? টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আবার এ-রকম নাম হয় নাকি? কেন? তাকে চিনে কী হবে?

না, এমনিই। মাধবী প্রায়ই বলে, আমি নাকি অবনীভূষণের মতো দেখতে।

তাই বলে নাকি? আশ্চর্য তো! সত্যিই তো, তোকে অবিকল অবনীভুষণের মতই তো দেখতে। মাইরি শেখর, বিশ্বাস কর, অবিকল, হুবহু অবনীভূষণের মতোই তোকে—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ!

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ গলা ফাটিয়ে মাতালের হাসি হাসতে থাকে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে সোজা চলে এসেছিলাম সেদিন।

কদিন থেকেই ছায়াদির অসুখ শুনছিলাম, অনেক দিন ওদের বাড়িতে যাইনি। কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে এল, আর ছুটি নেওয়া যাবে না। কলেজটা ছাড়তে হবে এবার, সকালবেলা গিয়ে পড়ানো আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। কোনও দিন রাত্রে ভাল ঘুম হয় না,

সকালবেলা দশটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে কলেজে ছুটতে একেবারেই ইচ্ছে করে না।

সকালে চা খেয়েই একবার ছায়াদির বাড়িতে ঘুরে এলাম। গায়ত্রী বারান্দায় রোদ্দুরে বসে ছেলেকে অলিভ অয়েল মাখাচ্ছিল। অনিমেষরা তাহলে এখনও যায়নি। একটা হলদে রঙের শাড়ি পরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে গায়ত্রী ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে। বেশ দেখাচ্ছে ওকে, মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি। গায়ত্রী আমাকে দেখে বলল, অনেক দিন আপনাকে দেখিনি। একটু রোগা হয়ে গেছেন!

আমি বললাম, আপনিও তো অনেক রোগা হয়ে গেছেন! গায়ত্রী লজ্জিত ভাবে হাসল। অয়েল ক্লথের ওপর শুয়ে ছেলেটা খল খল করে হাসছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি আলগা ভাবে বললাম, ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে আপনার ছেলেকে! গায়ত্রী এবারও হেসে ছেলেকে বুকে তুলে নিল। কথাটা আমি এমনিই বলতে হয় বলেই বলেছি। ওইটুকু একটা বাচ্চা, নাক চোখ কিছুই ভাল করে ফোটেনি, ওকে আবার দেখতে সুন্দর আর কুৎসিত কী? যখন বড় হবে, পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে পারবে, তখনই বুঝব, বাছা মুখের ওপর সুন্দরকে রাখতে পারে, না মুখখানা ভূতের মতো বানিয়ে তুলবে। ছেলেকে বুকে তোলার গায়ত্রীকে একেবারে ছবির মাতৃমূর্তির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, মা হবার পরেও সেই মেয়ের সঙ্গে পুরুষরা এক বিছানায় শোয় কী করে? দেখলেই তো ভক্তি আসে, তখন আর ওসব ব্যাপার– । যাকগে, এ তো আর আমার সমস্যা নয়। গায়ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, অনিমেষ কোথায়? ও বলল, অনিমেষ একটু বেরিয়েছে।

সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে ছায়াদি শুয়ে ছিল। ছায়াদির মুখের ভাব এমন, যেন কোনও গুরুতর অসুখ হয়েছে। আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়তো। শীর্ণ হেসে হাত বাড়িয়ে ছায়াদি বলল, এসো শেখর, বসোনা না, বিছানায় বোসোনা, ওই চেয়ারটা টেনে নাও।

কেন, বিছানায় বসবনা কেন?

এসব অসুখ বড় ছোঁয়াচে।

আমি একটু হেসে বিছানাতেই ছায়াদির পায়ের দিকে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আজ, ছায়াদি?

অপ্রত্যাশিত ভাবে ছায়াদি উত্তর দিল, ভাল আছি। খুব ভাল আছি এখন। খুব ভাল লাগছে।

জ্বর ছেড়ে গেছে?

না, সকালেই আবার জ্বর এসেছে। সেই জন্যই ভাল লাগছে। অসুখ হলেই আমার ভাল লাগে। অন্য সময় কীরকম যেন ঠিক বুঝতে পারি না।

চাদরের বাইরে ছায়াদির পা বেরিয়ে ছিল। আমি একটা হাত ছায়াদির পায়ে বোলাতে লাগলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা পা। জ্বর-টর কিছু নেই। তবু ছায়াদি কেন বলল, একটু আগেই ওর জ্বর এসেছে? কেন যে লোকে অকারণে মিথ্যে কথা বলে। আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম।

ছায়াদি হঠাৎ হাসতে লাগল। বলল, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাকে খুঁজছ, সে নেই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে নেই? কাকে খুঁজছি আমি?

ছায়াদি সেই রকমই মুখ টিপে হেসে বলল, মায়া পরশু দিন মামার বাড়িতে গেছে।

আমি মায়াকে খুঁজব কেন?

সবাই তো আজকাল এ বাড়িতে এসে মায়াকেই খোঁজে। আমি বুড়ি হয়ে গেছি, আমাকে দেখতে বিচ্ছিরি, আমার সঙ্গে আর কে কথা বলতে চায় বলো! মায়া কিন্তু তোমাদের কাউকে পাত্তা দিতে চায় না। লেখক-টেখকদের সে একদম পছন্দ করে না।

শুনে সত্যিই দুঃখিত হলাম।

আমার অসুখ শুনেই তবু যা হোক এলে। তাই তো বললাম, অসুখ হলেই আমি ভাল থাকি। তাপস তো অসুখ শুনেও এক দিনও এল না।

কী ব্যাপার, তাপসের নামে যেন গলাটা ছল ছল করে উঠল?

মোটেই না। তাপসকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। সে-ও অবশ্য আমরা কথা কখনও ভাবেনা।

বিমলেন্দু আসে?

রোজ। সে তোমাদের মতো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে নয়।

ছায়াদির মুখে তাপসের নাম শুনেই মনে পড়ল, অনেক দিন আমারও তাপসের সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ দেখা করলে মন্দ হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ছায়াদি, আমি তাপসের কাছেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলব নাকি?

না না।

তাপসের মেসে দেখি, তাপস জামা কাপড় নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিযেছে। ওর রুমমেট রামহরিবাবুর একটা প্যান্ট গলিয়ে ও কিছুতেই সেটা ম্যানেজ করতে পারছে না। বামহবিবাবুর কোমর বিষম মোটা, আর তাপসের কোমর না খেয়ে খেয়ে মেয়েদের মতো সরু। বামহরিবাবুর প্যান্ট ওর লাগে কখনও? যে-জামাটা তাপস গায়ে দিয়েছে, সেটারও পুট নেমে এসেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত। তাপসের বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললাম। বলালম কী ব্যাপার? কোথায় জয়যাত্রায় যাচ্ছিস?

বিরক্ত মুখে তাপস বলল, রেডিয়োতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছি। চিঠিটা আজই সকালবেলা এসেছে, আজই সাড়ে বারোটায় ইন্টারভিউ। এর কোনও মানে হয়? একটাও ফর্সা জামা কাপড় নেই আমার।

রামহরিবাবু এমন কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন ওঁর জামাপ্যান্ট তাপসের গায়ে না লাগলে তারই দোষ। আহা, লোকটি বড় ভাল। আমি তাপসকে বললাম, যাঃ, ওই রকম হাস্যকর পোশাক পরে কেউ ইন্টারভিউতে যায়? নিজের যা আছে, তাই-ই পরে যা।

নিজের কী আছে? কচু আছে? এক পেয়ার লন্ড্রিতে দিয়েছি, আর ওই তো যেটা কাল পরেছিলাম।

সেটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। খাটের পাশে ওর প্যান্টটা তালগোল পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা ভর্তি যে দাগ, তা মাংসের ঝোলের কিংবা বমির। বললাম, জামা কাপড় লন্ড্রিতে পাঠাস কেন? বাড়িতে কাঁচতে পারিস না?

তাপস খেঁকিয়ে উঠল, যাঃ, যাঃ ফোঁপর দালালি করতে হবে না।

তা বলে ওই পাঁচটা সেফটিপিন লাগানো প্যান্ট পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবি।

তাহলে কী করব?

যাবার দরকার কিইন্টারভিউ দিতে? ও-চাকরি তো পাবিই না। আজ ইন্টারভিউ, আজই সকালে যদি চিঠি আসে তার মানে বুঝিস না? ও-চাকরি তোর হবে না।

হবে না মানে? চালাকি বার করে দেব। তোরা শালারা প্রফেসারি-ট্রফেসারি জুটিয়ে খুব হেরফের দেখাচ্ছিস। এবার দ্যাখ, আমিও রেডিয়োর চাকরি পাচ্ছি, একবার রেডিয়োর মাইকটা হাতে আসুক, সারা দেশে বিপ্লব ডেকে আনব। আমার যা কিছু কথা আছে রেডিয়োতে একদিন ঘোষণা করে দেব।

আমার পরনের প্যান্টটা কিছুটা পরিষ্কার ছিল, সেইটাই তাপসকে আমি খুলে দিলাম। তাপসের মোটামুটি লেগে গেল। বাধ্য হয়ে তাপসের বমি মাখানো প্যান্টটা আমাকে পরতে হল। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।

তাপস ব্যস্ত হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে ঘরের মধ্যে। আর বেশি সময় নেই, ঠিক পৌঁছুতে পারবে কিনা সন্দেহ।

তাপসের খুবই দেরি হয়ে গেছে, ঠিক সময় পৌঁছুতে গেলে ওর বোধহয় ট্যাক্সি করে যাওয়া দরকার। কিন্তু সে-কথা ওকে বলতে আমার সাহস হল না। তাহলে নিশ্চয়ই আমার কাছেহ ট্যাক্সি ভাড়া চাইবে। একেবারে জাত ভিখিরি তো, টাকা চাইতে একটুও লজ্জা নেই। নেহাৎ বাধ্য হয়েই ওকে আমার জামাটা খুলে দিতে হল। ওরবিকট ময়লা, বমির দাগধরা জামা-প্যান্ট পরে এখন আমার মনে হচ্ছে, তাপসের এখানে আজ না এলেই কত ভাল হত। কেন যে মরতে এখানে এলাম।

তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর খাওয়া হয়ে গেছে তো?

জুতোর ফিতে বাঁধছিল তাপস, বলল, না,

তাহলে এখন আর তো সময় নেই।

দুপুরে কিছু খেয়ে নেব।

তাহলে আজ আর কিছু খাওয়া হল না তোর। এ-সব ইন্টারভিউ-এর ব্যাপার তো জানিস না। ঘন্টা চার-পাঁচ বাইরে ঠায় বসিয়ে রাখবে।

তাহলে খাবনা! একেবারে চাকরিটা পাবার পর খাব। তখন দেখিস কী-রকম খাই। জানিস শালা, আমারও খুব শখ তোদের মতো সকালে চায়ের সঙ্গে রোজ ডিম আর মাখন টোস্ট খাওয়ার। আমারও ইচ্ছে করে মাঝে মাজে ভাতের বদলে স্যান্ডউইচ খেতে। দ্যাখ না, একবার চাকরিটা পাই।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখন চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাপসের। আমার জামা-প্যান্ট পরার পর ওর চেহারাটা মোটামুটি ভদ্রই দেখাচ্ছিল। চুল আঁচড়ানো শেষ করার পর অকস্মাৎ ও আমার দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতো হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। বলল, তোক কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, শেখর!

আমি রেগে গিয়ে বললাম, তা তো দেখাবেই, ভিখিরির পোশাক পরলে তাই দেখাবে না?

সত্যি মাইরি, তোর মতো শৌখিন ছেলে, সব সময় ফিটফাট থাকিস, তোকে এ-রকম পোশাকে কখনও দেখিনি। একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে।

আমার আবার নতুন করে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে বললাম, তোদর যা কাণ্ড। তুই তো ইন্টারভিউতে যাচ্ছিস, আমি এখন কী করে বাড়ি যাই?

তুই এখানে বসে থাক না। আমি ফিরে এলে –

তোর এই বিচ্ছিরি ঘরে আমি ততক্ষণ বসে থাকব?

তাহলে ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যা।

কী অনায়াস ভাবেতাপস বলল। ও যাচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে, তার জন্য আমাকে ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করতে হবে? একটুও ওর লজ্জা নেই পর্যন্ত। তাপসের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটু কৈফিয়তের সুরে তাপস বলল, জামাটা তো কাল নষ্ট হল পরীক্ষিতের জন্য, এমন গায় বমি করে দিল কাল!

কোথায়? রোজ রোজ এত –।

কে জানে কোথায়? আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তখন লটপট করছে।

থাক, ও-সব আর আমি শুনতে চাই না।

শোনারও কিছু নেই। সেই তো একঘেয়ে ব্যাপার। কত নম্বর বাসে উঠব বলতো? তিন নম্বর, তিন নম্বরই অনেকটা কাছাকাছি যাবে।

ওই সময় ট্যাক্সি পাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং তাপসকে ট্যাক্সি চড়ে যেতে বললেও কোনও লাভ হত না, এমনকী আমি ভাড়া দিয়ে দিলেও না। ওর সঙ্গে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল রাস্তার সব লোক যেন আমার পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাসে ওঠার আগে তাপস বলে গেল, তুই আমার জামা-প্যান্টটা কাচিয়ে রাখিস। আমি তোর এগুলো এখন তিন-চার দিন পরব।

তাপসের বাস চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা খালি ট্যাক্সি চোখ পড়ল। আমি ট্যাক্সিটা ডাকলাম। একবার মনে হল, বাসের পরের স্টপে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ছুটিয়ে গিয়ে তাপসকে ডেকে নামানো যায়, তারপর ওকে রেডিয়ো স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসাই আমার উচিত। কিন্তু সে-ইচ্ছেও বদলে গেল। ভাবলাম, এত বেশি বন্ধুত্ব দেখাবার কোনও দরকার নেই। জামা-প্যান্ট খুলে দিয়েছি তাই যথেষ্ট, আর কী চাই? এখন বন্ধু বান্ধবদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতেই আমার মন চাইছে।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়িতেই চলে এলাম। আমার বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের গাড়ি। গাড়িটা দেখেই বুকটা কেঁপে উঠল। এ আমার চেনা গাড়ি। বাইরের ঘরের মাধবী বসে আছে। হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি পরা, মাথার চুল সব খোলা, পিঠ ভর্তি ওর কোঁকড়া চুল। মাধবীকে দেখে হঠাৎ আমার বুক অভিমানে ভরে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ কদিন আসোনি কেন?

আমাকে দেখেই মাধবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন, কিন্তু সে-সব কিছু বলল, না। বলল, হ্যাঁ, আসা হয়নি।

বনেদি ঘরের মেয়ে তো, মনে এলেও সব কথা মুখে বলে না। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন তো করবেই না। সকালের দিকেই আমার এ ধরনের পোশাক দেখলে, যে কারুরইমনে হবে, আমি সারা রাত বাড়ির বাইরে কোথাও বেলেল্লা সেরে এখন

ফিরছি। কিন্তু মাধবীর সামনে চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট, অর্থাৎ বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছে যে আমি সকালেই বেরিয়েছি। কিন্তু এই রকম পোশাক পরে তো আমি বেরুতে পারি না, এবং এই সাত সকালেই কি আমি বেরিয়ে মদগিলে বমি টমি সেরে ফেলেছি? কিংবা অন্য কোনও অসুখে বমি– যে কারুরই এ সম্পর্কে কৌতূহল হয়। যে-কেউ আমাকে দেখলে বলত, কী ব্যাপার? জামায় ও কী? কিন্তু মাধবী তা বলবেনা কিছুতেই, মাধবী বার বার আমার পোশাকের দিকে তাকাল, নির্লিপ্ত গলায় বলল, হ্যাঁ, আসা হয়নি।

আমি ফের বললাম, তুমি একদিন আসোনি কেন?

মাধবী বলল, আসিনি। আমি আর আসতেও পারব না।

শুনে আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। মাধবী আর আসবে না? কেন? ওর বিয়ে হয়ে যাবে? কার সঙ্গে, সেই অবনীভূষণের সঙ্গে? না। তা হতেই পারে না। কিন্তু আমি কোনও প্রশ্ন করতে পারলাম না। মাধবীকে তো আমি এ পর্যন্ত অন্য কোনও কথাই বলিনি, যা বলেছি সবই আমার মনে মনে। অবনীভূষণ কে? একথাও মাধবীকে এ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অধ্যাপক-ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক তো মাধবীর সঙ্গে আমার হয়নি।

কণ্ঠস্বর যেন বিচলিত না হয় এই জন্য আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখের ভঙ্গি যথাসম্ভব নির্বিকার রেখে বললাম, একথাই বলতে তুমি এসেছিলে?

হ্যাঁ।

তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দিচ্ছ?

না।

সংক্ষিপ্ত এক অক্ষরের উত্তর। মাধবী যেন চাইছে, আমি ওকে খোলাখুলি প্রশ্ন করি। নইলে ও কিছুই বলবে না। কিন্তু এ-কথাও বুঝতে পারলাম, মাধবী পড়াশুনা ছাড়বে না, কিন্তু আমার বাড়িতে এসে আর পড়বে না। এর একটাই মানে হয়, প্রাইভেট টিউটর হিসাবে আমাকে বরখাস্ত করছে। বরখাস্ত করছে কোনও কারণ না দেখিয়ে, এক কথায়। এরপর আর আমার কোনও কথা বলা চলে না। এরপর, অন্য যে-কোনও কথা বলার মানেই হল, আমি চাকরি হারাবার জন্য দুঃখিত হয়েছি। মাধবী আমাকে আড়াইশো টাকা মাইনে দিত, সোজা কথা নয়। এখন যদি বলি, মাধবী, তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে, তাহলে সে কথার সবাই মনে করবে, প্রতি মাসে আড়াইশো টাকা হারাবার কষ্ট। যদি ওকে এখন প্রেম জানাতে চাই, তাহলে সেটারও মানে হবেও যেন আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত না করে, সেই চেষ্টা করছি। কেন মাধবীকে আগে থাকতেই ভালবাসার কথা বলে রাখিনি? এখন আর উপায় নেই। সুতরাং মাধবীকে আমি বিদায় দেবার ভঙ্গি করে বললাম, আচ্ছা, মন দিয়ে পড়াশুনো কোরো। সন তারিখ তোমার প্রায়ই ভুল হয়, ওটা লক্ষ্য রেখো।

মাধবী তবু না গিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপব বলল, আমি এখানে আসতে পারব না। আপনি বাড়িতে এসে পড়াতে পারবেন?

এখানে প্রশ্ন করা উচিত, কাদের বাড়িতে? ওর যদি বিয়ে হয় এবং তখনও পড়তে চায়, তখন কোন বাড়িতে? বিয়ের পরও কি ও নিজের বাড়িতেই থাকরে না, অন্য বাড়িতে? কিন্তু আমি ওকে কোনও প্রশ্ন করবনা ঠিক করেছি, কিছু জানাব না, তাহলেই তার অন্য মানে হবে। সুতরাং আমি বললাম, না, অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবন।

আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন না? সপ্তাহে অন্তত দুদিন?

না।

কেন?

এমনিই। আমার ভাল লাগবে কি না বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, আপনার ভাল লাগবে। আসবেন?

এবার মাধবী ওর নির্লিপ্ততার আররণ একটু সরিয়েছে। একটু যেন জোর দিয়ে কথা বলতে চাইছে। তবু আমি বললাম, আচ্ছা, ভেবে দেখি। পবে তোমাকে জানাব।

মাধবী দরজার কাছে পৌঁছেছিল, ওকে বিদায় দেবার জন্য আমি এগিয়ে এলাম। এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, আগের মুহূর্তেও ভাবিনি, মুখ ফসকে আমার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, মাধবী, অবনীভূষণ কে?

মাধবী ফিরে দাঁড়াল। এক মুখ হাসিতে ওর মুখটা ঝলমলে হয়ে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, অবনীভূষণের কথা আপনাকে পেয়ে বসেছে দেখছি। এত ভাবছেন কেন?

অবনীভূষণ কে?

কেউ না, এক জন মানুষ। অবনীভূষণ সেনগুপ্ত। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়েছিল আমার। আপনি অনেকটা তার মতো।

আজ, এই পোশাকেও কি আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ। আজও আপনাকে প্রথম দেখেই তার কথা মনে পড়েছিল।

মনে পড়েছিল মানে? সে এখন কোথায়?

সেকথা আজ বলবনা।

আজ নয়, তবে আর করে বলবে!

আবার যখন দেখা হবে। আবার করে দেখা হবে তা তো আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। আজ যাই।

মাধবী আর একটু বসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব।

আজ নয়। আজ বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। মাকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি ফিরব। এখন যাই।

তুমি আমার বাড়িতে আর আসবে না কেন?

সে-কথাও আজ বলবনা। যদি আমার বাড়িতে আসেন আজ হঠাৎ এত প্রশ্ন করছেন কেন?

না, আর প্রশ্ন করবনা। তুমি যাও।

মাধবী গিয়ে গাড়িতে উঠল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। একথা তো অবধারিত যে, মাধবীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই। হবেই, কেননা, আমি মন থেকে তাই-ই চেয়েছি। দেখা হলে মাধবীকে আর কোনও প্রশ্ন করব না, কোনও কথা জানাবও না।

মাধবী আমাকে যে-দিন বলেছে, আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, সেদিন থেকেই আমি বদলাতে শুরু করেছি। আমি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি। সত্যি সত্যি অবনীভূষণের মতন কিনা, তা অবশ্য জানি না। তাকে তো আমি চিনিই না। কিন্তু একথাও ঠিক, আমি এখন শেখরও ঠিকনই। কে তবে আমি!

ফিরে এসে চটপট স্নান সেরে, আমার সব চেয়ে শৌখিন পোশাক পরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাধবী এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। স্নান সেরে মাধবীও কী আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? অবনীভূষণ কি বেঁচে আছে? যদি বেঁচে থাকে, তবে ও কি এখন মাধবীদের বাড়িতে? ছোকরা কী-রকম, খুব চালিয়াৎ কিনা কে জানে! ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরিচ্ছন্ন চেহারার অবনীভূষণ মাধবীদের বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বসে ইয়ার্কি করছে – এই ছবিটা মনে এল। কী ধরনের রসিকতা ও করে, ঠিক ভেবে পেলাম না। আকাশ থেকে এক ঝলক আলাদা রোদ মাধবীর জন্য এসে ওর পায়ে লুটোচ্ছে। মাধবীর

পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। অবনীভূষণ নিশ্চিত সিল্কের পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরে আছে। মুখে সিগারেট না পাইপ? এমনও হতে পারে, অবনীভূষণ সত্যিই বেঁচে নেই। ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, কিছুতে বুঝতে পারি না। যদি বেঁচে থাকে তবে, আপনাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, এ কথা বলেই মাধবী চুপ করে যায় কেন? আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা একটি লোকের নাম বলে, তার পরিচয় না বলার কী কারণ থাকতে পারে দুঃখের স্মৃতি ছাড়া! যদি বেঁচে থাকে, তবে সে কোথায়? একদিন মাধবীর গা শুঁকে দেখতে হবে, ওর গায়ে অবনীভূষণের গন্ধ আছে কিনা। না না, বেঁচে থাকো, তুমি বেঁচে থাকো অবনীভূষণ, আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো। জীবিত লোককে পরাজিত করা সোজা। যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে মাধবীর বুক থেকে ওর দাগ কোনও দিন উঠবে না। সারা শরীর আবার ব্যথা ব্যথা করছে। সারা দিন ঘর থেকে বেরোলাম না। বিকেলেও তিন জন বন্ধু এল, প্রত্যেকের নিজস্ব ধরনের অনেক কথা বলে গেল। যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল না। বাড়িতে একা পড়ে রইলাম। নিজে থেকে কোথাও যেতে ইচ্ছে হল না। ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছি। ভালই, যত আমি একা হব, তত আমি মাধবীর কাছাকাছি যাব। অনেক হুল্লোড় করেছি, এখন স্নেহছায়া চাই। ইচ্ছে করে মাধবীর চোখের সামনে পা ছড়িয়ে বসে থাকি। মাধবীর দৃষ্টি ঝরনার জলের মতো। মনে পড়ে, অনেকদিন আগে সাঁওতাল পরগনায় একটা ছোট্ট ঝিরঝিরে ঝরনার সামনে অনেকক্ষণ একা বসে ছিলাম। বসে ছিলাম রাখাল বালকের মতো। হাতে বাঁশি ছিল না, পরনে কর্ডের প্যান্ট ও মুখে চুরুট ছিল, তবু রাখাল বালকের মতো, একথায় কোনও ভুল নেই। প্রায় তিন ঘণ্টা বসে ছিলাম, চুপ করে, নিজের সঙ্গেও কথা বলিনি, এক লাইন গান গাইনি। আমার স্মরণকালে সেই একমাত্র চুপ করে বসে থাকা। মাধবীর সামনে ওই রকম চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। চুপ করে বসে থাকলে, এক দিন না একদিন আমাকে ঠিক আমারই মতো দেখাবে।